বিকেলের রং

বিকেলের রং

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন ষ্ট্রীট । কলিকাতা-৬

অনেকক্ষণ ধরেই তাকাচ্ছিল, বিমানেরও চেনাচেনা মনে হচ্ছিল। এবারে এগিয়ে এসে কথা বলল।

বিমানকাকা না?

ঘাড় নাড়লেন বিমান, তোমাকে তো ঠিক...

আমি রমেন, সুরেন সাহার ছেলে।

সুরেনের ছেলে তুমি? কী কাণ্ড! কত ছোট দেখেছি তোমায়। মস্ত বড় হয়ে গেছ, চেহারায় ভারিক্কি ভাব এসেছে। না বললে চিনতেই পারতাম না।

আপনাকে কিন্তু আমি দেখেই চিনেছি।

সেটাই তো! আমারই অবাক লাগছে।

চিনেছি আপনার কপালের কাটা দাগটা দেখে। বাবার কাছে এত গল্প শুনেছি ছোটবেলায়!

কপালে হাত বুলোলেন বিমান। নিজে দেখতে পান না, খেয়াল থাকে না। অন্যরা নিশ্চয়ই ওটা দিয়েই চেনে তাঁকে। ওই ফর্সা, লম্বা কিংবা রোগা মতন লোকটা না বলে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলে, সেই যে কপালে একটা দাগ!

সুরেন অবশ্য মনে রেখেছে অন্য কারণে। দাগটার ইতিহাস ওর জানা। কাঁচরাপাড়ায় চ্যালেঞ্জ কাপের খেলা ছিল। ফাইনালে জিতে হইহই করতে করতে লরির মাথায় চড়ে ফিরছিলেন। ওই বয়েসের উত্তেজনা, ডাইনে-বাঁয়ে খেয়াল থাকে না। একটা গাছের ডাল ঝুলছিল নিচু হয়ে, সপাং করে কপালে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে রক্তে ভেসে গেল মুখচোখ। তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘুরিয়ে যাওয়া হয়েছিল ডাক্তারখানায়। সাত-আটটা সেলাই পড়েছিল। চোখটা রক্ষা পেয়েছে, ভগবানকে ধন্যবাদ দাও, বৃদ্ধ ডাক্তার দু'তিন বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

সুরেন সঙ্গে এসেছিল। চোখ অবধি ঢাকা মস্ত ব্যান্ডেজ, চুপিচুপি কুয়োতলা দিয়ে পেছনের দরজা অবধি পৌঁছে দিয়েই পালিয়ে গিয়েছিল। মার মুখোমুখি হবার সাহস ওর ছিল না।

কেমন আছে সুরেন?

বাবা তো শয্যাশায়ী, প্যারালিসিস। দু'বছর হয়ে গেল দাঁড়াতে পারে না, কথা বলতে পারে না। হেগেমুতে বিছানা নোংরা করে ফেলে। চিনতেও পারে না কারওকে।

বিছানা নোংরা করার কথা বলতে গিয়ে দৃশ্যতই চোখে-মুখে ঘেন্না এনে ফেলল রমেন। বিমান চোখ সরিয়ে নিলেন। ছেলেকে কী ভালই না বাসত সুরেন। কাঁধের ওপর বসিয়ে সাইকেল চালাত, দোকানে বসিয়ে রাখত। বলত, চোখগুলো কী উজ্জ্বল দেখেছিস? বড় হয়ে নিশ্চয় সায়েন্টিস্ট হবে।

কী হয়েছে রমেন?

প্রশ্নটা করেই ফেললেন।

আমাদের মিষ্টির দোকান, আপনি তো জানেন। মিষ্টির ব্যবসার আজকাল তেমন রমরমা নেই। একটা পাশে রেস্টুরেন্ট করেছি, ভিড় হচ্ছে ইদানীং, তার সঙ্গে ক্যাটারিং। মিলন ক্যাটারার। আপনাকে কার্ড দেব। রানাঘাট লোকালেই উঠবেন তো?

ট্রেনের মুখ দেখা গিয়েছে। বিকেলের ট্রেন, কলকাতা-অভিমুখী। ব্যাপারির ভিড় কম। নিত্যযাত্রীও হাতে গোনা। স্কুলসার্ভিসের পরীক্ষা দিয়ে বাইরের থেকেও টিচার আসছে। তাদেরই কয়েকজন ছুটির পর ফিরে যাচ্ছে। কেউ কেউ নৈহাটি যাচ্ছে সিনেমা দেখতে।

বেশিদিন বাঁচা উচিত নয়। বিমানের মনে পড়ল, সুরেন তাঁর চেয়ে বছরখানেকের বড় ছিল। চৌষট্টি বছর বয়েসটাকে কি খুব বেশি বলা যায়? সত্তরে তো আজকাল অনেকেই জীবন শুরু করছে। নন্দিতার জামাইবাবু স্ত্রী বিয়োগের পর বছরখানেক দুঃখ দুঃখ মুখ করে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর পনেরো বছরের ছোট সেক্রেটারিকে বিয়ে করে ঘরে এনে তুললেন। দু'য়েকটা লুকনো ছিঃ, কারও কারও ভুরু তোলা, ছ'মাসের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। এখন তো আজ গোয়া কাল মানালি করে বেড়াচ্ছেন।

মাঝে মাঝে মনে হয় সুস্থ শরীরে কারও গলগ্রহ না হয়ে বেঁচে আছেন, একটা প্রেসারের ওষুধ ছাড়া তেমন ডাক্তার-বদ্যি করতে হয় না, এইটুকুর জন্যেও শোবার আগে দু'খানা হাত মাথায় ঠেকানো উচিত।

মসৃণ সরীসৃপের মতন ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল। প্ল্যাটফর্মের মৃদু কম্পন আর লাইনের শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া কোনও আভাস বা ইঙ্গিত নেই। কত কিছুই তো নিঃশব্দে আসে। বাজারে রোজ দেখা হত সুরেশ অধিকারীর সঙ্গে।

নিঃশব্দে তুলে নিয়ে গেল সুরেশদাকে, ছেলে এসে কার্ড দিয়ে গেল।

এই সব ভাবলেই শরীর খারাপ করে। ভাবনাটা দূরেই রাখতে চেষ্টা করেন বিমান। আলটপকা ফাঁকফোকর গলে সেঁধিয়ে যায়। ট্রেনে উঠতে উঠতে দেখলেন পেছন পেছন উঠছে রমেন।

জায়গাও পাওয়া গেল। রমেন পাশে বসল। জানলার পাল্লা নেই। হুহু করে হাওয়া ঢুকছে। মাঘের শেষ, হাওয়ায় ঠাণ্ডা ভাব এখনও যথেষ্ট। বাড়ি ফিরে গরম জলে গার্গল করে নিলেই নিশ্চিন্ত।

রমেন ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল।

আচ্ছা বিমানকাকা, আজকাল কি আপনি একটু ঘনঘন আসা শুরু করেছেন?

সতর্ক হয়ে গেলেন বিমান। তাহলে কি সুরেনের গল্প, কপালের কাটা দাগ সবই উপক্রমণিকা? গভীর জলের মাছ রমেন? তাঁর আসা যাওয়া, তার কারণ সবই ওর জানা?

সাবধানে জবাব দিলেন, ওই আর কী! রিটায়ার করেছি। সংসারের দায়দায়িত্ব কমে গেছে। এ দিকে পৈতৃক বাড়িটা এখনও পড়ে। দেখাশুনার লোক নেই। তা ছাড়া ছোটবেলার টান, বুঝতেই পারছ, বুড়ো হলে মানুষ আবার শৈশবে ফিরে যায়। সব মিলিয়ে...

ভাল, ভাল, আপনার আসাটা দরকার।

কী জন্য ভাল বলল, রমেনের মুখের দিকে তাকিয়ে সেটাই বোঝার চেষ্টা করছেন, রমেন ঘুরে বসল।

পল্টু, আপনার ভাগ্নে, ওকে আপনার কেমন মনে হয়?

রমেন জানে। তাঁর ঘনঘন আসার কারণ, না এলে কী ঘটতে পারে, কী কী এর মধ্যেই ঘটে গিয়েছে, সমস্তটাই ওর জানা। এতক্ষণ ভাঙেনি। একটু একটু করে ছাড়ছে।

কিন্তু তিনিও কতটা জানেন সেটা কি ওকে জানানো ঠিক হবে? বরং ও কতটুকু জানে সেটাই আগে জেনে নেওয়া যাক।

পল্টু? মিলির ছেলে? চমৎকার ছেলে! ভদ্র, বিনয়ী, শিক্ষিত।

জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখল রমেন, তারপর গলা খাটো করে বলল, মিলিপিসি আপনার মায়ের পেটের বোন, পল্টুকে হতে দেখেছেন আপনি, ওর সম্বন্ধে খারাপ কথা শুনতে আপনার ভাল না লাগারই কথা।

কেন? পল্টু কি খারাপ ছেলে?

পল্টু কী করে কিছু জানেন? কী ধরনের কাজ?

প্রথম দিকে টুকিটাকি ঠিকেদারির কাজ করত, আজকাল শুনছি প্রোমোটারিতে নেমেছে।

রেল-এর ঠিকেদারি করত, ওদের একটা গ্যাং ছিল। বাইরের কোনও ঠিকাদারকে অর্ডার ধরতে দিত না। তাই নিয়ে ইয়ার্ড-এ লাশও পড়ে গেছে। অ্যাকশন করা ছেলে পল্টু। ও দিকে নতুন অনেকগুলো ছেলে চলে আসায় পল্টু লাইনের কাজ ছেড়ে প্রোমোটারিতে সরে এসেছে।

রমেনের কথাগুলো শুনতে শুনতে পুরনো কথা ভাবছিলেন বিমান। হর, পল্টুর বাবা। কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে কাজ করত, ফিটার। মিলিকে এক দিন ট্রেন থেকে নামতে দেখলেন, সঙ্গে একটা ছেলে, চোঙা প্যান্ট, ছুঁচল জুতো। কে রে ছেলেটা? জিভ আলটাকরায় আটকে গেল, তোতলাতে তোতলাতে সামনে থেকে পালাল মিলি। সেই বছরই নাইন থেকে টেন-এ উঠতে তিন সাবজেক্ট-এ গাড্ডা মেরেছিল বলে প্রোমোশন পায়নি মিলি। ক'টা দিন তক্কে তক্কে থেকে দু'জনের মুখোমুখি হলেন, এবারে শিল্পাশ্রমের গেটের কাছে, গঙ্গার ধারে। দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিল মিলি, দুড়দাড় করে দৌড়ে পালাল। কলার চেপে ধরেছিলেন হর'র। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে টোকা মারার ভঙ্গিতে হাত সরিয়ে দিয়েছিল বিমানের, মাস্তানি দেখাচ্ছেন?

মুখ সামলে কথা বোলো, জানো কার সঙ্গে কথা বলছ?

জানি। আপনি মিলির বড়দা। ভগ্নিপতির সঙ্গে প্রথম আলাপে গায়ে হাত তুলছেন, আপনার আস্পর্দা তো কম নয়?

চোয়াল লক্ষ্য করে হাত চালিয়েছিলেন বিমান, মুখ সরিয়ে নিয়েছিল হর। মনে হয়েছিল এসব ওর জলভাত। বলেছিল, যে জিনিস পারেন না, তা করতে যান কেন? আমার আখড়ায় আসবেন। মাসখানেক প্র্যাকটিস করলে নিশানা ঠিক হবে।

যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, আমাদের রেজিস্ট্রি হয়ে গিয়েছে। সামনের মাসে আমরা কাঁচরাপাড়ায় কোয়ার্টারে উঠে যাচ্ছি।

হর'র ছেলে পল্টু।

বিমান পল্টুর হয়ে ওকালতির ভঙ্গিতে রমেনকে বললেন, প্রোমোটারি তো আজকাল অনেকেই করছে। কত ভাল ভাল ছেলে আর্কিটেকচার নিয়ে পাশ করে এই লাইনে...

সে কলকাতায় হয় বিমানকাকা, এই মোহনপুরে সে জমানা আসতে অনেক দেরি। এখানে প্রোমোটারি করতে দু'টো জিনিস লাগে, তাগত আর হিম্মত। দু'টোই পল্টুর আছে।

তুমি কি আমাকে সাবধান করছ রমেন?

যেভাবে নেবেন। আপনাদের পড়ে থাকার মধ্যে আছে বাড়িটা, আর সঙ্গের পনেরো কাঠা জমি। ভেতর দিকে হলে কাকপক্ষীতেও ঠুকরে দেখত না। লোকেশনটাই দুর্দান্ত! রেল স্টেশনের গায়ে। কী না হয়? মার্কেট কমপ্লেক্স, ওনারশিপ ফ্ল্যাট। কতজনের যে নজর! আপনি বাইরে থাকেন, কল্পনাও করতে পারবেন না। পল্টু কিছু বলেনি?

বলেছে। অবশ্য তেমন করে নয়।

কত অফার দিয়েছে?

জমির জন্য কোনও অফার দেয়নি।

তা হলে?

বলছে মার্কেট কমপ্লেক্স করবে। বিশখানা দোকানঘর। দশটা ওর, বাকিগুলো আমাদের।

এক একটা দোকানের সেলামি দু' লাখ। তার মানে বিশ লাখ। তার থেকে দোকানঘর তৈরির খরচা বাদ দিন। তার চেয়ে শুধু জমিটুকু ঝেড়ে দিন, তিরিশ লাখ আপনার বাড়ি বয়ে লোকে দিয়ে যাবে।

পনেরো কাঠা জমি তিরিশ লাখ? কাঠা দু' লাখ?

হবে না? বললাম না, লোকেশন। আরও উজিয়ে ইটখোলার পুকুর বোজানো জমি বিক্রি হল দেড় লাখে। কাঠায় দু' লাখ হেসেখেলে পেয়ে যাবেন।

কিন্তু পল্টু যে বলল, রেল লাইন চওড়া হবে, থার্ড লাইন পাতবে, তাড়াতাড়ি কনস্ট্রাকশন না করলে পরে আঙুল কামড়াতে হবে! জমির দাম না কি পঞ্চাশও পাওয়া যাবে না?

হাসল রমেন। বলল, পল্টু বলেছে এই কথা? ছেলেটা জিনিয়াস। থার্ড লাইন পাতার গল্প আমরা জন্ম থেকে শুনে আসছি। এদিকে কোনও দিন হবে না। হত, যদি বাংলাদেশের সঙ্গে রেগুলার ট্রেন সার্ভিস চালু থাকত। কিংবা, উত্তরবঙ্গে যাওয়ার ট্রেন এই লাইনে চলাচল করত। পল্টু আপনাকে টুপি পরিয়েছে। আমার কথা শুনবেন? এই রমেন সাহা আপনাকে দর দিয়ে রাখল, তিরিশ লাখ, পুরোটা, এক লপ্তে, রাজি থাকলে এই রোববারেই ডিল ফাইনাল করে ফেলব। একটাই কনডিশন। রেজিস্ট্রি হবার আগে পল্টুকে জানাবেন না।

জানালে কী হবে?

হালিশহর এসে গিয়েছিল। উঠে দরজার কাছে যেতে যেতে হাসল রমেন।

পল্টু জেনে গেলে আমার বেওয়ারিশ লাশ রেল লাইনের ধারে পড়ে থাকবে। বউটা মেয়েদের হাত ধরে পল্টনের বাজারে ভিক্ষা করবে।

২

ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল সবাই। এ বার সরস্বতী পুজো দেরিতে। হাওয়া থেকে ঠাণ্ডার ভাব অনেকটাই কমে গিয়েছে। বাচ্চারা সোয়েটার গায়ে রাখতে চাইছে না। মায়েরা জোরজবরদস্তি করে হাতকাটা সোয়েটার চাপিয়ে রেখেছে।

তপু বসেছিল সোফায়, পা তুলে। অপু ডাইনিং টেবিলের চেয়ার ঘুরিয়ে অন্যদের মুখোমুখি। ডিভানের ওপর শাওন আর মিতালি। বাচ্চারা এ ঘর ও ঘর করছিল। খেলতে খেলতে, দেখে যাও দিদি কী করল, শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। শাওন বা মিতালি কেউই দেখে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করছে না।

বিমানের একটা পেটেন্ট মোড়া আছে। টায়ার কেটে ওপর-নীচটা বাঁধানো। ডাইনিং টেবিলের একপাশে নিচু মোড়ায় বসে আলোচনায় অংশ নিচ্ছিলেন বিমান। অবশ্য এক্ষেত্রে অংশ নেবার অর্থ হাসি হাসি মুখে শোনা এবং দু' একটা মন্তব্য পেশ। নন্দিতা গ্যাসে কী একটা চাপিয়ে খুন্তি নাড়তে নাড়তে ওদের কথা শুনছেন।

তপু বলছিল, স্কুলের সরস্বতী পুজো মনে আছে তোর?

মনে থাকবে না? অপু উত্তেজনায় গলা তুলে ফেলল, নতুন ক্লাসে উঠে প্রথমেই দু'টো ইভেন্ট, এক : স্পোর্টস, দুই : সরস্বতী পুজো। তার মধ্যে স্পোর্টসটায় টিচারদের খবরদারি বেশি ছিল। বিষ্ণুবাবু পায়ে কেডস মাথায় সাদা টুপি পরে মুখে হুইসল লাগিয়ে পিঁপ পিঁপ করে সবাইকে চমকে বেড়াতেন। প্রাইজের দিনে তো হেডস্যার পর্যন্ত মাঠে নেমে পড়তেন। আসল মস্তি ছিল সরস্বতী পুজোয়।

এক বার, ক্লাস টেনে উঠেছি তখন, পুজো কমিটির সেক্রেটারি হয়েছিলাম আমি।

হ্যাঁ, মনে আছে, তখন আমরা সেভেন। কিশোরবাবু হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট। নাটক করেছিলেন টিচাররা, জগৎবাবু পুলিশ ইন্সপেক্টর সেজে হারানবাবুর পেটে রুলের গুঁতো মেরেছিলেন। তাই দেখে আমরা খুব হাততালি দিয়েছিলাম। আর হারানবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হাসি হচ্ছে?

সব ক'টার মুখ আমি দেখে রাখলাম। পরশুদিন অঙ্কের ক্লাসে হিসাব হবে।

হয়েছিল? মিতালি জানতে চাইল।

তাই কখনও হয়? নাটকের মজা নাটকেই শেষ। পরে আর কিছু পড়ে থাকত না। ভাসানের দিন? একটা লরি ভাড়া করে ঠাকুর তোলা হত। সিদ্ধি গোলা হত মস্ত হাঁড়িতে। স্কুলের পিওন সিদ্ধেশ্বর, আমরা বলতাম সিদ্ধি + ঈশ্বর = সিদ্ধেশ্বর, হাঁড়ি থেকে গ্লাশে ঢেলে সবাইকে দিত। তার পর ভাসান যাত্রা। স্কুল থেকে ঢলদিঘি, কতটুকুই বা পথ? শুরু হলেই ফুরিয়ে যায়। তাই সমস্ত শহর পরিক্রমা করে কেরামতি দেখিয়ে তবে ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হত।

কী কেরামতি দেখাতে তোমরা?

নাচ। তোমরা আজকাল যে সব দেখে মোহিত হয়ে যাও, ওগুলো আমরা বিশ বছর আগেই ভাসানে করে ফেলেছি। বলিউডের কোরিওগ্রাফাররা গোপনে অবজারভার পাঠাত। তারা যে রিপোর্ট দিত তার ভিত্তিতেই পরের ছবির ড্যান্স ডিরেকশন দেওয়া হত।

সত্যি? শাওন চোখ গোল করল।

তোরও যেমন! ওদের কথা বিশ্বাস করিস? মিতালি শাওনকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল।

বেশ তপুকেই জিজ্ঞেস কর।

অপু বলটা তপুর কোর্টে ঠেলে দিল।

তপু হাসল, আসলে সরস্বতী পুজোয় টিচাররা অনেক পারমিসিভ হয়ে যেতেন। কে দুষ্টুমি করল, সিদ্ধি খেয়ে হুল্লোড় করল, দু' হাত তুলে নাচানাচি করল, দেখেও দেখতেন না। শুধু খেয়াল রাখতেন, যেন বাড়াবাড়ি না করে ফেলে। স্কুলের দুর্নাম না হয়। সেই জন্যেই পুজো কমিটি তৈরির সময় মাথা ঠাণ্ডা ভাল ছেলে দেখে সেক্রেটারি চুজ় করতেন।

কী বললে? তোমার মাথা ঠাণ্ডা? মিতালি চেঁচিয়ে উঠল।

আমাদের টিচাররা তো তা-ই মনে করতেন।

যেমন তোমাদের স্কুল, তেমনি টিচার। তোমার মাথা কতখানি ঠাণ্ডা সে সার্টিফিকেট দেব আমি।

রান্নাঘর থেকে সাবধানে একটা ডেকচি এনে ডাইনিং টেবিলে রেখে গেলেন নন্দিতা। বললেন, খাবার কিন্তু রেডি। কখন খাবে দশ মিনিট আগে বোলো। ভাতটা গরম করে নেব।

ঘাড় নাড়ল সবাই। আড্ডা জমে উঠেছে। কেউই উঠে যেতে চাইছিল না।

তপু ছেড়ে যাওয়া সুতোটা আবার ধরে ফেলল, আমার কিন্তু ভাসানের থেকেও ভাল লাগত খাওয়া-দাওয়ার পাটটা।

পংক্তিভোজন, অপু প্রাঞ্জল করল।

হ্যাঁ, লাইন দিয়ে সবাই বসত। ক্লাশরুম থেকে বেঞ্চিগুলো বের করে দেওয়া হত। পাশাপাশি সাত-আটশো ছেলে। বালতি নিয়ে পরিবেশন করছি বড়রা। মেনুও তেমন কিছু নয়, খিচুড়ি আর লাবড়া। তা-ই মুহূর্তের মধ্যে উড়ে যেত। স্বপন, আমাদের ক্লাসেই পড়ত, স্কুল টিমের গোলকিপার, আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। খিচুড়ির বালতি হাতে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, হাসছিস যে? স্বপন বলল, তোর খিচুড়ি দেওয়ার ধরন দেখে। জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কী ভুল দেখলি? স্বপন বালতিটা দেখিয়ে বলল, হাতা দিয়ে তুলতে তুলতে তোর হাত ব্যথা হয়ে যাবে রে তপন। তার চেয়ে বালতিটাই নামিয়ে দিয়ে যা, আমরা কাত করে ঢেলে নেব।

পুরো বালতি? খেতে পারল?

একা নয়। দু' তিন জন মিলে। সত্যিই শেষ করে দিল।

নন্দিতা এ বার তাড়া লাগালেন।

আর গল্প নয়। সবাই খেতে বসো। কাল সকাল সকাল উঠে হাত লাগাতে হবে। আগের বছরের মতো পুজো শুরু হতে দশটা বাজুক, আমি চাই না। ছোটদের বেলা অবধি না খেয়ে থাকতে কষ্ট হয়।

সকলে শুনল, হাত ধুতে বেসিনে গেল; কিন্তু প্রত্যেকেই জানে, যে যখনই উঠুক, পুজোর জোগাড়ে নন্দিতা কারওকে হাত লাগাতে দেবেন না। শুধু পুজোর জোগাড়ই নয়, ভোগ রান্নাতেও। শুচিবাই আছে নন্দিতার। অন্যরা ঠিকমতো নিয়ম মেনে করতে পারবে না, নন্দিতার ধারণা।

বাচ্চাদের আগেই খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওরা দুপুরে ঘুমিয়েছে। তাই এখনই বায়না করছে না। দু'টো ঘরে মিতালি আর শাওন অবশ্য মশারি টাঙিয়ে বিছানা পেতে শোবার বন্দোবস্ত করে ফেলেছে।

সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর কিনতে যাওয়া হয়েছিল। বাচ্চাদের ঠাকুরদা-ঠাকুরমার জিম্মায় রেখে ওরা চারজন বেরিয়েছিল। অপু এক বার সাজেস্ট করেছিল, বড় প্রতিমা কিনলে কেমন হয়? তপু বারণ করেছিল। বলেছিল, মা তো ঠাকুর বিসর্জন দিতে দেবে না। পরের বছর প্রতিমা কোথায় ফেলা হবে তাই নিয়ে একটা সমস্যা হবে। এই নিয়ে আবার একটা ঝগড়া বেধে যাক, আমার ইচ্ছে নয়।

শেষ পর্যন্ত দুই জায়ে পছন্দ করে প্রতিমা কিনেছিল। কিন্তু ঠাকুর নিয়ে বাড়ি ঢুকতে এক ঝলক দেখেই নন্দিতা বলেছিলেন, দাঁড়ানো প্রতিমা? কেন বসা ঠাকুর পাওয়া গেল না? মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল চারজনে। নন্দিতা উঠে যেতে যেতে বলেছিলেন, নিয়ে যখন এসেছ তখন তো ফেলে দেওয়া যাবে না! পিঁড়িতে আল্পনা দেওয়া আছে। সাবধানে পাশে রেখে এসো। কাল শুদ্ধবস্ত্রে স্থাপন করতে হবে।

দাঁড়ানো প্রতিমার কী দোষ?

ফিসফিস করে জানতে চেয়েছিল শাওন। তপু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকতে বলেছিল। বাচ্চাদের খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে, পাছে প্রসঙ্গটা ঘুরেফিরে এসে পড়ে, তাই ছোটবেলার গল্প টেনে এনেছিল দু' ভাই।

আয়োজন বেশি নয়, ফুলকপির তরকারি আর ডিমের ঝোল। রাত্তিরে বাসনকোসন মেজে রাখতে হবে। তাই শালপাতার প্লেট কিনে আনা হয়েছে। বিমান বসলেন না। নন্দিতা এক বার হাল্কা করে বললেন, তুমি আর অপেক্ষা করছ কীসের জন্য?

বিমান জবাব না দিয়ে মোড়ায় বসে ওদের খাওয়া লক্ষ করতে লাগলেন।

অপু ঝোল ঢালতে ঢালতে বলল, এখনকার স্কুলের চেহারা ছবি একেবারে বদলে গিয়েছে।

বিমান জানতে চাইলেন, কী রকম?

অপু বলল. দমনের স্কুলের মাইনে কত তুমি জানো?

কত?

লোয়ার কেজি থেকে আপার কেজিতে উঠবে, জানুয়ারি থেকে মার্চ তিন মাসের মাইনে একসঙ্গে দিলাম, সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। মাসে দু'হাজার টাকার কাছাকাছি।

কী সাংঘাতিক? ওই টাকায় তো একটা সংসার চলে যায়।

হ্যাঁ, প্রাইভেট ফার্মে চাকরিতে ঢুকে ভাল ভাল ছেলে ওই রকমই মাইনে পায়।

কীভাবে নেয় অত টাকা? জানতে চাইলেন বিমান। চৌত্রিশ বছর স্কুলে পড়িয়েছেন, আঠারোশো টাকা মাইনে নেওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

টিউশন ফি কত জানো? একশো টাকা।

ঠিক ধরেছি। ওটা তো বাড়ানো যায় না। বাকিটা?

ঘুরিয়ে নেয়। এডুকেশনাল অ্যাকটিভিটি এক হাজার, স্কুল বাস চারশো,

আরও হাবিজাবি তার মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। যোগটা দেখে নিয়েছি, ঠিক আছে।

অঙ্কর মাস্টারের ছেলে যোগ বুঝবি না? হাসলেন বিমান।

শাওন চুপ করেছিল এতক্ষণ! এবারে মুখ খুলল, কীভাবে টাকা নেয় আপনি ভাবতে পারবেন না বাবা। বই কিনতে হবে নির্দিষ্ট দোকান থেকে। অন্য জায়গা থেকে কিনলে ফিরিয়ে দেবে। স্কুল ব্যাগ, ইউনিফর্ম কেনার জন্যও ফিক্সড দোকান। শীতের আগে বলল সোয়েটার কিনতে হবে। গেলাম। একটা চার বছরের বাচ্চার সোয়েটার, তাও অর্ডিনারি, দাম বলল আটশো টাকা। রাগ করে ফিরে এলাম। সেম জিনিস নিউ মার্কেট-এ কপূরের দোকান থেকে তিনশো টাকায় কিনে পর দিন পরিয়ে স্কুলে পাঠিয়েছি, পানিশমেন্ট দিয়ে দিল। ডায়েরিতে লিখে দিল, ঠিকমতো সোয়েটার না পরালে বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানোর দরকার নেই।

ওই স্কুলে না পাঠালেই হয়। ছাড়িয়ে দাও। কলকাতায় কি স্কুলের অভাব?

সত্যিই অভাব বাবা, অপু বোঝায়। ভাল স্কুল, অথচ ডোনেশন ছাড়া ভর্তি করে এমন স্কুল হাতে গোনা যায়। তা ছাড়া সব জায়গাতেই ভর্তি হয় লোয়ার কেজিতে। ওপরে উঠলে দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজা খোলাতে গেলে দক্ষিণার অ্যামাউন্ট লাখ ছাড়িয়ে যায়। ছেলেমেয়ের এডুকেশন কলকাতা শহরে একটা আতঙ্ক।

হাত শুকনো হয়ে গিয়েছিল। নন্দিতা তাড়া দিলেন, যাও হাত-মুখ ধুয়ে নাও। পাতাগুলো মুড়ে পেছনের লহরে ফেলে দিলেই হবে। তুমিও আর দেরি কোরো না। বসে পড়ো।

মিতালি আর শাওন বাচ্চাদের নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বন্ধ দরজার আড়ালে চড় থাপ্পড়-হুঙ্কার এবং কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেল। এখনকার মায়েদের কথায় কথায় শাসন, বলতে বলতে ভাত বাড়ছিলেন নন্দিতা। বিমান বললেন, সন্ধে থেকে খেলছে তো, ওদের এখন খেলায় পেয়েছে। সোজা কথায় ঘুম পাড়ানো যাবে না। টেনে শোয়াতে গেলে দু'চারটে চড় চাপটা লাগবেই। নন্দিতা বিমানের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়েও গিলে নিলেন। ছেলেরা বাথরুম থেকে বেরিয়েছে।

আমরা ছাদে যাচ্ছি, অনেক দিন ছাদে ওঠা হয় না।

অপুকে সংশোধন করে তপু বলল, মানে দিনের বেলা উঠেছি। রাত্তিরে দৃশ্যটা অন্য রকম। পুকুরের চারধারে বাড়ি উঠে গিয়েছে। জলে নিশ্চয়ই রিফ্লেকশন পড়ছে।

অত অজুহাত দেবার কী আছে? ইচ্ছে করছে যা, ছাদের চাবি আলমারির মাথায় আছে। নামার সময় মনে করে তালাচাবি লাগিয়ে আসবি। দরজা খোলা পেলে সকালে কোন ফাঁকে বাচ্চারা একা একা ছাদে উঠে বসে থাকবে, টেরও পাওয়া যাবে না।

নেড়া ছাদ, আমাদেরই ভয় করে।

ছাদে উঠে সিগারেট ধরিয়ে লম্বা একটা টান দিয়ে শব্দ করে ছাড়ল অপু। সত্যিই, এই ফ্রেশ এয়ার কলকাতায় পাওয়া যায় না। তিন দিন থাকলে ভেতরটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

তপুর সামান্য অস্বস্তি হচ্ছিল। গত বর্ষায় মিতালির চাপাচাপিতে ইসিজি করিয়েছিল। ইসিজি দেখে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। তলে তলে এতদূর? ভয়ও পেয়েছিল কিছুটা। সিগারেটটা তখনি ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়েছে, কিন্তু ভেতর থেকে স্পৃহাটা যায়নি। সামনে কেউ খেলে, গন্ধ নাকে গেলে অসুবিধা হয়।

ঘুরে ছাদের অন্য দিকে চলে গেল তপু।

সেই শিউলি গাছটা রে!

গন্ধে ম ম করছে চারপাশ। শিউলির গন্ধ প্রিয় তপুর। উগ্র নয়, আচ্ছন্ন করে। এই গাছটায় সারা বছর ফুল ফোটে। ছোটবেলায় ফুল কুড়োত ভোরবেলায়, ঘাসের ওপর ফুলের আস্তরণ পড়ে থাকত। স্মৃতিগুলো হাত বাড়ালেও ছোঁয়া যায় না, অন্য কারও বলে মনে হয়।

অপু এল না। সিগারেটের সঙ্গে শিউলির গন্ধ যায় না। তপুটা রোমান্টিক, শিউলি-কদম-বকুল ফুল নিয়ে থাকতে ভালবাসে।

মার মেজাজ গরম মনে হল, অপু বলল।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না তপু। পরে বলল, ছুঁচিবাইয়ের জন্য কাজের লোক টেকে না, সকাল থেকে সব একা হাতে করতে হয়। বাবার নেচারও তো জানিস। মেজাজের দোষ কী?

অপু বলল, আমার কিন্তু অন্য রকম মনে হয়।

কী রকম?

এই হম্বিতম্বি রাগ-মেজাজ না থাকলে মার নিজেরই ভাল লাগে না, লাইফটা স্টেল, পানশে লাগে।

হাসল তপু, হতে পারে।

এমন-কী বাবাও সেটা এনজয় করে। দাসত্ব বাবার রক্তে-মজ্জায়। মা

হুকুম করবে বাবা তামিল করবে, এটাই যেন বাবা জন্ম থেকে জেনে এসেছে।

জন্ম থেকে বাবা মাকে চেনে?

ওই হল। আমার এও মনে হয়, বুড়োবুড়ির ওটাই রিক্রিয়েশন। ওটুকু না থাকলে পেট ফেঁপে মরে যাবে।

সিঁড়ির মুখে পায়ের শব্দ হল। বিমান দু'বার কাশির আওয়াজ করলেন। অপু সিগারেট নিভিয়ে ছুঁড়ে দিল দূরে। তপু এগিয়ে গেল, খাওয়া হয়ে গেল?

হ্যাঁ, কিন্তু তোরা এতক্ষণ কী করছিস? ঠাণ্ডা লাগছে না? মাথায় হিম পড়ে ভুগবি শেষকালে। তোদের মা নীচে যেতে বলছে।

এই যাই।

বিমানেরও নীচে যাওয়ার কোনও গরজ দেখা গেল না। মশলা পাকিয়ে সিগারেট খাওয়া অভ্যেস বিমানের। তপু বলে বলেও ছাড়াতে পারেনি। এখন দু'খানায় এসে ঠেকেছে। অবশ্য বাতাস এখানে এত নির্মল, এত পলিউশন ফ্রি যে, দু'টো সিগারেটে মারাত্মক কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে না বলেই তপুর বিশ্বাস।

অপু সরে গেল। তামাকের গন্ধে সিগারেট তেষ্টাটা ফিরে আসছে।

হাওয়া আড়াল করে সিগারেট ধরালেন বিমান, লম্বা একটা পাফ নিয়ে রিং করার চেষ্টা করলেন, তার পর গলা নামিয়ে তপুকে বললেন, তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।

বলো।

বোস।

ঠাণ্ডা সিমেন্টের ওপর থেবড়ে বসল তপু। শিশিরে ভিজে রয়েছে। পাজামার পেছনটা ভিজে উঠছে। নীচে গিয়ে চেঞ্জ করে নিলেই হবে।

আমাদের মোহনপুরের বাড়িটার ব্যাপারে তোর পরামর্শ চাই।

আমার পরামর্শ? কেন?

বাড়িটার লাগোয়া পনেরো-বিশ কাঠা জমি রয়েছে। তিরিশ লাখ পর্যন্ত দর উঠেছে। বিক্রি করে দেব কি না সে ব্যাপারেই তোর মতামত চাইছি।

তপুর মনে পড়ল, একটু আগেই অপু বলছিল, দাসত্ব বাবার রক্তে। ঠিক উল্টোটা। বাবারা তো বংশানুক্রমে জমিদার। ছোট থাকতে বাবার হাত ধরে যখন ঘুরে বেড়াত, তখনও ধানজমি, বাঁশঝাড়, পুকুর, ইটখোলা, বাজার সব মিলিয়ে ষাট-সত্তর বিঘের সম্পত্তি। জমিদারিটা উলের বলের মতো গড়াতে গড়াতে বাবা অবধি এসে ফুরিয়ে গেল। বাবাতে এসে জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটেছে।

তোমার সম্পত্তি, তোমাদের জমিদারি, বিক্রি করবে না দান খয়রাতি করে দেবে, সেটা তোমার ইচ্ছে। আমাদের ওর মধ্যে টানাটানি করা কেন?

তবু তোর একটা মতামত ...

বিমানের দিকে ঘুরে বসল তপু।

দেখো বাবা, খোলাখুলিই বলি। ও সব জমিদারিটারি তো সোজা রাস্তায় হয় না। অনেক মানুষকে ঠকিয়ে ওই সম্পত্তি, অনেকের দীর্ঘশ্বাস ওতে লেগে রয়েছে। তা ছাড়া মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছি। অপু আর ওর বউ দু'জনেই চাকরি করে। আমার মনে হয় ও-ও তোমার ওই সম্পত্তিতে ইন্টারেস্টেড হবে না। কাকু কী বলছে? কথা বলেছ কাকুর সঙ্গে?

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বিমান।

যাব। পিন্টুর সঙ্গে ফোন-এ কথা হয়েছে। সামনের রোববারই যাব। কিন্তু পিন্টু তো আমারই ভাই. ছোট থেকে ওকে দেখছি। কনসিসটেনসির অভাব। কথাগুলোও সব বিশ্বাস করা যায় না। মিত্রা, ওর বউ অনেক বেশি বোঝে। দেখি, দু'জনের সঙ্গেই কথা বলব।

অপু এগিয়ে এল—মা কিন্তু অনেকক্ষণ থেকেই ডাকাডাকি করছে।

বিমানের চোখে ঘনিয়ে এল ত্রাস—চলো চলো!

তপুর মনে পড়ল অপুর কথাটা, দাসত্ব!

৩

আলুপোস্ত দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বিমান বললেন, এই রকম পোস্তই আমার বেশি পছন্দ। হলুদ ছাড়া। পোস্তর স্বাদটা থাকে। তোমাদের বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলে এই রকম সাদা পোস্তর চল। আমাদের দিকে হলুদ ঠেসে পোস্তর বারোটা বাজিয়ে দেয়।

আর একটু পোস্ত দিই? জবাব দেবার আগেই মিত্রা বাটি থেকে হাতায় এক খাবলা তুলে পাতে দিয়ে দিল। বিমান আপত্তি করলেন না। পঞ্চব্যঞ্জন রেঁধে খাওয়ানোর চেয়ে দু'এক পদ যত্ন করে কেউ রান্না করলে তৃপ্তি হয় বেশি।

খেতে খেতে জল খাওয়া অভ্যেস পিন্টুর। তাও গ্লাস থেকে নয়, সরাসরি বোতল থেকে গলায় ঢালে। আড় চোখে সেই দিকে তাকিয়ে বিমানের মনে পড়ল, পিন্টু ছোট থেকেই তাঁর ন্যাওটা। পায়ে পায়ে ঘুরত। ইস্কুলে ভর্তির

সময় বাবা বলে দিয়েছিলেন, সব বলা আছে, টাকা পয়সাও জমা করা আছে। তুই শুধু নামটা খাতায় তুলে দিয়ে আসবি। আর হ্যাঁ, মনে রাখিস, স্কুলের খাতায় পিন্টু নামটা চলবে না। বিমানের সঙ্গে মিলিয়ে বিধান, ওই নামই লিখে দিবি। ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে, দশ বছরের ছোট ভাইয়ের হাত ধরে ইস্কুলে যেতে যেতে বিধান নামটা কয়েকবার আউড়ে ঘেন্না ধরে গেল। বিধান! একটা নাম হল? মিলিয়ে দিতেই হবে? কিন্তু বদলে অন্য একটা নামও যে চাই! নতুন মাস্টারমশাই সদ্য জয়েন করেছেন, সুমিত সান্যাল, বাংলা পড়ান। প্রথম দিন এসেই বই বন্ধ করে গড়গড় করে বলে গেলেন, ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা। ঘুলঘুলির চামচিকেটা পর্যন্ত সুমিতবাবুর ফ্যান। খাতায় নাম তোলার সময় সেটাই মনে পড়ল। লিখে দিলেন সুমিত কান্তি মুখোপাধ্যায়। বাবা টের পেতে পেতে নাম পাকা হয়ে গেল। সুমিত? অবাক হয়েছিলেন বাবা। তবে অনর্থ করেননি।

সেই পিন্টু পাশে বসে বোতলের অর্ধেক খালি করে বলল, রান্নায় মার হাত যেমন ছিল, অমনটা আর দেখলাম না।

মিত্রা উঠে গেল।

পিন্টু বলল, মায়ের রান্না করা ধোঁকার ডালনা মনে আছে দাদা? গরমমশলা দিয়ে গরগরে করে রান্না। কিন্তু যে এক বার খেয়েছে...

মাছের ঝোলের বাটি টেবিলে নামাতে নামাতে মিত্রা বলল, একগাদা গরমমশলা দিয়ে খাবারে স্বাদ সবাই আনতে পারে।

বিমান কথা ঘোরানোর জন্যে বললেন, তোমরা এখানে মাছ পাও কোথায়?

সব চালানি। অন্ধ্রের মাছ। পুকুর বুজিয়ে বাড়ি হচ্ছে, মাছ থাকবে কোত্থেকে? নদী বলতে তো সেই গঙ্গা। বর্ষায় অবশ্য ইলিশ পাওয়া যায়, তাও যা দাম ...

পিন্টুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিত্রা বলল, বর্ষার সময়ে এক দিন আসুন দাদা, ইলিশ খাওয়াব। ভাপে ইলিশ। খেয়ে বলবেন কেমন লাগল।

কাল সন্ধের দিকে ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। সিজনের প্রথম কালবৈশাখী, বাতাসে ঠাণ্ডা ভাব। সকালে ট্রেন অনিয়মিত ছিল। এক ঘণ্টার পথ দু'ঘণ্টার বেশি লেগে গেল। ভয় হচ্ছিল, পিন্টু অফিসে না বেরিয়ে যায়। এসে দেখা গেল ও অফিসে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে, বেলায় যাবে।

তবে ব্রত থাকল না। রেডি হয়েই বসেছিল। সকাল সকাল খেয়ে নিয়েছে। জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলল, জেঠু, আমি আর ওয়েট করতে পারছি না।

কম্পিউটার ক্লাস সেরে টিউশনি পড়িয়ে ফিরব। ফিরতে দেরি হবে। তুমি কি রাত্তিরে থাকছ?

না রে। তোর জেঠিমা একা থাকবে। আজকাল চুরির উপদ্রব হয়েছে খুব।

ঠিক আছে। আমি বেরুচ্ছি। জেঠিমাকে বোলো অনেক দিন আসে না, এবারে যেন এক বার ঘুরে যায়।

তুইও তো যাস না।

তা ঠিক। মা, সত্য এলে বোলো কাল যেন আসে। এসএসসির ফর্ম দিচ্ছে কি না খোঁজ নিয়ে আসব, দিলে একসঙ্গে যাব।

ব্রতর চলে যাওয়া দেখতে দেখতে মন খারাপ হয়ে গেল বিমানের। ভদ্র, মার্জিত ছেলে। গান গাইতে ভালবাসে। আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের মতো চোর-ছ্যাঁচড়-ধান্দাবাজ নয়। তাই ছাব্বিশ বছর বয়েসেও কিছু করে উঠতে পারল না। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। কিন্তু বীর কোথায়? সব তো চোর! তারাই লুটেপুটে খাচ্ছে।

মিত্রা রান্নাঘরে কী একটা ধোয়াধুয়িতে ব্যস্ত। আড়চোখে তাকিয়ে পিন্টু বলল, এর মধ্যে মোহনপুরে গিয়েছিলে না কি?

হ্যাঁ, এ মাসের গোড়ার দিকে।

সব ঠিকঠাক আছে?

মনে তো হল ঠিকই আছে। কিন্তু ফিরে আসার সময় একজনের সঙ্গে কথা হল। অনেক নতুন কথা জানলাম।

কী রকম?

পল্টু না কি আসলে মাফিয়া। প্রোমোটারিটা ওর বাইরের ভড়ং।

কে বলল?

সুরেনকে মনে আছে তোর? আমরা এক সঙ্গে খেলতাম। বাজারে মিষ্টির দোকান। সুরেনের ছেলের সঙ্গে স্টেশনে আলাপ হল। কথায় কথায় ও-ই বলল।

দেখো সে নিজেও হয়তো প্রোমোটারি করে। পল্টুর সঙ্গে রেষারেষি। ব্যবসাগত বিবাদ।

কিন্তু একটা কথা বলল, সেটা ফেলে দেবার নয়।

অম্বলে চুমুক দিচ্ছিল পিন্টু। চোখ দিয়ে জানতে চাইল, কী কথা?

বলল, পল্টুরা না কি জমির দাম কম দিচ্ছে। এখনই তিরিশ লাখ দিতে ও রাজি আছে।

মুখ থেকে বাটি নামিয়ে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল পিন্টু। তার পর ফ্যাসফেসে গলায় বলল, তিরিশ? দেবে?

হ্যাঁ। এক লপ্তে পুরোটা নেবে, থোক তিরিশ লাখ ধরে দেবে। একটাই শর্ত, ডিল কমপ্লিট হবার আগে পল্টু যেন না জানে।

পিন্টু রিপিট করল, তিরিশ লাখ? বলল?

বিমান বললেন, কথা বলি, কী বলিস?

মিত্রা সামনে এসে দাঁড়াল, কী কথা দাদা?

পিন্টু খিঁচিয়ে উঠল, সব কথায় তোমার কী দরকার? দেখছ বিষয় সংক্রান্ত জরুরি আলোচনা হচ্ছে! যাও রান্না করো গিয়ে।

কিছু একটা বলতে গিয়েও গিলে ফেলল মিত্রা। পিন্টু হড়বড় করে উঠে হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখল চিরুনি নেই।

চিরুনিটা?

খুঁজে নাও।

দেখেছ? দেখলে দাদা? নেহাৎ আমি বলেই...

আমি বলেই কী? যাও না, যেখানে ইচ্ছে চলে যাও। কেউ মাথার দিব্যি দিয়েছে? যাবার জায়গা থাকলে কি আর পড়ে থাকতে?

গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল পিন্টু।

চেয়ারে বসে সকালের কাগজটা ওল্টাচ্ছিলেন। খাটের ওপর মিত্রা এসে বসল।

পান খাবেন?

পান? আছে? দাও।

জর্দাটর্দা নেই কিন্তু। খয়েরও না। শুধু পান, সুপুরি আর এক ফোঁটা চুন।

ওতেই হবে।

খাটের তলা থেকে পানের বাটা বের করে একটা পান সেজে বিমানের হাতে দিল মিত্রা। মেয়েটা ঘরোয়া। মন দিয়ে সংসার করে। তবুও অষ্টপ্রহর খিটিরমিটির।

মাথাটা গরম দেখলাম। কিছু হয়েছে?

কিছুক্ষণ মাথা নামিয়ে বসে থাকল মিত্রা, তারপর বলল, আপনাকে কয়েকটা কথা বলার ছিল।

বলো! অত সঙ্কোচ করার কী আছে?

আপনার ভাইকে তো চেনেন। ছাপোষা সরকারি চাকুরে, এত দিন যে ক'টা

টাকা মাইনে পেত চোখে দেখা যেত না। ইদানীং কিছুটা ভদ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু মেজাজটা রক্তে আছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ওর পুরনো রোগ।

পুরনো রোগ? ভাবার চেষ্টা করলেন বিমান। এক বার গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছিল। তার পর মাঝে মাঝেই খিঁচুনি হত। ডাক্তার বলেছিল এপিলেপসি। বেশ কিছু দিন ওষুধ খেতে হয়েছিল। যত দূর জানেন, রোগটা আর ফিরে আসেনি।

কোন রোগের কথা বলছ তুমি?

কেন, ওর গানের ব্যামো, পাগলামি, আপনি জানেন না?

হা হা করে হাসলেন বিমান, তুমি রোগ বলছ? ওটা নেশা। ঠিকই বলেছ, ওটাও রক্তে থাকে। আমার মামাবাড়ির বংশে গান ছিল। শচীনকর্তার সাগরেদ ছিলেন বড়মামা। ছোটবেলায় বাড়িতে তিনখানা হারমোনিয়াম ছিল। একটা কপলার, যাকে তোমরা স্কেলচেঞ্জিং বলো। আমারও রোগটা ছিল। ছিল কেন, এখনও আছে।

না দাদা, আপনার ওটা নেশাই। তার বেশি নয়। আপনার ভাইয়ের ওটা রোগ। যে রোগে পরিবার ভেসে যায়, অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান থাকে না।

সিরিয়াস টোনে কথা বলছে মিত্রা। সংযত হলেন বিমান।

কেন? কিছু হয়েছে?

হ্যাঁ দাদা। অনেক কিছু হয়েছে। আগেই আপনাকে জানানো উচিত ছিল। এখন হাত কামড়াচ্ছি।

কী হয়েছে খুলে বলো।

সন্তু দত্তর নাম শুনেছেন?

কোন সন্তু দত্ত?

গান গায় যে সন্তু দত্ত, 'বালুকাবেলায়' সিনেমায় প্লে-ব্যাক করেছিল?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কী করেছে সন্তু?

সন্তুর ভাই, তার নামও পিন্টু। তার সঙ্গে দোস্তি হয়েছে আপনার ভাইয়ের।

তাতে কী ক্ষতি হল?

ক্ষতি বলে ক্ষতি? আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল দাদা।

চোখে আঁচল চাপা দিল মিত্রা।

অস্বস্তি হচ্ছিল বিমানের। কিছু একটা ঘটেছে। কী বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েদের এই এক সমস্যা। আসল কথায় আসতে এত সময় নেয়।

গায়ক-বাদকদের জীবন তো জানেনই। টাকা উড়ছে। আরও কত রকম

আকর্ষণ! আপনার ভাই কিছু দিন হল নেশা করতে শুরু করেছে।

কী সাংঘাতিক?

তাও মেনে নিয়েছিলাম। পুরুষমানুষ, জমিদারের রক্ত। সামলে চললেই হল। ইদানীং ওর মাথায় চেপেছে আর এক বদখেয়াল। ক্যাসেট বের করবে। সঙ্গে সিডি।

তার মানে?

গান গাইত, অফিসে, জলসায় ডাক আসত, খারাপ লাগত না। ওই রকমই কোনও ফাংশনে পিন্টু দত্তর সঙ্গে ওর আলাপ। লোকটা মোদো মাতাল, বদমাইশ, চোখ দেখলেই গা ঘিনঘিন করে। ও না কি আপনার ভাইয়ের গান শুনে পাগল। কোন রেকর্ড কোম্পানির ডিরেক্টর-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তারাই ওকে বলেছে, ক্যাসেট বের করে দেবে। হাজার তিরিশ টাকা ওকে ইনভেস্ট করতে হবে। বাকিটা—প্রচার—বিক্রি—আনুষঙ্গিক যা কিছু কোম্পানির দায়িত্ব।

কী করল পিন্টু?

দিয়ে দিয়েছে টাকা।

বলো কী?

হ্যাঁ। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ধার নিয়ে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে বসে আছে।

তুমি কিছু বলনি?

জানলে তো? দিয়ে থুয়ে তার পর আমাকে জানাল।

নিজে থেকেই বলল?

তা বলতে পারেন। ক'দিন ধরে দেখছিলাম, মেজাজটা ফুরফুরে। কথায় কথায় গান। হুট করে একটা শাড়ি কিনে আনল। বাইরে খাওয়াতে নিয়ে গেল। সুযোগ পেয়ে চেপে ধরলাম, ব্যাপারটা কী। বাবু বললেন, জানো তো, পয়লা বৈশাখে আমার ক্যাসেট বেরচ্ছে সুরলহরী থেকে। আমার তো মাথায় হাত। কী বলল জানেন? বলল, এক বার ক্যাসেটটা বেরতে দাও। এক মাসের মধ্যে এক লাখ ক্যাসেট বিক্রি হয়ে যাবে। আমাদের হাল ফিরে যাবে।

এই সব ওর মাথায় কে ঢুকিয়েছে?

ওই পিন্টু দত্ত।

মহাবিপদ হল দেখছি!

বিপদ বলে বিপদ? ওকে জপাচ্ছে আরও বড় ইনভেস্টমেন্ট-এর জন্য।

আবার কী ইনভেস্টমেন্ট?

ওর দাদা ফিল্ম প্রোডিউস করছে। সেখানে ওকে গান গাইতে দেবে। একটাই শর্ত, ওকে পাঁচ লাখ টাকা ইনভেস্ট করতে হবে।

কিন্তু ও পাঁচ লাখ টাকা পাবে কোথায়?

ও বলছিল, আপনাদের বাড়ির লাগোয়া জমি আছে মোহনপুরে। ওখানে প্রপার্টির ভাল দাম। সেখান থেকে টাকা তুলে সিনেমায় ঢালবে।

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল বিমানের। তাই ত্রিশ লাখ দর শুনে চোখ চকচক করে উঠেছিল পিন্টুর। শুনে ফেলবে বলে মিত্রার কাছ থেকে কথা লুকিয়েছিল।

দাদা।

বলো।

ব্রতকে তো আপনি জানেন। অর্ডিনারি ক্যালিবারের ছেলে। বাবার মতো একটা চাকরি জুটিয়ে নেবে সে ক্ষমতাও নেই। বয়েস হয়ে গেছে, আমার পক্ষেও নতুন করে কিছু করা সম্ভব নয়। সম্বল বলতে ওই সম্পত্তিটুকু। সেটাও যদি আপনার ভাই উড়িয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেয়, ছেলেটার হাত ধরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

আরে! অত দূর ভেবে নিচ্ছ কেন? আমরা আছি কী করতে? পিন্টুকে টাকা নয়ছয় করতে আমরা দেবই বা কেন?

না দাদা। দেখবেন টাকা ওর হাতে যেন কোনওভাবেই না পৌঁছয়। সবচেয়ে ভাল হয়, টাকার বদলে যদি কোনও আয়ের ব্যবস্থা করা যায়। রেগুলার ইনকাম। ছেলেটার জন্যও চিন্তা থাকে না।

ছাত্রী খারাপ ছিল না মিত্রা। অসবর্ণ বিয়ে। বিমানই পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন মনে হচ্ছে পিন্টুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মেয়েটার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছেন।

তুমি চিন্তা কোরো না। আমি থাকতে কোনও বিপদ ঘটবে না।

চোখ মুছে উঠে গেল মিত্রা, যাই, চা করে নিয়ে আসি।

৪

ভাগ্য! কপাল!

যতই লোকে বলুক, ভাগ্যটাগ্য ও সব বাজে কথা, নন্দিতা জানেন লোকটা শুধু কপাল জোরেই করে খেল। আয়েস করে জীবনটা কাটিয়ে গেল। কুটোটুকুও তুলে রাখতে হল না।

প্রথমেই ধরো জন্মটা। চোদ্দো পুরুষের জমিদারি। আগে না কি দেউড়িতে হাতি বাঁধা থাকত। হাতি না থাক, পুরনো অস্টিন গাড়ি একখানা ছিল, যুদ্ধের বাজারে কেনা, শাশুড়ি গঙ্গাস্নানে যেতেন, মাঝরাস্তায় খারাপ হয়ে গেলে ঠেলতে হত। নয় নয় করেও জমিজায়গা, পুকুর, বাঁশঝাড়, আমবাগান সব মিলিয়ে সম্পত্তি কিছু কম ছিল না। অর্ধেক তিন ননদের বিয়ে দিতে গেছে, কিছুটা বর্ডার পার হয়ে আসা রিফিউজিরা দখল করে নিয়েছে, বাকিটা শ্বশুর নিজের জীবদ্দশাতেই উড়িয়ে শেষ করে গেছেন। তাতে ছেলেবেলাটা আমিরি চালে কাটাতে তাঁর ছেলেদের আটকায়নি। পায়রা ওড়ানো ছাড়া সব ছিল। বন্দুক কাঁধে হরিয়াল শিকারে যেত, তার ছবি দেখেছেন। বিশ্বকর্মা পুজোয় ঘুড়ির মেলা বসত, সেখানে দু'শ' ঘুড়ি ওড়াত জমিদারনন্দন। কম্পিটিশনে বাইশ ফুট উঁচু তুবড়ি জ্বালিয়ে ট্রফি জিতেছিল। রাবড়ি ছাড়া বাবুর জলখাবার হত না। কলকাতা থেকে কারিগর আসত জামার মাপ নিতে। কপাল না হলে কেউ এমন পরিবারে জন্মায়?

লেখাপড়ার নামে অষ্টরম্ভা। ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়ে বাবু ফুটবল খেলতে মধ্যপ্রদেশ চলে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, প্রাইমারি স্কুল খুললে কেমন হয়? তেমনি বাবা। কোথায় নড়া ধরে টানতে টানতে পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাবে, তা নয়, বড় ছেলের এক কথায় রাজি। ভাগ্যে শাশুড়ি ছিলেন, বেঁকে বসেছিলেন। ছি ছি, আমার ছেলে অশিক্ষিত মূর্খ হয়ে থাকবে? তাঁরই চাপাচাপিতে ম্যাট্রিক উৎরানো। ঋষি বঙ্কিম-এ ভর্তি হল ইন্টারমিডিয়েট পড়তে। পালিয়ে স্কুল গড়তে চলে এল। জমিদারতনয় রোভার সাইকেল চালিয়ে পড়াতে যায়। গ্রামের মেয়ে বউরা জানলার খড়খড়ি ফাঁক করে দেখে।

স্কুল প্রাইমারি থেকে এমই হল। তার ওপরে উঠতে গেলে ট্রেন্ড টিচার লাগবে। কো-এডুকেশন স্কুল, ছেলে-মেয়ের একসঙ্গে লেখাপড়া। মাস্টারনি রাখতে হবে। যাকেই রাখা হোক বেগার খাটতে আসবে না, মাস মাস মাইনে

দিতে হবে। গ্রান্ট-ইন-এডের জন্য দরখাস্ত করা হল। চাঁদা তুলে বিল্ডিং হল। জমিদারবাড়ি থেকে নগদ টাকাও ঢালা হল স্কুলে।

সেই স্কুলে জয়েন করলেন নন্দিতা। কপাল! নইলে কোথায় নন্দিতা, আর কোথায় গ্রাম্য জমিদারের বড় ছেলে বিমান। গ্রহের ফের ছাড়া এমন হয়? চেহারাখানা ছিল অবশ্য রাজপুত্রের মতো। টকটক করছে গায়ের রং, খাড়া নাক, চওড়া কপাল, একমাথা ঝাঁকড়া চুল। ফেঁসে গেলেন নন্দিতা।

নন্দিতার হাতে না পড়লে কিন্তু মানুষটা সেই ভাগাড়েই পড়ে থাকত। ফাঁপা জমিদারি, আশি টাকার মাস্টারি, গ্রাম্য রাজনীতি, আদিরসাত্মক আলোচনা! নন্দিতা চাইলেন মানুষটাকে তুলে আনতে। তাঁরই চাপে বিমানের লেখাপড়ার নতুন করে সূচনা। ইন্টারমিডিয়েট, বিএসসি, এমন কী বিটিটাও করে ফেলল। আর তখনই কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে নন্দিতা ঝাঁপালেন। দু'জনের এক জায়গায় চাকরি। সবচেয়ে বড় কথা, জায়গাটা মোহনপুর থেকে আশি মাইল দূরে। বিমানের আপত্তি ছিল। আসবে না বলে ধনুর্ভাঙা পণ করে বসেছিল। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পেয়েও তিন মাস জয়েন করেনি। নন্দিতা কোনও কথাই শোনেননি। দুই ছেলের হাত ধরে চাকরিস্থলে গিয়ে ঘরভাড়া করেছিলেন। আসার সময় শ্বশুর বলেছিলেন, যাচ্ছ যাও, কিন্তু মনে রেখো, যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, তা আর খোলা থাকবে না। নন্দিতা জবাব দেননি। মনে মনে বলেছিলেন, ফিরে আসতে যেন না হয় সেই আশীর্বাদই করুন বাবা।

আসতে হয়নি। বিমানকেও নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। প্রথম দিকে খুব অস্থির হয়ে থাকত মানুষটা। ছটফট করত। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল। এক স্কুলে মন টিকছিল না। স্কুল বদলাল। শহরের কাছাকাছি একটা গ্রামের স্কুলে কাজ নিয়ে চলে গেল। গ্রাম ভালবাসত। নন্দিতা না করেননি। নাড়ি ছিঁড়ে তুলে এনেছিলেন। ওটুকুও না দিলে যদি আবার ফিরে যেতে বায়না করে?

কিন্তু না গিয়েও কি কম পেয়েছে? সম্মান, প্রতিষ্ঠা, পরিচিতি, মোহনপুরে সারাটা জীবন পচলেও জমিদারবাড়ির বড় ছেলের চেয়ে বড় কোনও পরিচয় থাকত? শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠা? এই যে পেল মানুষটা, পেল কার কৃতিত্বে? অথচ সব কিছুর পেছনে যার অবদান, তাকে কোনও দিন প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি। যাক গে। কপাল! নন্দিতা তো সেই কপাল করে আসেননি!

সন্তানভাগ্য! ছেলেদের লেখাপড়ার কোনওদিন খোঁজটুকুও নিল না; কোথায় পড়বে, কী নিয়ে পড়বে, প্রাইভেট টিউশনি দরকার কি না, কোন সাবজেক্ট-এ উইক। সারাটা জীবন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াল। ছেলে

কোন ক্লাসে উঠল সে খবরটা পর্যন্ত রাখত না। অথচ তপু যেবার স্টার পেয়ে পাস করল, ডাক্তারিতে চান্স পেল, লোকজন বাড়ি বয়ে অভিনন্দন জানিয়ে যেতে লাগল, এমন ভাবে হাসি হাসি মুখে পা ছড়িয়ে বসে থাকত, যে কেউ ভাবত পুরো কৃতিত্বটাই ওর। বিমানবাবুর ছেলে ভাল রেজাল্ট করেছে, বিমানবাবুর ছেলে ডাক্তার হয়েছে। কে রে বিমানবাবু? বিমানবাবু কোনওদিন খোঁজ নিয়েছে? তপুর ডাক্তার হওয়া হত, মা না থাকলে?

ছেলেরা অবশ্য সংসারে বাবার কনট্রিবিউশন ছোট থেকেই দেখে আসছে। তবু বাবার অনুমতি নিয়েছে। তা সে লাইন চুজ় করার সময়ই হোক, আর বিয়ে করার আগেই হোক। নন্দিতা বাধা দেননি। চেয়েছেন ছেলেরা বাবাকে তার সম্মানটুকু দিক। প্রাপ্য কি না সে প্রশ্ন পরের।

পেয়েই গেল। সারাটা জীবন কাউকে এই ভাবে পেয়ে যেতে দেখেননি নন্দিতা। কেউ যেন অলক্ষ্য থেকে শুধু দিয়েই গেল মানুষটাকে। ভাগ্য নয়? এর পরেও কপাল বলে কিছু নেই, মেনে নিতে হবে নন্দিতাকে?

বাজারে ঢুকেই সত্যমাস্টারের খপ্পরে পড়ে গেলেন বিমান। তিনিও আজীবন মাস্টারি করে এসেছেন, কিন্তু তাঁকে কেউ বিমানমাস্টার বলে ডাকে না। অবশ্য সত্য অধিকারী মাস্টারি শুধু স্কুলেই করেননি, তল্লাটের সমস্ত অবোধ শিশুকে তবলায় চাঁটি মেরে বোল তুলতেও শিখিয়েছেন। একাধারে শিক্ষা ও সঙ্গীতের মাস্টার।

কিন্তু সত্যমাস্টারের মাস্টারি কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের আঙিনায় কিংবা সঙ্গীতের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই আটকে থাকেনি। তাঁর শিক্ষাদান ব্যাপক ও বিস্তৃত।

এই যেমন বাজারের মুখেই সত্যমাস্টার বিমানকে ধরে ফেললেন। বিমান চমকে উঠেছিলেন। রোগা লিকলিকে হাতের আঙুল তাঁর মণিবন্ধে চেপে বসেছে। পাগলটাগল না কি? হাত ছাড়াতে গিয়ে নজর পড়ল।

সত্যদা আপনি?

কী ভেবেছিলে? না দেখার ভান করে কেটে পড়লে ধরতে পারব না? আজ তোমায় ছাড়ছি না।

প্রমাদ গুনলেন বিমান। গজেনের মিষ্টির দোকানে দাঁড়িয়ে জিলিপি খাচ্ছেন সত্য। জিলিপির রস তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে জামায় পড়ছে। জামাটায় মাস তিনেক সাবান পড়েনি। জিলিপির রসে তার স্বাদ বা বর্ণের তারতম্য ঘটছে না।

কিন্তু সত্যর দু' হাতেই রস। তার একটা দিয়ে শক্ত করে ধরে আছেন বিমানকে। ছেড়ে দিলেও রসের ছাপ সহজে উঠবে না।

জিলিপি খাচ্ছেন? আপনার না ডায়াবিটিস?

ডায়াবিটিস? আমার? ছিল। সারিয়ে ফেলেছি। যোগব্যায়াম করে। তোমাকেও শিখিয়ে দেব। তা ছাড়া, কালকেই কাগজে লিখেছে, ডায়াবিটিসে জিলিপি খাওয়া বারণ নয়।

কোন কাগজে লিখেছে জিজ্ঞেস করলে, সত্য যেমন তেমন একটা উত্তর দিয়ে দেবেন। কিন্তু এখন এ পাগলের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে কীভাবে?

সত্যদার ফেভারিট টপিক-এ আলোচনাটা ডাইভার্ট করানোর চেষ্টা করলেন বিমান।

আপনার পেনশনের চিঠি এল?

ও আর আসবে না। এ জীবনে নয়। খাওয়াতে হয় বুঝেছ? ডিআই অফিস থেকে এজি, সমস্ত জায়গার শালারা হাঁ করে বসে আছে। কোনওটা বড়, কোনওটা ছোট। না খাওয়ালে হাঁ বন্ধ হবে না। পেনশনও আসবে না।

বলতে বলতে বিমানের দিকে চোখ পড়ে গেল। তোমার কী খবর? পেনশনের চিঠি এসেছে?

এসেছে। টাকা পেতে শুরুও করেছেন। ঘুষ না দিয়েই। কিন্তু কথাটা সত্যকে বলা যাবে না। তা হলে সত্য ধরে নেবেন, বিমান টাকা দিয়েই পেনশন আদায় করেছেন। এবং সেক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় কত টাকা দিতে হয়েছে, তার বিস্তারিত না জেনে সত্য ছাড়বেন না।

না দাদা, ও আর এ জীবনে আসবে না।

প্রীত হলেন সত্য। তৃপ্তির হাসি হাসলেন। বিমানের দিকে চোখ রেখে বললেন, কেউ না। কেউ রিটায়ার্ড শিক্ষকদের কথা ভাবে না। আমরা তো বুড়োঘোড়া। মাল বইতে পারি না। স্লোগান দিতে পারি না। বাইরের কথা বলে কী লাভ? নিজের লোকেরা? মুখে রক্ত তুলে, না খেয়ে, না পরে যাদের বড় করে তুললে তারা? কেউ দ্যাখে? স্বার্থপর, সব স্বার্থপর! বুঝলে হে, নিজেরটা এখন থেকে গুছিয়ে রাখো, না হলে পরে পস্তাতে হবে।

নিজের জন্য কী ঠিক করে রাখব সত্যদা?

কেন? আসল কাজটাই তো বাকি। মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে, পচে গন্ধ বেরুবে, শেয়ালে শকুনে ঠুকরে খাবে, কাঁধ দেবার লোক পাওয়া যাবে না। টাকা না থাকলে শ্মশান থেকেও বডি ফিরিয়ে দেয় জানা আছে?

হিন্দু সৎকার সমিতিই না হয় নিয়ে পুড়িয়ে দেবে।

তোমার মুন্ডু। কিস্যু জানো না। ওরাও মুখে আগুন ছুঁইয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। খাতায় নাম তুলে দিলেই হল। ওপর থেকে টাকা পেয়ে যায়।

জিলিপি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। রস লাগা হাতটা জামার পকেটে ঢোকানোর ভঙ্গি করলেন। তারপর বিমানের দিকে তাকালেন।

তোমার কাছে পাঁচটা টাকা হবে?

খুচরো নেই সত্যদা।

গজেন। বাবুর টাকাটা ভাঙিয়ে খুচরো করে দে তো! আমার টাকাও কেটে রাখিস।

পাঞ্জাবির ঝুলে হাত মুছতে মুছতে সত্যমাস্টার এগিয়ে গেলেন। পঞ্চাশ টাকার নোট ভাঙিয়ে বাকি টাকা ফেরত দিয়ে গজেন বলল, সেয়ানা পাগল মশাই। রোজ কাউকে না কাউকে মুরগি করে। আজ আপনার ওপর দিয়ে গেল।

প্রথমেই সবজির বাজার।

ডানপাশে অধীর নিয়ে বসেছে পটল, পেটমোটা জলভরা পটল। বিমান জানেন, ওগুলো রং করা। পটল, বেগুন, কুমড়ো সমস্ত রং করা। মাটি মাখানো আলু, গামলায় ফেলে জলের মধ্যে কচলে ধুলেই গা থেকে সমস্ত রং আর মাটি উঠে আসবে।

মাটিতে রাসায়নিক মিশিয়ে মুলোর সাইজের পটল, কাঁচকলার মাপের ঢ্যাঁড়শ আর চালকুমড়োর মতো বেগুন ফলানো হচ্ছে। লোকজন হামলে পড়ে কিনছে।

মানুষ কি জানে না? মানুষ মূর্খ? অমৃত ভেবে বিষ কিনে নিয়ে যাচ্ছে? ছোটদের সঙ্গে এক থালায় বসে খাচ্ছে? একটা প্রজন্ম বিষের ভারে নীল হয়ে যাচ্ছে।

বিমানের মনে হল ভুল! মানুষ বিষ ভেবেই বিষ কিনছে। মানুষ জেনে গিয়েছে সবজিতে রাসায়নিক মেশানো থাকবে, মশলায় থাকবে চামড়ার গুঁড়ো, ওষুধের মোড়কে ধুলো-বালি-আবর্জনা। ভেজাল খাবার জাল ওষুধ নকল জিনিসে নিজেকে সইয়ে নিতে শিখে নিচ্ছে মানুষ। এই ভাবেই মানুষের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে অন্য এক মানুষ।

বিদেশে জন্ম দু'বছরের শিশুকে নিয়ে দেশে ফিরেছিল তাঁরই এক সহকর্মীর মেয়ে। বাচ্চাটা এয়ারপোর্ট থেকেই কাশতে শুরু করল। দু'দিনের মধ্যে জ্বর।

জ্বর থেকে নিউমোনিয়া। কোনও ওষুধেই ধরে না। বাচ্চার মা পড়িমরি করে ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। অথচ এইখানে এই দেশেই ঘরে ঘরে বাচ্চা জন্মাচ্ছে, বিষ খেয়ে বড় হচ্ছে, অসুখ-বিসুখে ভুগছে না তা নয়, জাল ওষুধেই রোগ পালাচ্ছে। দেখতে দেখতে সে দিনের শিশু শালপ্রাংশু যুবক হয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিমানের মনে হল, আপাতদৃষ্টিতে সব ঠিকঠাক চললেও দু'টো জায়গায় সমস্ত নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। প্রথম, মানুষের পারসেপশনের জায়গাটা। মানুষ ধরেই নিচ্ছে সমস্ত জাল, সব বেঠিক, ভাল বলে কিছু নেই। ফলে চাল কিনতে গেলে এক কেজির দাম দিয়ে নশো পাওয়া যাবে লোকে ধরে নিচ্ছে, ট্যাক্সি ড্রাইভার মিটারে কারচুপি করে ভাড়া বাড়িয়ে রাখবে ধরে নিচ্ছে সবাই। এই বোধটাই মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নেমে আসছে। ফলে ছাত্র ক্লাসের চৌহদ্দিতে পুরো শিক্ষা পাবে না ধরে নিয়ে প্রাইভেট কোচিং-এ যাচ্ছে, রোগী হাসপাতালে যথাযথ চিকিৎসা পাবে না ধরে নিয়ে চেম্বারে দেখাতে যাচ্ছে, পুলিশ বিপদে পড়া মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে তখনই, যখন দেখবে সেই মানুষটার পুষিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে। মানুষের ওপর মানুষের বিশ্বাসের ভিতটাই আলগা হয়ে যাচ্ছে।

এই জায়গা থেকেই মানুষ নিজের ওপরও বিশ্বাসটা হারিয়ে ফেলছে। হারিয়ে ফেলছে মূল্যবোধ, চলে যাচ্ছে বাবা-মার প্রতি দায়িত্ববোধ, স্বামী-স্ত্রীর প্রতি আনুগত্য, সন্তানের প্রতি কর্তব্য, একদল স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব যন্ত্রমানব সভ্যতাকে আকীর্ণ করে চলেছে।

এ কি সভ্যতার এক মহাসঙ্কট নয়?

বিমান আবিষ্কার করলেন, সবজির বাজারের এক কোনায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একা! মানুষ ভিড় ঠেলে যেতে যেতে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে, রাস্তা আটকে আছেন বলে বিরক্ত হচ্ছে, অস্ফুটে দু'একটা মন্তব্যও ছুড়ে দিচ্ছে আলটপকা। সভ্যতা বা তার সঙ্কট নিয়ে আপামর জনসাধারণের কোনও মাথাব্যথা নেই।

তিনিও কি সত্য মাস্টারের মতো উন্মাদ হয়ে যাচ্ছেন?

দু'য়েকটা তরিতরকারি থলিতে ঢুকিয়ে মাছের বাজারে গেলেন বিমান। ঘড়ি দেখলেন। দেরি হয়ে গেছে। ভেটকি এসেছিল বাজারে। বেছে আড়াইশো ভেটকি নিলেন। ধুতিতে কাদা লেগে গিয়েছিল। বাইরে এসে ব্যাগটা নামিয়ে কলের জলে কাদা ধুতে ধুতে বিমানের মনে পড়ল, তিনি তো মাছ-মাংস খাওয়া

ছেড়ে দিয়েছেন। তবুও যে খুঁজে পেতে ভাল মাছটা নন্দিতার জন্য কেনেন এর কী ব্যাখ্যা?

অঙ্ক করিয়েছেন সারাটা জীবন। চিরকাল ভেবে এসেছেন, জীবনটা আসলে অঙ্কের ফর্মুলার অ্যাপ্লিকেশন। ঠিক জায়গায় ঠিক ফর্মুলার প্রয়োগে ঠিক উত্তরে পৌঁছে যাওয়া যায়।

এই সায়াহ্নে পৌঁছে বিমানের ধারণা, অঙ্ক নয়, মানুষের জীবনে যে শাস্ত্রটার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি সেটা রসায়ন। ঠিক জিনিসের সঠিক অনুপাত ও তার যথাযথ প্রয়োগ, সফলতার এর চেয়ে বড় মেডইজি কিছুই হতে পারে না।

৫

পরমার্থ হাতের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল, এলিয়ে বসল সোফায়।

একটা দেশ বড় হয় বুঝলি, টাকায় নয়, শিক্ষাতেও নয়, হয় ডিসিপ্লিনে। আশ্চর্য নিয়মের শৃঙ্খলা! কোথাও এতটুকু নড়চড় হবার উপায় নেই. অসততা, লোক ঠকানো, জালিয়াতি, ফেরেববাজি ওদের কল্পনার বাইরে।

তার মানে তুই বলতে চাস, ও দেশের সব লোকগুলো ধোয়া তুলসীপাতা? চোর, বদমায়েশ নেই। জেলখানায় ঘুঘু চরছে? বরং উল্টোটাই শুনেছি, ওখানে শতকরা কুড়িভাগ মানুষই জীবনের কোনও না কোনও সময় জেলের ঘানি ঘুরিয়েছে। জেলখানা থইথই করছে মানুষে। ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকলে চাকরি পাওয়া যাবে না, এমন নিয়ম থাকলে ওদেশের মানুষ ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াত।

যা শুনেছিস সেটা ঠিক, আবার ভুলও বটে। যে সব ক্রাইমকে আমরা ক্রাইম বলেই ধরি না সেগুলো ওখানে বড়সড় অফেন্স। রাত্তিরের ট্যাক্সি বা লাস্ট ট্রিপের বাস, ড্রাইভার নেশা না করে চালাচ্ছে, এখানে তুই ভাবতে পারিস? ও দেশে মদ খেয়ে গাড়ি চালানো? এক বার ধরা পড়লে হয়ে গেল। পাড়ায় মাস্তানি মারামারি হুলিগানিজম যে কোনও অভিযোগে পুলিশ তুলে নিয়ে যাবে। এবং তোমার দায়িত্ব নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা। ছোটখাটো জেলখাটা কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই নেয় না।

যজমান বামুনের ছেলে পরমার্থ সদ্য আমেরিকা ঘুরে এসেছে। এক ঢিলে দুই পাখি। ছেলেকে ওখানে ভর্তি করেছে, এক বার দেখে আসা হল।

উপলক্ষটা অবশ্য চোখের ডাক্তারদের ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করা। এসে মদের গ্লাসে ঠোঁট ছুঁইয়ে বিদেশের অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছে।

কনফারেন্স কেমন হল?

যেমন হয়। গোটা পনেরো ভাল পেপার, বাকিগুলো রদ্দি। যারা অ্যাটেন্ড করতে গেছে, বিশেষ করে থার্ড ওয়র্ল্ড থেকে, তাদের অনেকেরই ধান্দা মার্কেটিং আর দেশ দেখা।

উঠেছিলি কোথায়?

আমি যেটায় ছিলাম, সেটার নাম হ্যাম্পটন ইন। খুব এক্সপেনসিভ নয়, তবে ব্যবস্থাপত্তর ভাল।

ফিনিক্স-এই ছিলি, না কোথাও বেড়াতে টেড়াতে...

বলিস কী? ফিনিক্স-এ গিয়ে না বেড়িয়ে চলে আসব?

পিউ হাঁ করে পরমার্থর কথা গিলছিল। বলে উঠল, ফিনিক্স কোন স্টেট-এ কাকু?

অ্যারিজোনা।

অ্যারিজোনা? গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন?

রাইট। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখতেই তো গিয়েছিলাম।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন তুমি দেখেছ?

দেখব না? অত কাছে গিয়ে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন না দেখে ফিরে আসব?

কেমন দেখতে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন? ম্যাকেন্নাস গোল্ড-এ যেমন দেখায়?

তার চেয়েও সুন্দর, ওরা বলে অসাম। আর গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে যাবার পথে আর একটা জায়গা পড়ে, তার নাম সেডোনা। সেটাও ভারী চমৎকার।

মিতালি ঘুরে ঘুরে স্বাতীর সঙ্গে কথা বলছিল। পরমার্থর কথাগুলো কানে গিয়েছিল নিশ্চয়। সোফায় এসে বসল। বলুন না আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্ত। গোড়া থেকে।

গ্লাসের তলানিটুকু গলায় ঢেলে পেপার ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছল পরমার্থ। সোফায় পা তুলে আরাম করে বসল।

জোজোর কাছে মিনিয়াপোলিস-এ তিন দিন থেকে ফিনিক্স-এ যাবার কথা। মিনিয়াপোলিস-এও হ্যাম্পটন ইন আছে, সেম চেন অব হোটেলস। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, আমাকে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ঘুরিয়ে দাও। বললে বিশ্বাস করবে না, ফিজিক্যালি যেতেও হল না। সমস্ত ঠিকঠাক করে আমাকে জানিয়ে বলল, তুমি ফিনিক্স এয়ারপোর্টে নেমে শুধু ফোন করে দিও। বাকি দায়িত্ব আমাদের।

খালি গ্লাসটা স্বাতীকে দেখিয়ে পরমার্থ ইঙ্গিতে বলল ভরে দিতে। স্বাতী ভরে এনে পরমার্থর হাতে দিল।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ফিনিক্স এয়ারপোর্টে নেমে ফোন বুথ-এর সামনে গিয়ে দেখি সমস্ত লিডিং হোটেলের নাম আর পাশে একটা করে নাম্বার। হ্যাম্পটন ইন-এর নাম্বার ছিল তেরো। ফোন করতেই ওপাশ থেকে উষ্ণ কণ্ঠস্বর, হাই, হ্যাম্পটন ইন থেকে বলছি, কীভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি? বললাম, এয়ারপোর্টে এসে গেছি, তোমাদের হোটেল-এ আমার বুকিং আছে। কম্পিউটার দেখে সঙ্গে সঙ্গেই বলল, হ্যাঁ। তোমার কনফার্মড বুকিং আছে। তা তোমার কি পিক আপ গাড়ি লাগবে? আমতা আমতা করে বললাম, পেলে তো ভালই হয়। উত্তর এল, তুমি লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারে যে ডায়মন্ড মার্ক আছে সেখানে দাঁড়াও। আমাদের গাড়ি পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে। চোদ্দো মিনিটের মাথায় ঘ্যাঁচ করে একটা গাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে বলল, মিস্টার পরম? ওয়েলকাম স্যার, আই অ্যাম ফ্রম হ্যাম্পটন ইন। ...একটু ফ্রাই দেবে স্বাতী?

স্বাতী বাধ্য মেয়ের মতো আভেন থেকে গ্রিলড চিকেন বের করে পরমার্থর সামনে রাখল।

হোটেলে গিয়েই খোঁজ নিলাম, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন যাবার ব্যাপারে কী ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর দিন কনফারেন্স-এ যাওয়া হবে না। তার পর দিন যাব, সেটাই প্ল্যান ছিল। রিসেপশন থেকে কানেক্ট করে দিল। যে ট্রাভেল কোম্পানি নিয়ে যাবে তারা সকাল আটটায় পিক আপ করবে। প্রথম দিন সেডোনা। দ্বিতীয় দিন গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। টাকা-পয়সা অ্যাডভান্স করতে চাইলাম, বলল, দরকার নেই। হোটেল বিল-এর সঙ্গেই অ্যাডজাস্ট করে নেবে। হোটেল বিলও মজার, উইক-ডে আর উইক-এন্ড-এ ঘর ভাড়ার রেট আলাদা।

চিকেন-এ কনসেনট্রেট করল পরমার্থ। সামনে বসে পিউ। পরমার্থর হঠাৎ কথা থামিয়ে দেওয়া ওর পছন্দ হচ্ছে না।

কী হল কাকু, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন?

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। নির্দিষ্ট দিনে ঠিক সকাল আটটায় ঘরে ফোন, আপনার গাড়ি পোর্টিকোতে অপেক্ষা করছে। ব্রেকফাস্ট হয়ে গিয়েছিল। একটা হাতব্যাগ-এ চেঞ্জ আর সামান্য টুকিটাকি জিনিস ভরে নিয়েছিলাম। লবিতে গিয়ে দেখি এক হ্যাণ্ডসাম আমেরিকান আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে হাত বাড়িয়ে বলল, হাই, আই অ্যাম ডেভিড। থ্যাঙ্ক ইউ ফর

সিলেকটিং গ্র্যান্ড ট্রাভেলস। দ্য কার ইজ ওয়েটিং আউটসাইড। গাড়িতে উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।...রাস্তাটা ভারী সুন্দর, সোজা, দু'পাশে গাছপালা বেশি নেই, ছোট-ছোট ক্যাকটাস...

কাকু, ও সব রাস্তাটাস্তা ভাল লাগছে না। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন কখন পৌঁছুলে সেটা বলো?

গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে তো পৌঁছুলাম না?

তার মানে? এই যে বললে, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখতে যাচ্ছ, এখন বলছ গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে পৌঁছলাম না! ইয়ার্কি হচ্ছে?

বললাম না, আগে সেডোনা। প্রথম দিন লাঞ্চ আওয়ারে গিয়ে পৌঁছলাম সেডোনায়। সেখানে একটা মোটেল-এ আমাকে ছেড়ে দিয়ে ডেভিড তার গাড়ি নিয়ে অন্য প্যাসেঞ্জারদের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখাতে চলে গেল।

আর তুমি?

প্রথম দিন সেডোনা দেখলাম।

সেডোনা কেমন জায়গা?

অদ্ভুত! অসাধারণ! লাল পাথরের ছোট-ছোট পাহাড়। এক একটার এক-এক রকম চেহারা। কোনওটা মানুষের মুখ, কোনওটা অস্ত্র হাতে গ্ল্যাডিয়েটর, কোনওটাকে দেখলে মনে হবে অ্যাস্ট্রোনট। কাছেই একটা ঝর্না, সেখানে থেকে নেমে এসেছে নদী। কিছুটা দূরে পাহাড়ের গুহায় গুহা-মানুষদের আঁকা আঁকিবুকিও আছে। সেগুলোও দেখে এলাম টাঙ্গা ভাড়া করে।

টাঙ্গা?

টাঙ্গার আমেরিকান সংস্করণ। যে নিয়ে গেল তারও চেহারা কাউবয়দের মতো।

তার পর?

রাত্তিরটা ম্যাকডোনাল্ড-এ খেয়ে রাত কাটালাম মোটেল-এ।

একা একা?

মিতালির কথায় একগাল হেসে পরমার্থ বলল, দোকা কোথায় পাব?

স্বাতী বলল, আমেরিকার মোটেল, সেখানে দোকার অভাব?...মোটেলে থাকার কথা তো আগে বলোনি?

মিতালি চোখ মটকাল, আগে বললে কী হত? গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নিতিস?

গঙ্গাজল না ঝাঁটাপেটা?

তপন পিউয়ের দিকে তাকাল, হাঁ করে বড়দের কথা কী গিলছ? যাও ও ঘরে যাও। দেখো টিভিতে কী চলছে।

পিউ ঠোঁট কামড়াল, গ্র্যান্ড ক্যানিয়নটাই যে এখনও বাকি বাবা!

তপন অধৈর্য হয়ে পরমার্থকে বলল, তোর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন তাড়াতাড়ি শেষ কর তো! রাত হয়ে যাচ্ছে। কাল পিউর স্কুল আছে।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বলে কথা। অত তাড়াতাড়ি শেষ হয়? ঠিক আছে ব্রিফ করে দিচ্ছি। পর দিন সকাল সকাল রেডি হয়ে বসে আছি, দেখি আমাকে পিক আপ করতে এসেছে অন্য একটা ছেলে। ডেভিডের মতো হাসিখুশি মোটেও নয়, গোমড়ামুখো। আর কিঞ্চিৎ বর্ণবিদ্বেষীও। সেডোনা থেকে ড্রাইভ করে পৌঁছে গেলাম গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন।

কী দেখলে? পিউর চোখ ঠিকরে বেরনোর জোগাড়।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন আসলে একটা গর্জ। গর্জ বোঝ তোমরা? কলোরাডো নদী বয়ে যাচ্ছে অনেক নীচে। সেই নদীই পাহাড়ের গায়ে যে নদীখাত তৈরি করেছে তাকে বলে গর্জ। গর্জ আর ক্যানিয়নের মধ্যে ভূগোল বইয়ে কী সব সূক্ষ্ম তফাত লেখা আছে, দ্বিতীয় দিন যে ছেলেটা আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল, বিল, সে বোঝাচ্ছিল। গাড়ি থেকে নামিয়ে ঘড়ি দেখে বিল বলল, এখন পৌনে এগারোটা। তিনঘণ্টা সময় দিলাম। ঠিক পৌনে দু'টোয় সবাই গাড়িতে চলে আসবে। লাঞ্চ করে নেবে তার মধ্যে। মনে রেখো পৌনে দু'টোয় আমরা গাড়ি ছেড়ে দেব।

তার পর?

দেখলাম তিনঘণ্টা সময় হাতে। একটা মুহূর্তও অপচয় করা যাবে না। ক্যানিয়নের যে দিকটায় নেমেছি সেখান থেকে ও পাশে পাহাড়ের মতো একটার পর একটা চূড়া দেখা যাচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে, প্রকৃতিই ওগুলো তৈরি করেছে। টেলিস্কোপ দিয়ে চূড়াগুলো দেখলাম। কোনওটার নাম ব্রহ্মা, কোনওটার বিষ্ণু, কোনওটার বা শিব।

বলো কী? স্বাতীও অবাক, হিন্দু দেবদেবীর নামে নাম?

হ্যাঁ, যে সাহেব ওগুলো আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি এক সময় ভারতে ছিলেন, নামকরা ইন্ডোলজিস্ট। হিন্দু দেবদেবীর নাম অমর করে রেখেছেন। যাই হোক, টেলিস্কোপ দিয়ে পাহাড়ের গায়ে নদীর দাগ দেখা গেল স্পষ্ট। অনেকেই ওপর থেকে ক্যানিয়ন দেখে খুশি হয়ে লাঞ্চ করতে চলে গেল। আমার কিন্তু মন ভরল না।

কী করলে? ওপর থেকে ঝাঁপ মারলে?

স্বাতীর কথায় বিরক্ত না হয়ে পরমার্থ বলল, তারও ব্যবস্থা আছে, হেলিকপ্টার সার্ভিস, ঘণ্টায় একশো ডলার। আমার সাধ্যের বাইরে। তাই অন্য ধান্দা করলাম। ঠিক করলাম হেঁটেই নীচ অবধি যাব।

হেঁটে? যাওয়া যায়?

হ্যাঁ। পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা বানানো। পিচ রাস্তা নয়, খড়খড়ে পাথুরে পথ। এতটুকু অসাবধান হলেই পা পিছলে যাবার সমূহ সম্ভাবনা।

গাড়ি চলে না?

না। যে আমেরিকানদের গাড়ি ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না তারাও হেঁটেই নীচে নামে। অবশ্য আর একটা উপায় আছে।

সেই টাঙ্গা?

কাছাকাছি। খচ্চর। খচ্চরের পিঠে চেপেও নীচে যাওয়া যায়। তবে সময়টা বেশি লাগে। ভোরবেলা নামতে শুরু করলে সন্ধের আগে ফিরে আসা যায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, খচ্চরদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়। সারা পৃথিবীর মানুষ সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়। এবং আগামী এক বছরের মধ্যে কোনও খচ্চরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট খালি নেই।

এত ভিআইপি খচ্চর!

হ্যাঁ। সেই থেকে কাউকে আর খচ্চর বলে গালি দিই না আমি।

তপন ধমকে উঠল, কোথায় গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন হচ্ছিল, সেখান থেকে খচ্চরে ডাইভার্ট করে গেলি। তাড়াতাড়ি শেষ কর।

হ্যাঁ, সুতো ধরে ফেলল পরমার্থ, পায়ে হেঁটেই নেমে যাওয়া স্থির করলাম। কিন্তু একটা সমস্যা হল, অন্যরা যেভাবে হাঁটছে সেই গতিতে নেমে উঠে আসতে বিকেল গড়িয়ে যাবে। তাই হাঁটা আর দৌড়ানোর মাঝামাঝি একটা স্পিড রেখে নামতে শুরু করলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক ওই স্পিডে নেমে নীচে তাকিয়ে দেখলাম অর্ধেকও পার হইনি। জেদ চেপে গেল। হুড়মুড় করে নামতে গেলাম। আর নামতে গিয়েই...

পা পিছলে আলুর দম, স্বাতী উঠে গেল খাবার গরম করতে।

আলুর দম তো ভাল জিনিস, কিমা হয়ে যেতাম। সামনেই ছিল এক কালো আমেরিকান। জানবে কালো মানুষদের মতো ভাল, আর উদার হৃদয় খুব কম লোকেরই আছে। ও ঠিক আন্দাজ করেছিল। আমি যখন পিছলে কলোরাডো নদীর দিকে হুহু করে নেমে যাচ্ছি, লাফিয়ে এসে আমার জামার কলার চেপে

ধরল। আরও দু'চারজন জুটে গেল। টেনে হিঁচড়ে খাদের মুখ থেকে তুলে ফেলল ওরা।

তারপর? যাওয়া হল শেষ অবধি?

নাঃ। সবাই ভীষণ বকাবকি করল। বলল, কাঁটা লাগানো জুতো না পরে পাহাড়ে ওঠানামা করাই উচিত নয়। জোর করে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

তার মানে তুমি হাফ-ক্যানিয়ন দেখেছ?

না, দেখেছি পুরোটাই। নেমেছি অর্ধেক রাস্তা।

চলো খাবার দেওয়া হয়েছে, স্বাতীর কথায় উঠে পড়ল পিউ। বলল, শেষ তোমার গল্প?

কোথায় শেষ? ওপরে উঠে কী রগড়টা হল, সেটাই তো বলা হল না। বিল বলে দিয়েছিল পৌনে দু'টো। আমি পৌঁছলাম সওয়া দু'টোয়। গিয়ে দেখি, বিল রাগে গরগর করছে। ফেলে চলে যাবে সেটাও পারছে না। আমাকে যখন বলল, দেরি করলে কেন, আমি অবাক হবার ভান করে বললাম, দেরি কোথায়? তুমি যে বললে কোয়ার্টার পাস্ট টু? বিল খিঁচিয়ে উঠল, আমি মোটেও কোয়ার্টার পাস্ট টু বলিনি, বলেছি কোয়ার্টার টু টু। আমি একগাল হেসে ওর পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়ে বললাম, সরি।

হি হি করে হাসল পিউ,—বিল পরে কিছু বলেনি?

ডাইরেক্টলি নয়। যেখানে থেমেছে, চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে বলেছে, ইউ মাস্ট রিটার্ন বাই হাফ পাস্ট থ্রি, আই রিপিট হাফ পাস্ট থ্রি, আন্ডারস্ট্যান্ড?

আমাদের দেশের মানুষের সম্বন্ধে ওদের কী ধারণা হল বলো তো?

এমনিতেই ধারণা খারাপ। নতুন করে আর কী তৈরি হবে? আমার কথাটাও ভাবো। জীবনে মানুষ গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে এক বারই যায়। সেখানে অত ঘড়ির কাঁটা ধরে সব চলে?

খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছিল। পরমার্থ নীচ অবধি এল। পিউকে আবার আসতে বলল। বলল, আরও দু'টো গল্প বাকি, পরের দিন বলব। চোখে মুখে মুগ্ধতা, পিউ হাত নেড়ে বলল, নিশ্চয়ই আসব পরমার্থ কাকু।

পিউ ঘুমিয়ে পড়লে মিতালি সোফায় এসে বসল। টিভিতে বিবিসি চালিয়ে নিউজ় দেখছিল তপন, বন্ধ করে ঘুরে বসল।

জোজোটা কী লাকি না?

কেন বলছ?

এই...আমেরিকায় লেখাপড়া করছে, পাশ করে বেরুলে যেখানে চাইবে লুফে নেবে। কেরিয়ারটা তৈরি হয়ে গেল।

ভুল, আমেরিকায় পড়লেই সে বিরাট কিছু আর যারা দেশের ভাল ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়ে বেরুচ্ছে তারা এলেবেলে, এই ধারণাটার গোড়াতেই গলদ।

তোমার মতো পণ্ডিতদের কাছে। আমার মতো দশটা সাধারণ লোককে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, জবাব পাবে, আমেরিকা! খুব ব্রিলিয়ান্ট নিশ্চয়ই! চাকরি যারা দেয় তারাও তা-ই ভাবে।

ভাবে না। ভাবলে দেশের ম্যানেজমেন্ট পাশ ছেলেদের পেছনে লাইন দিয়ে লেগে থাকত না।

তুমি আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ। প্রশ্নটা আমেরিকা বা ভারত নয়। বাবার ট্যাঁকের জোর থাকলে সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য ভাবতে হয় না। এটাই আসল কথা।

যারা বাবার ট্যাঁকের জোরে বড় হয়, তাদের বড় না হওয়াই ভাল।

ও সব অক্ষমের যুক্তি। তোমার নেই, তাই তুমি বলছ। টাকা থাকলে তুমিও পিউয়ের জন্য খরচ করতে।

না, করতাম না।

তা তো করবেই না। তুমি চাও তোমার মেয়েও তোমার মতো মিডিওকার হয়েই থাকুক।

আমি মিডিওকার? তুমি জানো, তোমার ওই পরমার্থর কেরিয়ার আমার নখের যুগ্যি নয়?

রাখো রাখো। ডিগ্রিগুলো আলমারিতে সাজিয়ে ধুয়ে ধুয়ে জল খাও। কী হয় কেরিয়ার দিয়ে যদি সংসারের সুরাহা না হয়? ছেলেমেয়ের সিকিওরিটি না থাকে? কিছু রাইটার্সের কেরানি আর চাষাভুষো গরিব মানুষ ছাড়া কে চেনে তোমাকে? কোনও সোশাল রেকগনিশন নেই। যেটা তোমার বন্ধু পরমার্থর আছে।

জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল তপন। উঠে টিভির সুইচটা অন করে দিল। খবর দেখার ভান করে টিভির স্ক্রিনে চোখ রেখে বসে রইল। মিতালি কিছুক্ষণ বকবক করল। এক সময় মুখ চালানো বন্ধ করে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মা মেয়ে একসঙ্গে শোয়। অন্য ঘরে তপন।

নিশ্চিন্ত।

টিভি অফ করে ফ্যানটা এক পয়েন্ট বাড়িয়ে দিল তপন। বাবা মোহনপুরের জমি বিক্রি করে দেবার কথা বলছিল। কত যেন? পনেরো না বিশ লাখ? টাকার অঙ্কটা মন দিয়ে শোনেনি। আসলে আলোচনাটাই থামিয়ে দিতে চাইছিল।

এখন যদি বাবাকে বলে? বাবা কি পিউর জন্য দিতে রাজি হবে না? বললে নিশ্চয়ই দেবে।

কিন্তু এইভাবে কি সত্যিই কারও ভবিষ্যৎ তৈরি করা যায়?

দরজা খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। ঝিরঝিরে হাওয়া তপনকে জড়িয়ে ধরল। বন্ধ ঘরের ভাবনা আর খোলা হাওয়ার ভাবনা আলাদা। ঘরের মধ্যে যে আবেগ, যে স্পর্শকাতরতা তার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল তা আস্তে আস্তে কেটে যেতে লাগল। সেই জায়গাটা অধিকার করে নিতে থাকল বাস্তববোধ।

পিউ কেমন অবাক হয়ে পরমার্থর কথা শুনছিল? মনে মনে ও-ও পৌঁছে যাচ্ছিল স্বপ্নের দেশ আমেরিকায়। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। সেডোনা। ওর চোখের তীব্র ইচ্ছা পড়তে পারছিল তপন। অস্বস্তি হচ্ছিল তপনের। চাইছিল আলোচনাটা দ্রুত শেষ হয়ে যাক। ইচ্ছে হচ্ছিল, পিউর হাত ধরে পরমার্থর ফ্ল্যাট থেকে ছুটে চলে আসতে।

অর্থ অনেক কিছু কিনতে পারে। স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, আয়ু। স্বপ্নও। স্বপ্নকে পুষে রাখতে পারে। স্বপ্নের বায়বীয় চেহারায় বাস্তবের পাখনা পরিয়ে দিতে পারে।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে তপনের মনে হল, বাবার সঙ্গে সে দিনের আলোচনার কথাটা কি মিতালির কাছে পাড়বে?

আইডিয়াটা খারাপ নয়, ভেবে মাথার ভার অনেকটাই হাল্কা হয়ে গেল তপনের।

৬

ঘটনার সূচনা কিন্তু দমনের স্কুলে যাওয়া নিয়ে।

দিউ যেমন বড় হয়েছে, স্কুল বাসে যাওয়া আসা করে, বাসে তুলে দিলেই নিশ্চিন্ত, দমন তা নয়। দু'জনের বয়েসের ফারাকটাও সাত বছরের। কাজেই চার বছরের দমনকে রোজ সকালে সঙ্গে নিয়ে বেরয় শাওন। অটোয় মেট্রো স্টেশন অবধি যায়। সেখান থেকে মেট্রো ধরে তিনটে স্টেশন গিয়ে আবার

অটো। দমনকে পৌঁছে কলেজে চলে যায় শাওন। ক্লাসগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছে। দমনের ছুটি হলে বেরিয়ে ওকে পিক আপ করে বাড়ি ফেরে। শনিবার দমনের ছুটি। ওই দিন বিকেল অবধি থেকে অন্যদের রিলিফ দেয়। আজকাল নিয়ম হয়েছে ক্লাস থাক না থাক, বিকেল অবধি বসে থাকতে হবে। তার সমস্যাটা সবাই জানে বলে আপাতত রেহাই মিলেছে। দু'বছর পর দমন বাসে যাওয়া-আসা শুরু করলে ফেভারটা শাওন আর নেবে না।

এমনিতে শাওন যথেষ্ট শক্ত সমর্থ। জার্নিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এসে শুয়ে থাকতে হয়, তা নয়। প্রতিদিনের অভ্যাসের সঙ্গে এটুকুও সইয়ে নিয়েছিল। কিন্তু পর পর দু'দিন ফিরে এসে ওর শান্ত মাথাও আগুন হয়ে গেল।

অসম্ভব। এখানে আর থাকা যাবে না। এই রাস্তাটার জন্যেই পাড়া ছাড়তে হবে।

আজ আবার কী হল?

অর্পণ জিজ্ঞেস করল, কারণ কাল মালঞ্চ সিনেমার সামনে একটা বাস খারাপ হয়ে রাস্তা আটকে পড়েছিল, সকাল থেকে জ্যাম, আধঘণ্টা অপেক্ষা করে স্কুলে যেতে না পেরে ফিরে এসেছিল শাওন।

আজ অটো স্ট্রাইক।

স্ট্রাইক? কেন?

যত অটো রাস্তায় চলে তার অর্ধেকই না কি বেআইনি। পুলিশ ধরেছে। তার প্রতিবাদে স্ট্রাইক।

বাস চলছে না?

ট্রাই করেছিলাম। অসম্ভব ভিড়, তাও গুঁতোগুঁতি করে উঠলাম। একটু এগিয়েই থেমে গেল।

বাসও থেমে গেল?

হ্যাঁ। অটোওয়ালারা গাছতলায় রাস্তা আটকে সমস্ত অটো দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কোনও দিকেই বাস চলছে না। বাস-ট্যাক্সি-প্রাইভেট গাড়ি কিছুই চলছে না। সমস্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

ভেতর দিয়ে দিয়ে রিক্সা নিয়ে চলে যেতে পারতে!

হয়তো পারতাম। কিন্তু তত ক্ষণে আটটা কুড়ির মেট্রোও চলে যেত। স্কুলের গেট বন্ধ দেখে ফিরে আসতে হত। কী লাভ?

দমনের কাঁধ থেকে স্কুলব্যাগটা খুলে নিতে নিতে শাওন খাটে চিত হয়ে

পড়ল—ফ্যানটা চালিয়ে দেবে প্লিজ! এ বার থেকে তুমিই ওকে নিয়ে যেও। রোজ রোজ কলেজ কামাই। দু' দু'টো ছুটি চলে গেল!

এটা একটা সলিউশন হল? তোমার বদলে আমার কলেজ কামাই হবে। একই ব্যাপার।

এক ব্যাপার নয়। তুমি সংগঠন করো। দেরি করে গেলেও কেউ কিছু বলবে না। অ্যাটেনডেন্স-এর ব্যাপারে কিছুটা ফ্লেক্সিবিলিটি আছে।

বরং উল্টোটা। সংগঠন করি বলেই কাজটা আরও ভাল করে করতে হয়। ঝগড়া না করে এসো, কনস্ট্রাকটিভ কিছু ভাবা যাক।

হাল ছাড়ার ভঙ্গিতে পাশ ফিরল শাওন, কোনও সলিউশন নেই। অন্তত যত দিন না দমনটা বড় হচ্ছে। দিদির মতো নিজে নিজে স্কুলে যেতে শিখছে।...তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাও তো দমন!

দমন মন দিয়ে একটা ইঞ্জিনের পেটে দম দিচ্ছিল। ইঞ্জিনটা লাইনে বসিয়ে চালু করে দিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, আমি বড় হয়ে গেছি। আমিও বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিদির মতো যেতে পারি।

হেসে ফেলল শাওন। অর্পণ কাছ ঘেঁষে এল।

দু'টো দিন বেশ একসঙ্গে সকালটা কাটানো গেল বলো?

আর কাটানো! দমন জেগে। প্রভাতীও এখুনি এসে পড়বে। এই করতে করতেই কখন দেখব বুড়িয়ে গিয়েছি।

অর্পণ উঠে এক কাপ চা করে নিয়ে এল। শাওনের হাতে দিয়ে বলল, সলিউশন একটা আছে।

কী সলিউশন?

এই পাড়া ছেড়ে আমরা যদি উঠে যাই।

উঠে কোথায় যাবে?

দমনদের স্কুলের কাছাকাছি কোথাও।

ওদিককার ভাড়া অনেক বেশি।

কত আর বেশি হবে?

খোঁজ নাও।

কথাটা সেইখানেই সেমিকোলনের মতো আটকে গিয়েছিল। পর দিন রাস্তা খুলে যেতে এবং পুরনো রুটিন ফিরে পেয়ে শাওন ভুলে গিয়েছিল। অর্পণ কথা বাড়ায়নি।

আলোচনাটা নতুন করে শুরু করতে হল বাগচিদের ব্যবহারে।

বাড়িওয়ালা অলোক বাগচি কিন্তু মানুষ ভাল। শাওনকে মা মা করেন। দিউ আর দমনকে ভালবাসেন। হাতে করে টফি আনতে ভোলেন না। খোঁজখবর নেন।

অলোক বাগচির ছেলে অতনু সামান্য সমস্যার উদ্রেক করেছিল। সিঁড়িতে মুখোমুখি হলে ভাসাভাসা চোখে শাওনের দিকে তাকিয়ে থাকা, চোখ সরিয়ে নিতে ভুলে যাওয়া, গা ঘেঁষে দাঁড়ানো। কিন্তু এ গুলো সবই কীভাবে হ্যান্ডল করতে হয়, এত বছরে শাওন শিখে নিয়েছে। অতএব অর্পণকে জানিয়ে রাখা ছাড়া বিশেষ কিছুর প্রয়োজন পড়েনি। তা ছাড়া অতনুর ক্ষমতা যে ওর বেশি কিছু নয়, সেটাও তত দিনে শাওন বুঝে গিয়েছিল।

কিন্তু অতনুর মা, প্রমীলা যা শুরু করলেন, সেটার জন্য শাওন বা অর্পণ কেউই প্রস্তুত ছিল না।

দোষের মধ্যে এক দিন প্রভাতী কল বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। চৌবাচ্চা ভর্তি হয়ে জল উপচে পড়ছিল। বাথরুমের আউটলেট দিয়ে জল পড়ছিল বাইরে। প্রমীলার সেটা নজরে যায়। ছাদে উঠে ট্যাঙ্ক থেকে যে পাইপ দিয়ে জল অর্পণদের ফ্ল্যাটে যায় তার প্যাঁচটা বন্ধ করে দেন।

এই পর্যন্ত ঠিক ছিল।

শাওন ফিরে এলে তিনি যে কটকট করে শাওনকে কথা শুনিয়েছিলেন, প্রভাতীর চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করেছিলেন এবং গলার স্বর ভদ্রতার উর্ধ্বসীমার চেয়েও কয়েক ডেসিবেল ওপরে তুলেছিলেন, তাই নিয়ে শাওন বা অর্পণের কোনও আপত্তি ছিল না।

কিন্তু এর পর থেকে তিনি যে নিয়ম করলেন, তাতে শাওনরা খুবই অসুবিধায় পড়ে গেল। প্রমীলা বললেন, তাঁর কাছ থেকে চাবি নিয়ে ছাদে উঠে ট্যাঙ্ক-এর পাইপের মুখ খুলে, চৌবাচ্চায় জল ভরে, আবার পাইপের প্যাঁচ বন্ধ করে, চাবি তাঁর হাতে দিয়ে তবে যেতে হবে।

অর্পণ প্রতিবাদ একটা করেছিল, অলোক বাগচির কাছে। তিনি বাধ্য মার্জারের মতো লাজুক লাজুক চোখ প্রমীলার দিকে নিক্ষেপ করেই ব্রীড়াবনত করে ফেললেন। অর্পণ বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই বুঝে গেল, বৃথা কালক্ষেপ করে লাভ নেই।

প্রথম প্রথম অর্পণই সকালের জল ভরার কাজটা করত। বাড়তি কিছুটা সময় যেত এই যা। গরম পড়লে জলের ব্যবহার বাড়ল। সকালে স্নানটানের পর চৌবাচ্চা প্রায় খালি হয়ে যেত। দ্বিতীয় বার ভর্তি করার সময় থাকত না কারওরই। সেই কাজটা প্রভাতীই করত।

এক দিন দুপুরে রোদ্দুরে পুড়তে পুড়তে বাড়িতে ঢুকে দু'টো জিনিস নজরে পড়ল শাওনের। প্রভাতী সিক্স অবধি পড়েছে। লিখতে জানে। গোটা আষ্টেক বানান ভুল সমেত ছোট চিঠিতে জানিয়েছে, ওর মেয়ের ব্যথা উঠেছে, তাই এখনি সন্তোষপুরে চলে যেতে হচ্ছে, দু'দিন আসতে পারবে না। চিঠিটা ডাইনিং টেবিলের ওপর গ্লাস চাপা দিয়ে রাখা। প্রথমটার ধাক্কাতেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল শাওন। মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য বাথরুমে ঢুকে মগ ডুবিয়ে জল তুলতে গিয়ে দেখল চৌবাচ্চা খালি।

মাথায় গনগন করছে আগুন, দমনের হাত ধরেই দোতলায় ছুটল শাওন। গিয়ে দেখল দরজায় তালা। মনে পড়ল, কাল রাতেই অলোক বাগচি এসেছিলেন। কথায় কথায় অর্পণকে বলেছিলেন, ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে যাবেন, ফিরতে রাত হবে, বাড়ি খালি থাকবে, একটু যেন নজর রাখা হয়।

মাথায় হাত দিয়ে সিঁড়িতেই বসে পড়ল শাওন।

অর্পণ ফিরতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে শাওন বলেছিল, অসম্ভব, এ বাড়িতে এক দিনও নয়। এই মুহূর্তে তুমি বাড়ি খোঁজা শুরু করো।

এই বাড়িটা পাওয়া গিয়েছিল শাওনের এক দূর সম্পর্কের মামার কানেকশনে। তিনি ছেলের কাছে কানাডায় চলে যাচ্ছেন, শাওনদের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ি খোঁজার হ্যাঙ্গাম পোয়াতে হয়নি।

খুঁজতে গিয়ে টের পেল, বাড়ি খোঁজা কী জিনিস!

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাটাই ধরা যাক।

রবিবারের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে টিক মারছিল শাওন। এক জায়গায় এসে লাফিয়ে উঠল।

দেখেছ? লোকেশন, ভাড়া সবই আমাদের জন্যে আইডিয়াল। বৃদ্ধ দম্পতি, নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার খুঁজছেন, আমাদের চেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট কেউ আছে বলো? দেখো, ঠিক আমাদের পছন্দ হবে।

সেই সপ্তাহেই গুডফ্রাইডের ছুটি ছিল, বাচ্চাদের শাওনের বাবার কাছে গ্যারেজ করে, দু'জনে বেরুল বাড়ি শিকারে।

দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি সময়, বাড়ি খোঁজার পক্ষে গোধূলিলগ্নই বলা যায়, ঠিকানা মিলিয়ে দরজায় বেল বাজাল। পাড়াটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভদ্রলোকদের বাস; বাড়িটাও ছিমছাম। শাওনের মুখ দেখে অর্পণ বুঝতে পারছিল, ওর পছন্দ হয়েছে।

দরজা খুললেন যিনি, যাটের ওপর বয়েস, ফর্সা টকটকে রং, সিঁথিতে

জ্বলজ্বলে সিঁদুর, দেখেই অর্পণের ভাল লেগে গেল। ইচ্ছে হল একটা প্রণাম করে।

চিবনো পান এ গাল থেকে ও গালে সরিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, আপনাদের তো ঠিক...

শাওন সপ্রতিভ হাসল, আমাদের আপনি চিনবেন না মাসিমা। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে আমরা, মানে বাড়ির খোঁজে...অ্যাই তুমি বল না!

অর্পণ মুখ বাড়াল, আমরা একটা বাড়ি ভাড়ার সন্ধানে এসেছি। আপনারাই তো কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?

কাগজটা নিয়ে এসেছিল অর্পণ, টর্চলাইটের মতো বাড়িয়ে ধরল।

মশা তাড়ানোর ভঙ্গি করলেন শাওনের মাসিমা, কিন্তু আপনারা তো বাঙালি?

নিশ্চয়ই, আমরা চোদ্দো পুরুষ বাঙালি। মোহনপুরে আমাদের দেশ। ওরাও মানে, এককালে পুববাংলায় হলেও স্বাধীনতার আগেই...

থাক থাক, আর বলতে হবে না। চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি যে বিজ্ঞাপন দেবার সময় ওনাকে পইপই করে বলে দিয়েছিলাম, সে কথাটা উনি লেখেননি?

কোন কথা?

বাঙালিকে আমরা ঘরভাড়া দিই না।

তার মানে?

দু'দু'বার বাঙালিকে ঘরভাড়া দিয়ে ঠকেছি। ভাড়াটে তুলতে থানা-পুলিশ অবধি করতে হয়েছে। সেই থেকে নাক-কান মলেছি, বাঙালিকে আর ঘরভাড়া দেব না। মাদ্রাজি খুঁজছি আমরা।

বলতে বলতেই প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়েই শাওন আর অর্পণের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন ভদ্রমহিলা।

শকটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল। শাওনেরই ধৈর্য বেশি, খুঁজে খুঁজে আবার একটা ঠিকানা বের করল। ভাল লোকেশন, রিজনেবল ভাড়া।

সে দিনেই সন্ধের পর গেল দু'জনে। এ দিন বাচ্চাদের কোথাও ডাম্প করা যায়নি। ওরাও গেল বাবা-মায়ের হাত ধরে। নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দু'জনেই অবাক। ঠিকানাটা বাড়ি-ঘর-ফ্ল্যাটের সন্ধান দেওয়া একটা প্রতিষ্ঠানের। সোজা কথায় ব্রোকার।

দোনামনা করে ঢুকেই পড়ল দু'জনে।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ারে বসে একটা কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলেন। অর্পণ বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে বলল, এটা আপনারা দিয়েছেন?

ঘাড় নেড়ে ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, আমরাই দিয়েছি। তবে ওটা আপনাদের জন্য নয়।

আমাদের জন্য নয়?

ভদ্রলোক হাসলেন। হাসিটা আন্তরিক। বললেন, আপনারা এই লাইনে একেবারেই নতুন। নইলে বুঝতে পারতেন, ওই পাড়া ওই লোকেশনে তিনতলার হাজার স্কোয়ার ফুট ফ্ল্যাট কখনও পাঁচহাজার টাকায় পাওয়া যায় না।

যায় না?

না, যায় না। পাগলেও ওই ভাড়ায় ফ্ল্যাট ছেড়ে দেয় না।

তা হলে? লিখেছেন যে?

ভাড়াটার কথাই লেখা হয়েছে। যেটা লেখা হয়নি, কারণ লেখা যায় না, তা হল, এর সঙ্গে পাঁচ লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স। অ্যাডজাস্টেবল অ্যাডভান্স নয়, সেলামি। তিন বছরের কনট্রাক্ট, তিন বছর পার হলে আবার পাঁচ লাখ। তত দিনে সেটা ছয়ও হয়ে যেতে পারে, আর এই পাঁচ লাখ টাকা দিতে হবে ক্যাশ-এ, কোনও রিসিট পাবেন না।

তার মানে ব্ল্যাক?

ঠিক ধরেছেন।

কিন্তু পাঁচ লাখ টাকা ব্ল্যাক আমরা কোথায় পাব? আমাদের যা রোজগার সবই সাদা। শাওনের গলার স্বর হাহাকারের মতো শোনায়।

ভদ্রলোক, পরে জেনেছে নাম অমিয় সাহা, হেসে বললেন, সেটা আপনাদের দেখেই বুঝতে পেরেছি। তাই প্রথমেই বলে দিলাম, বিজ্ঞাপনটা আপনাদের জন্য নয়।

একটা ফরাশ পাতা ছিল ঘর জোড়া। একপাশে ধপাস করে বসে পড়ল শাওন, তা হলে উপায়?

অমিয়বাবু মৃদু হাসলেন, সেই উপায় করার জন্যই তো আমরা আছি। একটা কাজ করুন। আমাদের প্রতিষ্ঠানের সদস্য চাঁদা পাঁচশো টাকা। এই সাবস্ক্রিপশনটার ভ্যালিডিটি তিন মাস। তিন মাসের মধ্যে সাধারণত সকলকেই কিছু না কিছু জুটিয়ে দিই আমরা। বাড়ি পেয়ে গেলে দু'মাসের ভাড়া ব্রোকারেজ দিতে হয়। রাজি থাকলে বলুন, রসিদ কেটে দিয়ে দিচ্ছি।

শাওনের মুখ দেখে অর্পণের কষ্ট হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি পাঁচশো টাকা অমিয়বাবুর হাতে দিয়ে যেন মুক্তি পেয়ে গেল অর্পণ।

ভেবেছিল টাকাটা গেল। অমিয় সাহা কিন্তু খবর দিয়ে যেতে থাকলেন। বাড়ি পছন্দ হোক না হোক শনি রবিবারগুলো বাড়ি দেখে দেখে ভালই কেটে যেতে লাগল।

কিন্তু তিন মাস সময় যতই ফুরিয়ে আসতে লাগল, এই ধারণাটা ওদের মধ্যে জন্মাতে লাগল যে, কপালে পছন্দসই বাড়ি নেই।

তখনই অমিয় সাহা ডেকে পাঠালেন।

আচ্ছা, আপনারা ভাড়া বাড়ির জন্য এমন পাগলের মতো খোঁজাখুঁজি কেন করছেন?

আপনি জানেন না সাহাদা, তত দিন অমিয় সাহা দু'জনের কাছেই সাহাদা হয়ে গেছেন, কী নরকের মধ্যে আমরা আছি। আর একটা দিনও...

শাওনকে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন অমিয়।

আপনারা কেন খুঁজছেন, আমি জানতে চাইনি। জানতে চাইছি, বাড়ি ভাড়া নেওয়ার জন্যে আপনারা এমন হন্যে হয়ে পড়লেন কেন?

দু'জনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সাহার মুখের দিকে। কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করে।

অমিয় সাহা প্রাঞ্জল করেন, বাড়ি ভাড়া না নিয়ে কেনার কথা কেন ভাবছেন না? রেডিমেড ফ্ল্যাট। যতগুলো টাকা মাসে মাসে ভাড়া গুনবেন, ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিলে তার চেয়ে সামান্য বেশি করে শোধ দিলে নিজেই একটা ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে যেতে পারেন। দেখব?

প্রথমে বিশ্বাসই হচ্ছিল না শাওনের। নিজেদের ফ্ল্যাট! ওই টাকায়! তার পর অমিয় সাহার আইডিয়াটা মাথার ভেতরে ঢুকে যেতে কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে বলেই ফেলল, সত্যি সাহাদা আপনাকে কী বলে যে....

থাক থাক। সব হয়ে যাক। তারপর নতুন ফ্ল্যাটে গিয়ে মিষ্টি খেয়ে আসব।

নিশ্চয়ই। গৃহপ্রবেশে সবার আগে আপনার নিমন্ত্রণ।

ফ্ল্যাটের সন্ধান করতে গিয়ে এক অন্য জগতের খোঁজ পেল অর্পণরা। একজন গড়পড়তা কলকাতাবাসী রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খুঁড়ে রাখা গর্ত, পড়ে থাকা গাছের ডাল, চলমান মিনি, এই সব বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমস্ত মনোযোগ ব্যয় করে ফেলে। কেউ তারই মধ্যে সময় বের করতে পারলে দিগন্তে জমে ওঠা মেঘ, জারুল গাছে থোকা থোকা ফুল, বাবুঘাটে

ভেসে যাওয়া নৌকোও দেখে ফেলে। অথচ পথ এবং আকাশের মাঝখানে ক্রমাগত তৈরি হতে থাকা ইট-কাঠ-সিমেন্টের যে ইন্দ্রপ্রস্থ কলকাতা শহরকে বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর করছে, গ্রাস করছে শহরতলি, সে সম্বন্ধে কতটুকু খোঁজ রাখে সাধারণ মানুষ?

খোঁজাখুঁজি শুরু করার আগেই সাহাদা দু'টো জিনিস স্মরণ করিয়ে দিলেন:

প্রথমেই ঠিক করে নিন আপনাদের কী প্রয়োজন। ক'খানা ঘর, ক'টা বাথরুম, বাথরুমের ফিটিংস, রান্নাঘরের প্ল্যানিং, ড্রয়িংরুমের লোকেশন। বাস্তু বা ফেংশুই-এ বিশ্বাস করলে সেটাও। তার পরে নিয়ে বসুন খাতাপত্র। ব্যাঙ্কের পাশবই, স্যালারি স্লিপ, পি এফ-এর অ্যাকাউন্ট, এমনকী গয়নাগাঁটিও। যে যে জায়গা থেকে রিসোর্স মবিলাইজ় করতে পারবেন সেটাও খোঁজ করুন। আত্মীয়স্বজন, যাঁরা ধার দেবেন। অথবা, ধার নয়, দান। এক কথায় বুককিপিং।

পরামর্শ মতো প্রথমে অর্পণ আর শাওন বসল তাদের প্রয়োজন মেপে দেখতে।

দু'টো বেডরুম তো আমাদের লাগবেই, কী বলো? দিউ-দমনের জন্য একটা, আমাদের একখানা। তার সঙ্গে ডাইনিং কিচেন। ব্যালকনি হলে ভাল হয়। আর হ্যাঁ, আমাদের বেডরুমের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথ থাকাটা মাস্ট।

এই অবধি বলে অর্পণের দিকে তাকাল শাওন, অর্পণ ঘাড় নেড়ে দিলেই প্যাড-এ লিখে ফেলতে পারবে।

অর্পণ গলাটা গম্ভীর করল।

তুমি এখনকার কথাই ভাবছ? দমন আর দিউ বড় হবে। বছর দশেক পরেই ওরা নিজেদের আলাদা ঘর চাইবে। তা ছাড়া কেউ এলে তাকে থাকতে দেওয়া নিয়ে কী সমস্যায় পড়ো মনে নেই? দু'টো বেডরুমে আমাদের হবে না।

তা হলে তিনটে? তিনটেই লিখে নিই?

তিনটে বেডরুম নোট করে শাওন। টুক করে একটা ঠাকুরঘরের প্রভিশনও ঢুকিয়ে দেয়। ঘর না হলেও অন্তত স্পেস। বাবা এলে নিরিবিলি বসে মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারবেন।

এই ভাবে লিস্ট বড় হতে থাকে। হতে হতে একটা স্বপ্নকে আদল দেয়। তারপর স্বপ্ন দু' ভাঁজ করে পকেটে নিয়ে অর্পণ চলে সাহাদার উদ্দেশে। পেছনে শাওন। দেখে সাহাদা গম্ভীর হয়ে যান।

বেশ। যা স্পেসিফিকেশন দিয়েছেন তাতে মোটামুটি হাজার স্কোয়ারফুটের ফ্ল্যাট লাগবে। রিসোর্স মবিলাইজ করেছেন?

পুরোটা হয়নি। করছি, একটু সময় লাগবে।

ঠিক আছে। সামনের রোববার ফটিক আপনাদের নিয়ে বেরুবে। ও-ই ফোন করে নেবে। কত টাকা পর্যন্ত আপনারা স্পেন্ড করতে পারবেন, যদি একটা আন্দাজ দেন!

দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বলে, রোববার তো দেরি আছে। এর মধ্যে আশা করি একটা আন্দাজ পেয়ে যাব। ফটিকবাবুকে সে দিনই যদি জানিয়ে দিই?

আপনাদের বাজেট বুঝে ও দেখাতে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে। শুক্রবার রাতে ও ফোন করবে।

এ বারে দু'জনে নিয়ে পড়ল পাশবই। ব্যাঙ্কের টাকা, ফিক্সড ডিপোজিট, পিএফ-এর লোন সমস্ত মিলিয়ে হিসাব হল। দেখা গেল বিশেষ কিছুই হচ্ছে না।

গিয়ে দেখা করল স্বপনবাবুর সঙ্গে, যে ব্যাঙ্কে দু'জনের অ্যাকাউন্ট, সেখানে প্রথম থেকেই ভদ্রলোক আছেন। অমায়িক ব্যবহার, অসম্ভব কো-অপারেটিভ। আলাপটা বন্ধুত্বের পর্যায়ে চলে গেছে।

স্বপনবাবুকে বলতেই লাফিয়ে উঠলেন।

ব্যাঙ্ক তো লোন দেবে বলে বসে আছে। আপনাদের মতো ক্লায়েন্ট পেলে তো কথাই নেই। কত টাকা লাগবে বলুন?

মনে মনে একটা হিসাব করে এসেছিল দু'জনে।

অর্পণ বলল, ধরুন দশ লাখ?

দশ? বেশ, আপনাদের টেক-হোম স্যালারি বলুন?

দু'জনের মাইনেটা বলল অর্পণ। স্বপনবাবু ক্যালকুলেটারে হিসাব করে বললেন, হয়ে যাবে।

হবে? মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল শাওনের।

হবে। কত বছরে শোধ দেবেন?

ধরুন দশ বছর?

হবে না। মাসে অনেক টাকা করে কাটা পড়বে। পারবেন না।

পনেরো?

তাতেও হবে না। বরং বিশ বছর করুন।

কুড়ি বছরের মেয়াদে লোন নিলে মাসে মাসে কত টাকা দিতে হবে?

দশ হাজারের কাছাকাছি। দাঁড়ান, বইটা নিয়ে আসছি। স্বপনবাবু উঠে

গেলেন। ফ্যাকাশে মুখে বসেছিল শাওন। ফিসফিস্ করে বলল, মাসে দশ হাজার টাকার লোন শোধ দিলে খাব কী? সংসার চলবে কী করে?

স্বপনবাবু এসে বসতে অর্পণ বলল, লোন অ্যামাউন্টটা আট লাখ ধরেই হিসাব করুন।

স্বপনবাবু ঘাড় নেড়ে ক্যালকুলেটরের বোতাম টিপতে লাগলেন।

ফটিক নন, ফোনটা করলেন সাহা নিজেই।

হিসাব হল? কত টাকার বাজেট?

দু'জনে মিলে অনেক কাটাকুটি খেলেছে ক'দিন। অ্যামাউন্টটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। বলল, এই তেরো-চোদ্দো লাখ।

সাহা একটু চুপ করে থাকলেন। তার পর বললেন, আপনাদের বাজেট তেরো লাখ হলে তার মধ্যে দু'লাখ ধরুন রেজিস্ট্রেশন ব্রোকারেজ এ সবেই যাবে। কার-পার্ক লাগবে?

কার-পার্ক?

অর্পণের প্রশ্নের জবাবে শাওন হাত নেড়ে 'না না' করে দিল।

না, কার-পার্ক লাগবে না।

বেশ, তা হলে ফটিক রবিবার সকালেই আপনাদের বাড়ি থেকে পিক-আপ করে নেবে। ধরুন ন'টা নাগাদ। রেডি হয়ে থাকবেন। ওর আরও দু' এক জায়গায় যাবার আছে।

শাওনের বাবা সে দিন সকাল সকাল চলে এলেন। নাতি নাতনির সঙ্গে সারাটা দিন কাটবে, খেলনা-চকলেট-গল্পের বই-এ সুসজ্জিত হয়ে আটটাতেই কড়া নাড়লেন শক্তিনাথ। দাদুকে দেখে হইহই করে ছুটে গেল দু'জনে। দমনকে কোলে নিয়ে ছুড়ে দিলেন শক্তিনাথ। হাঁ হাঁ করে ছুটে গেল শাওন। বাবা-মেয়েতে কিঞ্চিৎ রাগপ্রকাশ ও স্নেহবর্ষণ হল। অতঃপর বাবার ব্রেকফাস্ট এবং ছেলে মেয়ের কখন কী প্রয়োজন বুঝিয়ে দিয়ে তৈরি হতে গেল শাওন।

ঠিক ন'টাতেই বেল বাজল।

ফটিক ফটিক করছিলেন সাহা, ওরা ভেবেছিল বছর তিরিশের কেউ হবে। মাথাজোড়া টাক, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, বগলে বাঁশের ছাতা ফটিকবাবুকে দেখে দমে গেল দু'জনে।

কথাবার্তা কম বলেন ভদ্রলোক। বেরিয়ে রাস্তার মোড় অবধি গিয়েই হাত দেখিয়ে অটো দাঁড় করালেন। ওরা দেখল গড়িয়া অভিমুখী অটো থামাচ্ছেন

অর্পণ জিজ্ঞেস করল, ও দিকে কোথায় যাচ্ছেন?

কেন ফ্ল্যাট দেখাতে?

ফ্ল্যাট দেখাতে ওই পাশে?

হ্যাঁ। সাহাদা তা-ই তো বললেন। হাজার স্কোয়ার ফুট দক্ষিণখোলা, সঙ্গে ব্যালকনি, বাথরুমে টাইলস, সম্ভব হলে দোতলা বা তিনতলায়। এই রকমই তো চেয়েছিলেন আপনারা?

দু'জনে একসঙ্গে ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, অবিকল ওই রকম।

অথচ দাম এগারো লাখ ছাড়াবে না।

ঢোঁক গিলল দু'জনেই। হ্যাঁ, সেটাও সত্যি।

তা হলে অটোয় উঠে পড়ুন।

বেলা দু'টো পর্যন্ত রোদ্দুরে ঘুরে বেড়ালেন ফটিক ওদের সঙ্গে নিয়ে। ঘুরতে ঘুরতে অর্পণ বার বারই ফটিকের ছাতা আর জুতোর দিকে তাকাতে লাগল। ওই দু'টোর যে কী প্রয়োজন এক দিনেই টের পাচ্ছে। গোড়ালিতে কড়া পড়ে গেছে, মাথায় কেটলি বসালে জল ফুটে যেত। শাওনের দিকে তাকাতেও ভয় করছে অর্পণের।

পাঁচ ঘণ্টায় আটখানা বাড়ি দেখিয়েছেন ফটিক। নতুন পুরনো মিলিয়ে। দক্ষিণখোলা, ব্যালকনি বা বারান্দা, তিনখানা বেডরুম, অ্যাটাচড বাথ, যেমন যেমন চেয়েছিল সবই আছে। কোনওটায় পৌঁছতে হলে গ্রীষ্মেও হাঁটু অবধি পাঁক সাঁতরাতে হয়, কোনওটায় প্রতিবেশী খাটালের হোঁতকা মোষ। কোথাও বা নীচের তলায় দিশি শরাবের দোকান। এবং সবগুলোই ওরা যে জায়গায় আছে সেখান থেকেও অন্তত তিন কিলোমিটার শহরের বাইরে।

ফটিকবাবু ধুরন্ধর লোক। মুখ চোখ দেখেই আন্দাজ করেছিলেন। দু'টো নাগাদ ওদের ছেড়ে দিয়ে যখন চলে গেলেন, অর্পণ যে ধন্যবাদসূচক একটা কথাও বলতে ভুলে গেল, গায়ে না মেখে হাতজোড় করে বললেন, সাহাদা আমাকে যা দেন, বুঝতেই পারছেন, তাতে সংসার চলে না। আপনাদের কাছ থেকেও আমরা কিছু, যা ভাল মনে করেন...

একটা কুড়ি টাকার নোট বের করতে গিয়ে অর্পণের মনে হল, এই কাঠফাটা রোদ্দুরে ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুরে বেড়াল, সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা, একবার বলতেও তো পারত...! দশটা টাকা দিয়ে নমস্কার করে তাড়াতাড়ি পেছন ফিরল অর্পণ।

সন্ধ্যায় সাহাদার কাছে গেল।

সাহাদার মুখ গম্ভীর। ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে মুখোমুখি এসে বসলেন।

জানি কী বলবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, নকুলদানার দামে রাবড়ি পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমাদের যে ওর বেশি সাধ্য নেই সাহাদা! শাওন ডুকরে উঠল।

সাধ্য-টাধ্য এ সবই আপেক্ষিক। টানলে বাড়ে। ইলাস্টিকের মতো। সাধ্যে যতটুকু দেখতে পাচ্ছেন, বডি ফেলুন, দেখবেন সাধ্য আরও কিছু দূর যাচ্ছে। চেষ্টা করুন। হবে, আপনারা পারবেন। আমি সঙ্গে আছি।

উপনিষদের ঢঙে বাণী দিয়ে ভাঁড়ে চা খাইয়ে বিদায় দিলেন সাহাদা।

বাড়ি ফিরে কেঁদেই ফেলল শাওন, কী হবে? শেষকালে জোকা কিংবা নরেন্দ্রপুর? তার চেয়ে এই ভাড়া বাড়িই ভাল।

বিয়ের পর থেকে একজনের কাছ থেকে বিপদে আপদে সব সময় সৎ পরামর্শ পেয়ে এসেছে, তিনি শক্তিনাথ, শাওনের বাবা। পরের রোববার তাঁর কাছেই ছুটল।

আশ্চর্য মানুষ শক্তিনাথ। শাওনের কাছে অর্পণ সম্বন্ধে শুনে এক কথায় সম্মতি দিয়েছিলেন এই বলে, যার বাবা-মা দু'জনেই শিক্ষক, সে চেষ্টা করেও খুব খারাপ হতে পারবে না। চল্লিশ বছর শিক্ষকতা করে সামান্য যা সঞ্চয় করেছেন তাতে মল্লিকপুরের দিকে একটা ছোট বাড়ি করে একাই থাকেন। বাড়ির ছাদ টালির, শক্তিনাথ স্বীকার করেন না। চালের ওপর গড়িয়ে যাওয়া মাধবীলতা আর লাউমাচার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন ওরাই আমার চন্দ্রাতপ। শাওনের মা মারা গিয়েছেন শক্তিনাথের রিটায়ারমেন্টের আগে। তবু সম্ভ্রান্ত দূরত্ব রেখে চলেন মেয়ে-জামাইয়ের কাছ থেকে। প্রয়োজনে সব সময়ই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

এই নাতিদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে অর্পণ একবারই ভদ্রলোককে তাদের পছন্দ-অপছন্দে নাক গলাতে দেখেছে, সেটা দমনের নামকরণের সময়। দাদার মেয়ে পিউর সঙ্গে মিলিয়ে মা অর্পণের বড় মেয়ের নাম রেখেছিল দিউ। নার্সিংহোমে শাওনকে দেখতে গিয়ে শক্তিনাথ হেসে বলেছিলেন, দিউর ভাই, তা হলে নাম রাখো দমন। সেই থেকে ছেলের ডাকনাম দমনই রয়ে গেল। মা নাক কুঁচকে বলেছিল, দমন? পরেরজনের নাম কী হবে পীড়ন? এমন ডাকাত ডাকাত নাম জন্মে শুনিনি। শাওন হেসে বলেছিল, যেমন ডাকাত ছেলে, তার নাম তো সেই রকমই হবে মা!

নাতি-নাতনিকে দেখলেই শক্তিনাথের বয়েস কমে যায়। ওদের নিয়ে

হুড়োহুড়ি করলেন খানিকক্ষণ। হাঁস পুষেছেন কয়েকটা, তারা পাশের পুকুরে সাঁতার কাটছিল। দমনকে দেখাতে নিয়ে গেলেন। দিউর জন্যে ফুল পেড়ে আনলেন। তারপর দু'জনকে ছবি আঁকার কাগজ-পেনসিল দিয়ে বসিয়ে অর্পণদের কাছে এসে বসলেন।

শাওনই বলল সমস্তটা। ভাড়া বাড়িতে থাকার সমস্যা থেকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার অসুবিধা, বাড়ি খোঁজা, ভাড়াবাড়ির বদলে নিজস্ব ফ্ল্যাট। শেষ করল ফটিকবাবুর সঙ্গে অভিযানের অভিজ্ঞতা এবং সাহাদার দার্শনিক বিবৃতির মধ্য দিয়ে।

ক'য়েকটা শালিক পাখি উঠোনে বসেছিল। মুঠোভর্তি মুড়ি ছুড়ে ছুড়ে তাদের খাওয়াচ্ছিলেন শক্তিনাথ। চোখ না সরিয়ে বললেন, ইংরিজিতে একটা কথা আছে, তোমার কাপড় যতখানি, কোট সেই মতোই বানাও। কথাটা সত্যি। ক্ষমতার সীমানা ছাড়িয়ে কিছু করতে যাওয়া ঠিক নয়।

তার মানে তুমি বলছ, এই নরকেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দেব?

শান্ত চোখ শাওনের অস্থির মুখে প্রসারিত করে শক্তিনাথ বললেন, না মা, তা বলিনি। বলেছি, চাহিদাটাকে নামিয়ে আনতে। বলছি ভেবে দেখতে, এই মুহূর্তে প্রায়োরিটি কোনটা? দাদু-ভাইয়ের স্কুলের কাছাকাছি থাকাটা যদি প্রায়োরিটি হয়, তা হলে আপাতত একটা ছোট ফ্ল্যাট কেনো। সাত-আটশো স্কোয়ার ফুটের। স্কুলের কাছাকাছি। পরে সামর্থ্য বাড়লে এটা বিক্রি করে ভাল বড় ফ্ল্যাট কিনতে পারবে।

একটা কিনতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, আবার পরে বড় ফ্ল্যাট? না বাবা,যা কেনার এক বারই কিনব।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শক্তিনাথ। একটা কাক শালিকপাখিগুলোকে তাড়িয়ে মুড়ি খেয়ে নিচ্ছিল। দমন হুশহুশ করে তেড়ে গেল। শক্তিনাথ বললেন, ঠিক আছে। তোমরা যেমন ভাবছ করো। জানি না তোমাদের কত কম পড়ছে। আমার জমানো যা আছে তা থেকে দু'লাখ টাকা অবধি দিতে পারি। যদি হয় বোলো।

ট্যাক্সিতে ফিরছিল ওরা। ট্যাক্সিতেই ঘুমিয়ে পড়েছে দমন। দিউও ঢুলছিল। শাওন সন্তর্পণে অর্পণের হাতে ওর হাতটা রাখল।

দু'লাখে হবে?

চান্স কম।

তা হলে?

মুখ ঘোরাল অর্পণ। ভুরুতে ভাঁজ।

জানো, সরস্বতী পুজোর আগের দিন রাত্তিরবেলায় বাবা ছাদে তপুকে কী বলছিল?

কী বলছিলেন?

মোহনপুরের বাড়ির লাগোয়া জমি বিক্রি করে না কি বেশ কয়েক লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। ওর ওপিনিয়ন চাইছিল।

দাদা কী বললেন?

তপুটা তো গাঁট। তোমার জমি তুমি কী করবে সেটা তোমার ব্যাপার, এইরকম কিছু একটা জবাব দিয়েছিল। ফিসফিস করে কথা হচ্ছিল, পুরোটা শুনতে পাইনি।

বাবা চাননি তোমার কানে কথাটা যাক।

হতে পারে। বাবা তো সব ব্যাপারে তপুর সঙ্গেই পরামর্শ করে।

কেন করে?

অতশত তলিয়ে ভাবিনি।

ভাবলেও তো পারো।

শাওন কি কিছু ইঙ্গিত করছে? শক্তিনাথের কথাগুলো কি শাওনকে প্রভাবিত করেছে? ট্যাক্সির অন্ধকারে শাওনের চোখে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল অর্পণ। হাওয়া বাঁচিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

৭

পিন্টু হাঁ করে ঘুমোচ্ছিল। ওর চশমাটা নাকের ওপর ঝুলছিল। নিঃশ্বাসের সঙ্গে জিভটা মুখের মধ্যে নড়াচড়া করছিল। হাতে ধরা কাগজটা চোখের ওপর আলগোছে পড়েছিল, যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যাবে। আলগোছে ঘুম না ভাঙিয়ে কাগজটা নিজের কাছে নিয়ে রাখলেন বিমান।

দৃশ্যটা পুরনো। ঘুমন্ত মানুষের মুখের মধ্যে একটা অসহায়ত্ব থাকে। শিশুর ক্ষেত্রে ভাল বোঝা যায়। জেগে থাকা অন্য সকলের মধ্যে নিজের দায়িত্ব সঁপে দিয়ে শিশু ঘুমোয়। ঘুমন্ত অবস্থায় তাবড় তাবড় রাজা-মহারাজাও নিরাপত্তাহীন। নিরাপত্তার চিন্তায় যাদের দিনরাত্রি কেটে যায়, সেই সব মানুষ ঘুম নিয়ে নিশ্চয়ই অনেক ভাবনা-চিন্তা করে।

বিমান ঘুমকে এক রহস্যময়ী নারী ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না। অনেক ডাকাডাকি মানভঞ্জন আদর অভিমানের পর তিনি কৃপা করেন। আবার গভীর নিশীথে বিমানকে একা ফেলে বিদায় নেন। বাকি রাতটুকু এপাশ ওপাশ করে, জেগে থাকা কুকুরের প্রেমালাপ শুনে কাটিয়ে দিতে হয়।

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসে বিমান ভাবেন, তিনি কি মরে গিয়েছেন? এই শয্যা কি তাঁর? এই বাড়ি? এই আবহ ও আসঙ্গ? ওই রাতচরা পাখির ডাক? দূর হাইওয়েতে নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে চলে যাওয়া ট্রাকের শব্দ? এরা কি তাঁর পরিচিত? কোথাও কি যাওয়ার ছিল তাঁর? কোনও ফেলে রাখা কাজ?

মশারি তুলে বাইরে এসে জল খান, বাথরুমে যান। অন্য ঘরে নন্দিতা ঘুমোচ্ছে, উঁকি মেরে দেখেন। পাখার স্পিড বাড়িয়ে দেন। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান। কখনও বা আওয়াজ বন্ধ করে টিভি চালিয়ে বসে থাকেন।

মৃত্যু কী? এই চিন্তা ইদানীং একাকিত্বে তাঁকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এক চলমানতার সমাপ্তি, একটি সরলরেখার থেমে যাওয়া, একটি বাক্যের পূর্ণচ্ছেদ। পূর্ণচ্ছেদে অনেক বেশি নাটকীয়তা। মৃত্যুতে তাও নেই। একটি রেখা টানতে টানতে কালি ফুরিয়ে যাওয়ার মতো মৃত্যু আকস্মিক।

ট্রেন থামছে। কিছু লোক উঠছে, কেউ কেউ নেমে যাচ্ছে। ট্রেন চলতে শুরু করছে। কিছুক্ষণ পর নতুন স্টেশন। কোথাও প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে একটা শিমুলগাছ লালে লাল হয়ে রয়েছে, কোথাও চা-ওয়ালা হাঁকতে হাঁকতে হেঁটে যাচ্ছে, কোনও স্টেশনে মার কোল থেকে নেমে শিশু টলমল পায়ে এগুতে গেলে ত্রস্ত মা ধরে ফেলছে। খণ্ড খণ্ড দৃশ্য। অভ্যস্ত, অথচ দেখতে গেলে সুনিয়ন্ত্রিত, সুতোয় গাঁথা।

জীবন কি এই রকম? যে স্টেশনে গাড়ি থেমে রয়েছে সেখানেই তোমার চোখ মেলা। তুমি দেখছ। পরিচিত দৃশ্য, চেনা মানুষজন, অভ্যস্ত জীবনযাপন। হঠাৎ ট্রেন নড়তে শুরু করবে। মুছে যাবে দৃশ্যপট, হারিয়ে যাবে চেনা মানুষেরা। পরের অন্ধকার কি অনন্ত? না কি তার পরেও অপেক্ষা করে আছে অন্য এক স্টেশন, অন্য সাহচর্য?

ভাবতে গেলে কষ্ট হয়। এক আশ্চর্য অজানার কাছে এসে হাত ঠেকিয়ে তার হিমেল শীতলতায় শিউরে উঠে ফিরে যেতে হয় বার বার। চেষ্টা করেন ভাবনাটাকে ঠেকিয়ে রাখার। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে এসে যায়, দখল করে নেয় চিন্তার প্রকোষ্ঠ।

তার চেয়ে ঘুমন্ত পিন্টু দৃশ্য হিসাবে অনেক নিরাপদ।

পিন্টুর শৈশব। সাইকেলের রডে বসিয়ে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন বিমান। ওর চুল তাঁর চোখে মুখে লাগছে, চুলের গন্ধ আচ্ছন্ন করছে চোখ, মায়া নরম করে দিচ্ছে চিবুক ও ওষ্ঠ, দায়িত্ব সংবদ্ধ করছে হাতের পেশি। নামকরণ। সেও তো তাঁরই করা। বড় হলে দুরন্ত হয়ে উঠল পিন্টু। অবাধ্যও। এক দিন মাখনবাবু সাইকেল থেকে নেমে বললেন, ভাইয়ের খবর রাখো বিমান?

মাখন মিত্তির কালিগঞ্জ হাইস্কুলের নামকরা ইংরেজির টিচার। পিন্টুর দেখভালের দায়িত্ব তাঁর ওপরেই বর্তেছিল। দেরি হবার আগেই সতর্ক করেছিলেন মাখনবাবু।

ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরেছিলেন বিমান। এসেই খোঁজ করেছিলেন পিন্টুর। বাড়ি ছিল না পিন্টু। প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। বিকেলে হাতের কঞ্চিটা যখন পিঠে ভাঙলেন, রাগ তখন অনেক কমে এসেছে। দৌড়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে যখন পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছিল, তখন বিমানই টেনে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

পড়াশুনোটা দেখছিলেন তখন থেকেই। স্কুল ফাইনাল অবধি প্রায় রোজই নিয়ে বসেছেন। পাশ করে হাসতে হাসতে প্রথম কথাই বলেছিল, যাক আর অঙ্ক লাগবে না। মনে আছে একদিন সকাল থেকে পেট খারাপ, শুয়ে আছেন, পিন্টু গেল ডাব পাড়তে। নারকেল গাছে উঠছিল, পা পিছলে পড়ে গেল। দৌড়ে গিয়েছিলেন বিমান। সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিলেন ডাক্তারখানায়। কপালে স্টিচ পড়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় বিপদ, কিছু দিন পর খিঁচুনি শুরু হল। কলকাতায় মেডিকাল কলেজে দেখাতে নিয়ে যাওয়া হল। বড় ডাক্তার ওষুধ দিয়েছিলেন নাম মনে আছে বিমানের, গার্ডিনাল, তিন বছর টানা ওষুধ খেতে হয়েছিল।

ভাবতে গেলে অনুশোচনা হয়। অত বড় ক্ষতিটা হয়ে গেল পিন্টুর। তাঁরই জন্যে তো!

বিসিএস পরীক্ষায় বসেছিল। দু'বারই এক কথা বলেছিল, অঙ্কটা না থাকলে ঠিক পাশ করে যেতাম। জমিদারবাড়ির ছেলে, ধষলেও অহঙ্কার যায় না। অনেক বুঝিয়ে ভাবনাটা মন থেকে তাড়িয়েছিলেন, জমিদারবাড়ির বড় ছেলে হয়ে যদি আমি স্কুলমাস্টার হতে পারি, তোর বাধাটা কোথায়?

ক্লার্কশিপ পরীক্ষা দিয়েছিল। চাকরি পেয়ে গিয়েছিল। বাবাকে আগে জানাতে বারণ করেছিল। জয়েন করার পর বিমান নিজেই ভেঙেছিলেন। বলেছিলেন, ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট-এ ভাল চাকরি পেয়েছে পিন্টু, সরকারি চাকরি। জয়েন করে গেছে। বাবার তখন অথর্ব অবস্থা। জানতে চেয়েছিলেন, মাইনে

কত? বাড়িয়ে বলেছিলেন বিমান। বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

চাকরি পিন্টুর ওপর থেকে রাংতাটা খুলে নিয়েছিল। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা উড়িয়ে নিয়ে গেল মিত্রা। এবারে মা বেঁকে বসেছিল। নমশুদ্দুরের মেয়ে। মুকুজ্যে বাড়ির বউ হয়ে আসবে? আমি বেঁচে থাকতে নয়।

বিমানই পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিন। নিজে সাক্ষী থেকে বিয়ে দিয়েছিলেন। সামাজিক বিবাহও হয়েছিল পরে। মা-ও মেনে নিয়েছিল।

পিন্টুর ঘুম ভাঙছে। দু'বার হাওয়া চিবোনোর ভঙ্গি করল পিন্টু। কষের লালা রুমালে মুছে নিল। বিমান দেখলেন সে দিনের সেই রডে বসে স্কুলে যাওয়া পিন্টুর পঞ্চাশ ভাগ চুলই সাদা, গলার চামড়া ঝুলে গেছে, গালে মেচেতার দাগ।

গলায় চল্লিশ বছর আগের বিমানকে ফিরিয়ে এনে বললেন, চা খাবি?

লাজুক হাসল পিন্টু। চশমা খুলে চোখ মুছে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কোন স্টেশন এল?

নৈহাটি আসছে। চা খাবি?

খেলে হয়। রাজুর চা, মনে আছে তোমার?

হ্যাঁ। গতবারে খোঁজ নিয়েছিলাম। রাজু মারা গেছে। ওর ছেলেরা মানুষ হয়ে বিহারে ব্যবসা করছে, খেতিবাড়ি করেছে, বেঁচে থাকলে রাজু ভোটে দাঁড়িয়ে যেত এতদিনে।

কাল অনেক রাত অবধি মিত্রার সঙ্গে ঝগড়া করেছে পিন্টু। বিমান না থাকলে আরও গড়াত। তাড়াতাড়ি না বেরুলে দিনটা নষ্ট হবে, তাই ডেকে তুলে দিয়েছিলেন বিমান। বাকি ঘুমটুকু ট্রেনেই পুষিয়ে নিল পিন্টু।

আচ্ছা, ব্রত কি আমারও ছেলে নয়, তুমি বলো?

কাল রাতের আলোচনাটা আবার ড্রয়ার থেকে বের করে আনছে পিন্টু। বিমান সতর্ক হলেন। মনে মনে মিত্রার পক্ষই নিয়ে ফেলেছেন বিমান। পিন্টুর ব্যালান্সের অভাব। যদি জমিটা বিক্রি হয়, পিন্টুর টাকাটা যাতে মিত্রা, নিদেনপক্ষে ব্রতর নামে জমা পড়ে, তার জন্য যতখানি সম্ভব তিনি করবেন। পিন্টু আটকানোর চেষ্টা করবে। তাঁর আর পিন্টুর নামেই জমি। চেকে টাকা দিলে পিন্টুর অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। সে ক্ষেত্রে পিন্টুর খপ্পর থেকে বের করা শক্ত। এ সব ক্ষেত্রে কি চেকে লেনদেন হয়?

পিন্টু তলানি চাটুকু খেয়ে জানলা দিয়ে ভাঁড় ফেলে বলল, এই জন্যেই মা অত করে বারণ করেছিল। কোন বংশের মেয়ে দেখতে হবে তো?

বিমানের মুখ তেতো হয়ে গেল। মেয়ে হিসেবে মিত্রা খুবই ভাল। লেখাপড়াও শিখেছিল। পিন্টু পছন্দ করত না বলেই চাকরি নেয়নি। এখন তার অতীত স্মরণ করা অকৃতজ্ঞতা।

কথাটা পিন্টুই বলল, ঘুরিয়ে।

অকৃতজ্ঞ! পাঁকে পড়েছিল, মাথায় করে রেখেছি তো, তার মূল্য বুঝল না। এখন গলায় গামছা দিয়ে আদায় করে নিতে চাইছে। ওইটাই ছিল আসল ধান্দা। জমিদারের ছেলে, মরা হাতি লাখ টাকা। কোনও না কোনও দিন সম্পত্তির ভাগ পাবেই। তখন যতখানি পারি খিঁচে নেব।

ভাল লাগছিল না বিমানের। ছোটবেলার স্মৃতি বিমানের মন থেকে মুছে যাচ্ছিল। পিন্টু নিজেই যেন ভেজা ডাস্টার দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ড থেকে ঘষে সব তুলে ফেলছিল। মেনে নিতে পারছিলেন না বিমান।

যে দিন স্টেশনে রমেনের সঙ্গে দেখা হল, রমেনের কথাগুলো মনে থেকে গিয়েছিল। নিজে থেকে যোগাযোগ করবেন কি না ভাবছেন, সুযোগ হয়ে গেল। কেটারিংয়ের বিজনেস খুলেছে শৈবাল, রাস্তায় দেখা, কথায় কথায় বলল, কেটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের কনফারেন্স হচ্ছে রবীন্দ্রভবনে, আপনার চেনা একজন এসেছে, আপনার নাম করছিলেন। কে জিজ্ঞেস করতে শৈবাল বলল, রমেন সাহা, তার বাবার সঙ্গে না কি আপনার বহুদিনের আলাপ। শুনেই রক্ত চলকে উঠেছিল বিমানের। বলেছিলেন, রমেন? হ্যাঁ, ওকে তো ছোট থেকে চিনি। এক কাজ করো, ফাঁক পেলে এক বার বাড়ি নিয়ে এসো। বহু দিন দেখাসাক্ষাৎ হয় না।

নন্দিতা বাড়ি ছিল না। সুযোগটা নিয়েছিলেন বিমান। রমেনেরও ইন্টারেস্ট ছিল বোঝা গেল। এক কথাতেই এসে হাজির হল।

চমৎকার বাড়ি করেছেন।

ওতে আমার অবদান সামান্যই। তোমার কাকিমা দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছেন, ছেলেরা সাহায্য করেছে।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে রমেন বলল, বাগানটাও চমৎকার। উত্তর দিলেন না বিমান। এগুলো সবই গৌরচন্দ্রিকা। আসল কথায় আসুক রমেন।

আমার প্রোপোজালটা নিয়ে কিছু ভাবলেন?

ভেবেছি। পিন্টুর সঙ্গেও কথা বলেছি। আর একটু বাড়ালে আমরা রাজি আছি।

পল্টু তো কিছুই দিচ্ছিল না। সেখানে আমি যা দর দিলাম আপনাদের পছন্দ হল না?

পছন্দ অপছন্দের কথা নয় রমেন। আমরা উপযুক্ত দর চাইছি। ওটাই আমাদের শেষ প্রপার্টি। যা পাওয়া যায়।

একটু ভাবল রমেন। তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ঠিক আছে। আমি ফাইনান্সার-এর সঙ্গে কথা বলি। আপনাদের স্বার্থ দেখব কথা দিচ্ছি। তবে খুব তাড়াতাড়ি ডিলটা হয়ে যাওয়া দরকার। পিন্টুকাকার সঙ্গেও কথা বলতে হবে। সামনের রবিবার আপনারা ফ্রি আছেন?

রবিবার? আমার অসুবিধা নেই। পিন্টুকে জিজ্ঞেস করি। তোমাকে না হয় দু'এক দিনের মধ্যে ফোন করব।

উঠলে কেন? চা খেয়ে যাও।

থাক, সব মিটে গেলে পাত পেড়ে খেয়ে যাব।

সে দিনই রাত্তিরে পিন্টুকে ফোন করেছিলেন। পিন্টু এক কথায় রাজি। আজ রবিবার। দশটায় রমেনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

প্ল্যাটফর্মের রেলিং-এ এক জায়গায় ফাঁকা। ফাঁক গলে পা রাখলেই বিমানের জমি। এইখানে ডানপাশে গোটা দশেক আমগাছ ছিল, ল্যাংড়া আমের। বাবার আমলে গাছ কিনত নাড়ুজ্যাঠা। টাকা ছাড়াও ঘরভরতি আম মিলত। পাতায় ছাওয়া ঘরে পা ছড়িয়ে ফুটো করে চুষে আমের রস খাওয়ার কী যে সুখানুভূতি! পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের নেহাৎই দুর্ভাগা মনে হয় বিমানের। আমগাছগুলো নেই। গাছশুদ্ধ জমি কিনে নিয়েছিল ঘোষেরা। নির্দয়ভাবে গাছ উপড়ে ফেলে কাঠের গোলা বানিয়েছে। কাঁধ অবধি উঁচু পাঁচিল। তাকানো বারণ।

তারপরেই ইঁটখোলার পুকুর অবধি পর পর পাঁচ ছ'খানা বাঁশঝাড়, মাঝে অল্প ফাঁকা জমি, সেখানে সর্ষের চাষ হত। সব বেদখল হয়ে গেছে। বাড়ি উঠে গেছে অসংখ্য। শুরুতে ছিল দরমার বেড়া, খোলার চাল। ভয় ছিল জমির আসল মালিক চাইলে যদি ছেড়ে দিতে হয়। ক্রমশ ভয় উবে গেছে, নীচের জমি শক্ত হয়েছে, দেওয়ালে লেগেছে সিমেন্ট, চালে করোগেটেড শিট। আর একটা ইলেকশন পার হলেই পাকা বাড়ি দেখতে পাওয়া যাবে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বাড়ি, ফাঁকা জমিটুকুই এখনও অবশিষ্ট। ঘুরে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন কলাগাছগুলো এলোমেলো, পেঁপে গাছের ডাল ভাঙা। হনুমান এসেছিল মনে হয়। বাড়িখানা করে রেখেছে দেখো? যে কেউ দেখলে বলবে পোড়োবাড়ি।

ওপরের ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। চেয়ার টেনে বসলে অনেক দূর

অবধি দেখা যায়। ট্রেনের আসা যাওয়া, প্ল্যাটফর্মে চলন্ত মানুষ, ওপারে পিচরাস্তায় টু-হুইলার। পিন্টু এসেই বাথরুমে ঢুকল। জগু বালতিতে জল তুলে রেখেছে, শব্দ হচ্ছে। ঘড়ি দেখলেন বিমান। দশটা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি। রমেন সামনের রাস্তা দিয়েই আসবে। নীচের দরজা খোলাই রেখে এসেছেন।

ট্রেনের কাগজখানা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। চোখ বোলালেন। যুদ্ধ-হত্যা-দাঙ্গা। মানুষ কি এই ভাবেই নিজেকে ক্ষয় করে? পৃথিবী না কি বহুবার ধ্বংস হয়ে আবার গড়ে উঠেছে। সে ছিল প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। এবারে মানুষই পৃথিবীকে চূর্ণ করবে।

আজকাল কিছুতে মনোনিবেশ করতে পারেন না। মন সরে সরে যায়। এলোমেলো চিন্তা। ধ্বংসের কথা, মৃত্যুর কথা, অবক্ষয়ের কথা। এটাই কি বয়েস?

আজ বেশি হচ্ছে। ভেতরে একটা উত্তেজনা। হাত ঘামছে, জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছে। কিছুক্ষণ পরপরই রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছেন। অতগুলো টাকা, এত বড় ডিল জীবনে প্রথম। সব ঠিকঠাক হবে তো? কীভাবে নেবেন? কোথায় রাখবেন? কাগজপত্র কোনও উকিলকে দেখিয়ে নেওয়া ভাল। কারওকে কি সঙ্গে আনা উচিত ছিল? আজ নিশ্চয়ই শুধু কথাবার্তা হবে। টাকাপয়সার লেনদেন সইসাবুদ হবে পরে।

পিন্টু দু'বার এসে ঘুরে গেল। ঘড়ি দেখলেন বিমান। সওয়া দশটা। দেরি করছে রমেন। অবশ্য গ্রামদেশে সময়ের হিসাবটা গোলমেলে। কিন্তু মোহনপুরকে কি এখনও গ্রাম বলা যায়? স্কুল-কলেজ-সিনেমা হল-রেললাইন-নার্সিংহোম গ্রাম্যতার খোলশ ছেড়ে ফেলার পক্ষে কি যথেষ্ট নয়?

সাড়ে দশটা। পিন্টু একটা মোড়া টেনে পাশে বসল।

বড্ড দেরি করছে রমেন।

তাই দেখছি।

কী কথা হয়েছিল? ক'টায় বলেছিল?

দশটা।

আজই তো? দিনের হিসাব গোলমাল করোনি তো?

বলল তো রোববার।

এই রবিবার না হয়ে পরের রবিবারও হতে পারে।

না, বেশ মনে আছে। এই রবিবারের কথাই হয়েছিল।

ভুলে যায়নি তো?

এত বড় কাজ, ভুলে যাবে?

ওদের কথার কোনও ঠিক আছে? দেখো গিয়ে আরও বড় কোনও দাঁও পেয়েছে, সেখানেই আটকে রয়েছে। জানে আমাদের যাবার অন্য জায়গা নেই। হেলতে দুলতে দুপুরবেলায় এসে হাজির হবে।

দশটা নয়, এগারোটা দশে দেখা গেল রেলিংয়ের ফাঁক গলে কে যেন ঢুকছে।

রেলিংয়ের ওপর থেকে ঝুঁকে দেখল পিন্টু, ফিরে আসতে আসতে বলল, রমেন নয়, পল্টু।

পল্টু? এখন?

অস্বস্তি হতে লাগল বিমানের।

কাছাকাছি এসে ওপরে তাকাল পল্টু, দাঁত দেখিয়ে হাসল।

কী ব্যাপার বড়মামা? আজ যে দু'জনেই একসঙ্গে হাজির? স্পেশাল কিছু?

জবাব দিলেন না বিমান। পিন্টু মুখ বাড়িয়ে বলল, নীচ থেকেই বকবক করবি না ওপরে আসবি?

পিন্টুর ওপর রাগ হচ্ছিল বিমানের। কী দরকার ছিল ওপরে ডাকার? রমেন ওকে দেখলে আর কোনও কথা বলবে?

পিন্টু গলা নামাল, পল্টুর যাতে সন্দেহ না হয়, তাই ওকে ডাকলাম দাদা, দু'চারটে কথা বলেই বিদেয় করে দেব।

কাজ করা বাটিকের পাঞ্জাবি পরেছে পল্টু, সাদা চোস্ত পাজামা। চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে পকেটে রাখল। মোবাইল ফোনটা রাখল টেবিলের ওপর। এখানেও মোবাইল?

বলো, কেমন আছ তোমরা? মামি? সবাই ভাল?

এই বয়েসে যেমন থাকে মানুষ। বাতব্যথা, অম্বল। তোরা কেমন আছিস? বাবার হার্ট-এর কী একটা প্রবলেম হয়েছিল শুনেছি...।

এখন অনেকটা ভাল। কল্যাণীতে ডাক্তার দেখিয়ে এনেছি। ওষুধ খাচ্ছে। ডাক্তার অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করতে বলেছে, বাবা রাজি হচ্ছে না।

পিন্টু আর এক বার বাথরুমে গেল। ওর কি প্রস্টেটের সমস্যা হচ্ছে? এসে পাশে বসল।

তারপর তোর কাজকর্ম কেমন চলছে?

ভাল নয়। মানুষের হাতে পয়সা কোথায়? টাকা থাকলে তবে না মানুষ

কিনবে? বাড়ি, গাড়ি, কনজিউমার গুডস। কলকারখানা বন্ধ, ব্যবসাপাতিরও হাল খুব খারাপ। ভাল নেই মামা। ওপর থেকে বোঝা যায় না। উনুনে আঁচ পড়ে না অনেক বাড়িতে, আমরা তো খবর রাখি।

ছেলেটা বুঝদারের মতো কথা বলে। কেন যে রমেন ওর নামে খামোকা কতকগুলো বাজে কথা বলে গেল!

পা ছড়িয়ে বসল পল্টু।

তারপর? তোমাদের কিছু এগোল? ভাবলে কিছু?

পিন্টুর দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিলেন বিমান।

কীসের কথা বলছিস?

জমি, বাড়ি এই সব? কিছু করার কথা ভাবলে? যাতে মোহনপুরের মানুষের উপকার হয়, আবার তোমাদেরও কিছু থাকে।

তুই তো একটা প্রোপোজাল দিয়েছিলি?

হ্যাঁ। কিন্তু প্রোপোজালটা মডিফাই করতে হবে।

কেন?

থার্ডলাইন হবে এ দিকে। রেল আশপাশের জমি অ্যাকোয়ার করে নেবে।

সে কথা তো ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি।

তখনকার সঙ্গে এখনকার অনেক তফাত। বাংলাদেশের সঙ্গে বাস সার্ভিস চালু হয়ে গেছে। ট্রেনও চালু হল বলে। প্যাসেঞ্জারের লোড বাড়বে। ব্যবসাবাণিজ্যও শুরু হবে। গুডসট্রেন চলবে রেগুলার। তার জন্য থার্ডলাইন বসানো এসেনশিয়াল।

বিমান লক্ষ করলেন, পল্টু কলকাতার লোকেদের মতো কথার মাঝেমাঝে ইংরেজি শব্দ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সব ক'টা যে ঠিকঠাক তা নয়, তবে একটা পালিশ আসে।

পিন্টু গলা থেকে কফ পরিষ্কার করল, তা হলে এখন কী প্রোপোজাল দিচ্ছিস?

পুরো জমিটা ধরে বিশখানা দোকানঘর হবে ভেবেছিলাম, এখন যা দেখা যাচ্ছে মেরেকেটে গোটা বারো হবে। লোকজনের অবস্থাও খারাপ। দেড় দু' লাখ টাকা সেলামি দিয়ে কেউই দোকান নিতে চাইছে না।

পল্টু নেমে আসছে। কিন্তু কতখানি? কতটুকু থাকবে তাঁদের?

জিজ্ঞেস করলেন বিমান।

তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে শেষ পর্যন্ত?

পল্টু হাতের কর গুনল। দাঁড়াচ্ছে বারোখানা দোকানঘর। যে তৈরি করবে তার ছ'খানা থাকবে। ছ'টা তোমাদের।

মানে তিনখানা করে এক একজনের, মনে মনে হিসাব করলেন বিমান।

কত করে রেট? পিন্টু জানতে চাইল।

ওই যে বললাম। সেলামি এক লাখ। ওর বেশি দাম পাওয়া মুশকিল।

ঘাম হচ্ছে বিমানের। তিনটে দোকানে তিন লাখ। অথচ রমেন বলেছিল পনেরো কাঠা জমির দাম তিরিশ, এক একজনের ভাগে পনেরো, এ তো ডাহা ঠকাচ্ছে!

পিন্টুও নিশ্চয়ই ভাবছিল। তিন লাখে ওর হবে না। ব্রতর জন্যও কিছু করা যাবে না।

পা নাচাচ্ছিল পল্টু।

বিমান বললেন, ঠিক আছে, দেখি খোঁজখবর নিয়ে। কেউ যদি আরও ভাল অফার দেয়, আমাদের তো ওইটুকুই সম্বল। বেচে দেবার আগে দশবার ভাবতে হবে।

পল্টুর পা নাচানো থেমে গেল। কেটে কেটে বলল, দ্যাখো বড়মামা, তোমাকে সোজাসুজিই জানিয়ে রাখি, আমি যে ওই জমিটায় ইন্টারেস্টেড এটা তল্লাটের সবাই জেনে গেছে।

ভালই তো। আরও সুবিধা হবে। এতদিন ফ্যামিলির ভেতরেই কথাবার্তা হচ্ছিল, এবারে বাইরের দর কেমন খোঁজখবর নেওয়া যাবে। লোকে উৎসাহিত হবে।

না বড়মামা, হবে না। পল্টু যে জমিতে নজর দেয়, সে দিকে কেউ হাত বাড়ায় না। এত সাহস এ অঞ্চলে কারও নেই।

তুই কি ভয় দেখাচ্ছিস? তড়পে উঠল পিন্টু।

আস্তে ছোটমামা। যা বলার সেটা বলে গেলাম। জমি যদি বেচো, আমাকেই বেচতে হবে। মার্কেট কমপ্লেক্স যদি বানাও, আমিই বানাব। অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে যেও না, ফল ভাল হবে না।

সেলফোনটা তুলে সিঁড়িতে শব্দ করে নেমে গেল পল্টু। বেরিয়ে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলও না।

দেখার দরকার ছিল না, স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন বিমান। বজ্রাহতের মতো দেখাচ্ছিল পিন্টুকে।

অনেকক্ষণ পর পিন্টু বলল, রমেন তো এল না।

তাই তো দেখছি।

চলো দাদা, খেয়ে নেওয়া যাক।

টিফিন বাটিতে লুচি, তরকারি, চমচম ভরে দিয়েছিল মিত্রা। খেতে বসে বুঝলেন গলা দিয়ে নামছে না। জল দিয়ে গলা ভিজিয়ে দু'খানা লুচি খেলেন বিমান। পিন্টু তাও খেল না।

টিকিটঘরটা আপ প্ল্যাটফর্মে। টিকিট কেটে ওভারব্রিজে উঠছেন, কোথা থেকে উদয় হল রমেন, পাশে ডেকে নিয়ে গেল।

জমি বিক্রি করছেন, পল্টুকে জানালেন কেন?

পল্টুকে কেন জানাতে যাব? ওর সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি এ ব্যাপারে।

শালার শকুনের চোখ। গন্ধ পায়, পরশু রাত্তিরে দোকানে এসেছিল। থ্রেট করে গেল। ওই জমিতে চোখ দিলে হাত পা বেঁধে লাইনে ফেলে দেবে।

বিমান বললেন, তুমি এলে না। আজ পল্টু এসেছিল, শাসিয়ে গেল। বলল জমি ও ছাড়া অন্য কারওকে দিলে ফল ভাল হবে না।

ঠিকই বলেছে পল্টু। পুলিশ, পার্টি সব ওর কব্জায়। ওকে ডিঙিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়। ওকে লুকিয়েও নয়। ক্ষমা করবেন বিমানকাকা। আমার দ্বারা হল না। পল্টুর সঙ্গেই কথা বলুন। একটা সেটেলমেন্টে আসুন। দেখুন কতখানি আদায় করে নিতে পারেন।

যেমন এসেছিল তেমনি ওভারব্রিজের ছায়ায় মিশে গেল রমেন। ট্রেন আসছিল। পিন্টু দৌড়ে ওভারব্রিজে উঠতে উঠতে বলল, দাদা, তাড়াতাড়ি।

বিমান দাঁড়িয়ে পড়লেন—তুই যা। আমি পরের ট্রেনে যাচ্ছি। আমার অত তাড়াহুড়ো পোষাবে না।

৮

তড়পাচ্ছিল পিন্টু।

পুরো রাস্তাটা ভেজা বিস্কুটের মতো মিইয়ে পড়েছিল। সমস্ত তেজ উবে গিয়েছিল। ওর দিকে তাকিয়ে কষ্টই হচ্ছিল বিমানের। টাকাটা পাওয়ার ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছিল পিন্টুর, ওর ভেঙে পড়া স্বাভাবিক।

বাড়ি ফিরে হাতে-গড়া দু'খানা গরম রুটি, লাউছেঁচকি আর এক কাপ চা পেটে পড়ার পরই পিন্টুর অন্য মূর্তি।

ঘরের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে যেখান থেকে শুরু করেছিল সেইখানে ফিরে আসছে, শূন্যে হাত ছুঁড়ছে। টেবিলের ওপর ঘুসি মেরে নিজেই উঃ করে কঁকিয়ে উঠছে।

সঙ্গে মুখ চলছে অবিরাম।

কী ভেবেছে আমাকে? কাপুরুষ? যা বলল তাই মেনে নেব? সুড়সুড় করে চলে আসব? নিজেকে কী মনে করে ও? মাস্তান? ডন? যত বড় ডনই হও, মনে রেখো বাবারও বাবা আছে। ঠিক খুঁজে বের করব। ওর কি শত্রু নেই? ওকে টাইট দেবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে না কেউ? নিশ্চয়ই আছে। রমেনটা মেনি বেড়াল, ভয় দেখাল, অমনি ল্যাজ তুলে সরে পড়ল। জলের দরে জমি ঝেড়ে দেব, তবু পল্টুর ফাঁদে কিছুতেই ধরা দেব না।

মিত্রা দেখছিল। পিন্টুর এই চেহারার সঙ্গে ওর পরিচয় আছে। রান্নাঘর থেকে এক বার ইশারায় বিমানকে পাশের ঘরে চলে যেতে বলল, বিমান তা করলেন। হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পাল্টে ফ্যান চালিয়ে বিছানায় লম্বা হয়েছেন, মিত্রা এসে দাঁড়াল।

হম্বিতম্বি করে কোনও লাভ আছে, আপনিই বলুন?

বিমানও একমত, এত দূর থেকে পল্টুর সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। জমিটা তো যাবেই, তার চেয়েও বেশি কিছু চলে গেলে ছেলের হাত ধরে মিত্রা পথে বসবে।

অন্য কোনও রাস্তা ভাবতে হবে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।

তেমন কিছু ভেবেছ?

ভাবছি দাদা, ওকে দিয়ে হবে না। ঘুমিয়ে পড়ুক। তখন আপনাতে আমাতে বসব। ব্রতও ততক্ষণে এসে পড়বে।

ভুল বলেনি মিত্রা। এক সময় গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতো চুপসে কুঁকড়েমুকড়ে শুয়ে পড়ল পিন্টু। ব্রত ফিরল রাত করে। খাওয়া দাওয়া শেষে বারান্দায় বসল তিনজনে।

এক চিলতে বারান্দা, কিন্তু গঙ্গার এমনই গুণ, দশ বারো মাইলের মধ্যে যে-ই থাকুক, রাত্তিরে ঠিক হাওয়া পাঠিয়ে দেয়। ঝিরঝিরে হাওয়ায় সারাদিনের অশান্তি জুড়িয়ে আসছিল।

মিত্রা বলল, ঠিকঠাক বলুন তো দাদা, কী বুঝলেন? ওই জমিটা নিয়ে কি আর কোনও আশা নেই?

বিমান বললেন, আশা বলতে ওটা বিক্রি করলে, ঠিকঠাক বললে, পল্টুকে

দান করলে, লাখ তিনেক টাকা পাওয়া যাবে। তার চেয়ে বেশি নয়।

লাখ তিনেক? তার চেয়ে গরিব মানুষকে ডেকে দিয়ে দিলেই তো হয়!

কষ্ট করে দিয়ে দিতে হবে না। যে রেটে রিফিউজিরা বাড়িঘর তুলছে, যে কোনও দিন দেখবে আটদশটা ফ্যামিলি ঘরবাড়ি বানিয়ে থাকতে শুরু করেছে।

অন্য কেউ তো নেবেও না বলছেন?

রমেনের কথা শুনে তা-ই মনে হল। পল্টুও শাসিয়ে গেছে। মোদ্দা কথা, হয় পল্টুকে দিতে হবে, নইলে ও জমি অমনি পড়ে থাকবে, বারো ভূতে লুটে খাবে।

তা হলে উপায়?

সত্যি সত্যি মাথায় হাত দিল মিত্রা। মোড়ায় বসেছেন বিমান, মাটিতে শতরঞ্চি পেতে মিত্রা আর ব্রত।

ব্রত এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। বলল, পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখা যেতে পারে, এ সব ব্যাপারে পার্টি পাশে দাঁড়ায়।

খোঁজ নিয়েছি। পার্টিকে পকেটে পুরে ফেলেছে পল্টু।

দাদা আপনিই তাহলে বলুন। কোনও উপায় নেই? কোনও ভাবেই কি প্রপার্টিটা বাঁচানো যাবে না? ওটার ওপর বিরাট ভরসা ছিল আমার। অনেক আশা করে বেঁচেছিলাম।

বিমান সময় নিলেন। গঙ্গার হাওয়া নিলেন বুক ভরে। তারপর বললেন, আমি জমিটা বাদ দিয়ে ভাবছি।

জমি বাদ দিয়ে?

হ্যাঁ, জমিটা যেমন আছে থাকল। একটা পাঁচিল দিয়ে আপাতত ঘিরে রাখা হল। কিছুটা হলেও সিকিওরিটি। বাড়িটা সংস্কার করে কিছু করা যায় কি না ভাবছি।

সোজা হয়ে বসল মিত্রা, কী ভাবছেন?

অত বড় বাড়ি। একতলা দো'তলা মিলিয়ে ষোলখানা ঘর। প্ল্যান করে তৈরি নয়। বাথরুম, পায়খানাও পর্যাপ্ত নয়। তবু মনে হয় রিনোভেট করে নিলে ইউটিলাইজ করা যায়। তোমরাও একটু ভাব না।

ব্রত ভুরু কুঁচকে ভাবল। ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমি একটা আইডিয়া দিতে পারি।

কী আইডিয়া?

একটা কম্পিউটার স্কুল খুললে কেমন হয়। আজকাল হেভি ডিমান্ড, সব

ক'টা কম্পিউটার সেন্টার রমরম করে চলছে। চার পাঁচ শিফট করেও জায়গা দিতে পারছে না। তিন মাসের ট্রেনিং, তাও সপ্তাহে দু'তিন দিনের বেশি নয়, তিন হাজার টাকা।

ঘাড় নাড়লেন বিমান, আইডিয়াটা খারাপ নয়। কিন্তু অত টাকা ইনভেস্ট করব কোথা থেকে? এক একটা কম্পিউটার কম করে তিরিশ হাজার, পাঁচখানা দিয়ে শুরু করতেই হবে। তার সঙ্গে ট্রেনার। ইন্টারনেট কানেকশনও নিতে হবে। মোহনপুরের মতো জায়গায় অত ছেলে, একগাদা টাকা দিয়ে কম্পিউটার শিখতে আসবে, ব্যাপারটা আমার কমার্শিয়ালি ভায়াবল মনে হচ্ছে না।

তা ছাড়া, মিত্রা বলল, বাড়িটার যা ভগ্নদশা, ওটা সারিয়ে-সুরিয়ে ভদ্রস্থ করে তুলতেও অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে যাবে।

ব্যাঙ্ক লোন নেওয়া যায় না?

ব্রতর কথায় বিমান বললেন, হ্যাঁ যায়। কিন্তু আজকাল ব্যাঙ্কও লোন দেবার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গেছে। লোন নিতে গেলে বাড়িটা, হয়তো জমিটাও মর্টগেজ রাখতে হবে। সেন্টার না চললে, ব্যাঙ্ক সব বিক্রি করে টাকা তুলে নিয়ে চলে যাবে।

মাথা চুলকোতে লাগল ব্রত। এত কিছু ভেবে বলেনি। দেখেছে পাড়ায় পাড়ায় পান বিড়ির দোকানের মতো কম্পিউটার সেন্টার, নিশ্চয়ই লাভে চলে, বলে ফেলেছে।

আজকাল কোচিং সেন্টারও তো খুব ভাল বিজনেস, দাদা। ব্রত যেখানে পড়তে যায়, এক এক ব্যাচে চল্লিশজন পড়ে, মাথা পিছু তিনশো, কতগুলো ব্যাচ চলে জানেন?

মার কথায় ব্রত উৎসাহিত হল।

হ্যাঁ, জেঠু, কোচিং সেন্টারও আজকাল হেভি চলছে। এইচএস, জয়েন্ট, আইআইটি থেকে বিসিএস, আইএএস, ম্যানেজমেন্ট, প্রবেশনারি অফিসার, কী নেই? সঙ্গে যোগ হয়েছে স্কুল সার্ভিস। বছর বছর পরীক্ষা। লক্ষ লক্ষ ক্যান্ডিডেট। যে খুলছে সে-ই লাল হয়ে যাচ্ছে। কোচিং সেন্টারই খুলে ফেলো জেঠু।

ভাবছিলেন বিমান। শিক্ষার বাণিজ্য। ঘুরিয়ে বললে, বাণিজ্যের জন্য শিক্ষা। উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন। শিক্ষা তার একটা পথ। তুলনায় কঠিন। আর পাঁচটা রাস্তায় আরও সহজে অর্থ উপার্জন করা যায়। কে যেন বলেছিল, টাকা

রোজগার করার জন্য দু'খানা চোখ আর চোখের পেছনে একটা মস্তিষ্কই যথেষ্ট। রাস্তায় যেতে যেতে তুমি দেখলে লম্বা লাইন পড়েছে। কী জন্য লাইন জানার প্রয়োজন নেই। লাইনে দাঁড়িয়ে যাও। এক ঘণ্টা পর তোমার জায়গা একজনকে বিক্রি করে কাজে চলে যাও। এক ঘণ্টায় না হোক বিশ তিরিশ টাকা আমদানি হয়ে যাবে।

শিক্ষা শিক্ষা করে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। পারসেপশনের গোড়াতেই বোধ হয় গলদ থেকে গিয়েছে। না কি তাঁরাই ব্যাকডেটেড?

তত্ত্বকথা বাদ দিয়ে কোচিং সেন্টারের সুবিধা-অসুবিধাগুলোর কথা ভাবার চেষ্টা করলেন বিমান।

আপাতদৃষ্টিতে বিরাট কিছু ইনভেস্টমেন্ট নেই। বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড, কয়েকজন ভাল টিচার। ভালর সংজ্ঞা অবশ্য বিগত কয়েক বছরে বদলে গিয়েছে আমূল। তাঁদের আমলে ভাল বলতে বোঝাত নেসফিল্ড-এর গ্রামার গুলে খাওয়া ইংরেজির শিক্ষক, সুনীতিবাবুর হাতে তৈরি বাংলার শিক্ষক, অঙ্কের জটিল মারপ্যাঁচ জলের মতো বুঝিয়ে দিতে পারা অঙ্কের শিক্ষক। এখন ভাল শিক্ষক মানে পরীক্ষায় কে কত বেশি পাইয়ে দিতে পারল। শিক্ষার ধারণাটাই উল্টে গিয়েছে। জ্ঞান নয়, ডিগ্রি। বেশি নম্বর। ভাল চাকরি। কম্ফর্টেবল লাইফ। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ।

তা হলে ভাল শিক্ষক কারা? যে শিক্ষকের কোচিং থেকে বছর বছর জয়েন্টে চান্স পাচ্ছে, তিনি ভাল শিক্ষক। কিন্তু একই কোচিং থেকে বছর বছর চান্স পাওয়া কি সম্ভব? গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া করতে কেউ পারে? ধারাবাহিক ভাল ফল করিয়ে দেওয়া, ঘুরিয়ে বললে ভাল নম্বর পাইয়ে দেওয়া, আরও সরাসরি বলতে গেলে চান্স পাইয়ে দেওয়া, তা কি কেবলমাত্র ভাল পড়ানোর মধ্য দিয়েই সম্ভব?

তাহলে সিওর সাকসেস হতে গেলে আর কী কী প্রয়োজন?

বহু বছর শিক্ষকতায় থেকে সেই পেছনের রাস্তাগুলো তো তাঁর অজানা নয়? কীভাবে পরীক্ষার আগে সাজেশন পৌঁছে যায় বাছা বাছা পরীক্ষার্থীদের হাতে, সেই সাজেশনের কত শতাংশ প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়, প্রতিটি সাজেশনের জন্য কতখানি কাঞ্চনমূল্য হাত বদল হয়, নিজে জড়িয়ে না থেকেও তার আভাস কি বিমান পাননি? একজন সহকারী শিক্ষক কী মন্ত্রে শহরের কেন্দ্রস্থলে তিনতলা হর্ম্য নির্মাণ করেন, অথবা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি ব্যবহার করেন, তার রহস্য তো এখন সংবাদপত্রের প্রথম পাতায়।

অতএব, পরের এবং অবধারিত প্রশ্ন, কোচিং সেন্টার চালু করলে তিনি কতখানি পারবেন? যে দরজার ওপাশেই অবধারিত সাফল্য, তার চাবির সন্ধান কি তাঁর করায়ত্ত? যতখানি বিনিয়োগ করলে কোচিং সেন্টারের ছাত্রদের জন্য নিশ্চিত ভবিষ্যৎ তিনি ক্রয় করতে পারবেন, ততখানি মূলধন কি তাঁর আছে? শিক্ষাবাণিজ্যের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে পাটিগণিত-বীজগণিত-ত্রিকোণমিতিতে আবদ্ধ তাঁর মতো অঙ্কের শিক্ষক কতখানি প্রাসঙ্গিক?

নিজেকে চেনেন বিমান। ভেতরে ভেতরে ঘাড় নাড়লেন। না, পারবেন না। এই বয়েসে নিজেকে আমূল বদলে ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু সত্যি কথাটা সোজা করে বললে কি বুঝবে এরা?

তাই ঘুরিয়ে বললেন।

আমার মনে হয়, কোচিং সেন্টারও মোহনপুরের মতো জায়গায় ভাল চলবে না। এক তো ইঞ্জিনিয়ারিং-মেডিক্যাল-আইআইটি অ্যাসপিরান্ট অত ছেলে পাওয়াই যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, ওই সব সাবজেক্ট-এ ট্রেনিং দিতে পারার মতো ভাল টিচার পাওয়াও ওখানে কঠিন হবে।

কলকাতা থেকে যাবে।

যাবে, কিন্তু তাদের রেট হবে অত্যন্ত চড়া। যখন তখন কামাই করবে, ছেলেরা এসে ফিরে যাবে। ঝামেলা হবে। হয়তো সেন্টারে তালাই পড়ে যাবে।

আজকাল তো প্রিন্টেড টিচিং মেটিরিয়াল পাওয়া যায়, তাই না হয় দিয়ে দেওয়া হবে।

ব্রতর কথায় হাসলেন বিমান। ঠিকই, কিন্তু প্রিন্টেড মেটিরিয়াল নেবার জন্য কোচিং সেন্টারে যাবার দরকার কী? ঘরে বসে টাকা পাঠিয়ে কুরিয়ার সার্ভিসেই তো ও সব পেয়ে যাওয়া যায়। যত নামকরা টিউটোরিয়াল, কোথাও গিয়ে পড়তে হয় না, সব করেসপনডেন্স।

মুখ গম্ভীর করে বসে রইল ব্রত। মিত্রাও অধৈর্য হয়ে উঠছিল। রাত জড়ো হচ্ছিল চাঁদের গায়ে গাছের পাতায়, বারান্দার রেলিং-এ। সময় গড়িয়ে যাচ্ছিল নিঃশব্দে।

দীর্ঘশ্বাসের মতো মিত্রা বলল, তা হলে কি কোনও উপায়ই নেই দাদা?

বিমান ভাবছিলেন। বললেন, কয়েকবার তো মোহনপুরে যাওয়া আসা করলাম। কয়েকটা ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। কেউ কলেজে পড়ে, কেউ স্কুলে পড়ায়। ওদের কথাবার্তায় বোঝা যায়, যাতায়াতের ধকলটা ওদের বেশিটাই খেয়ে নিচ্ছে। অনেকেই কমপিটিটিভ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে চায়। তার জন্য

সময়ের প্রয়োজন। দরকার, গুছিয়ে বসে পড়াশুনা। মোহনপুরে থাকবার জায়গা নেই। একটা হোস্টেল বানালে কেমন হয়?

দারুণ হয় জ্যেঠু! ব্রত লাফিয়ে উঠল। আমার বন্ধুরাও অনেকে ভাল থাকবার জায়গা পেলে কত ভাল রেজাল্ট করতে পারত। হোস্টেল যদি ভাল হয়, খাওয়াদাওয়ার সুবন্দোবস্ত, রিজনেবল চার্জ, লোককে জায়গা দিতে পারা যাবে না, দেখে নিও।

হোস্টেল মানে মেস? খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা শুদ্ধু?

হ্যাঁ, মিত্রার মুখ থেকে মেঘ সরে যাচ্ছে দেখে বিমান বললেন।

ঠিক আছে, আইডিয়াটা খারাপ নয়।

অবাকই লাগে বিমানের। একটা স্কুল গড়তে যেখানে হিমসিম খেয়েছেন, সেখানে এখন কতগুলো স্কুল, দু'খানা কলেজ। একটা বিটি কলেজ। ভুল হল, বিএড কলেজ। তাঁদের আমলে বিটি বলত, মুখ দিয়ে সেটাই বেরিয়ে যায়।

খুঁজে খুঁজে পৌঁছলেন বিমান। কলেজের পাঁচিল যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই পুকুর ধারে বাড়ি। দোতলা, সামনে টিউবওয়েল, চারপাশে পেয়ারা-কদম-বাবলা গাছ। সংস্কারের অভাবে ঝোপজঙ্গল হয়ে রয়েছে।

রিকশাওয়ালা ভাড়া নিয়ে চলে গেল। ছুটির দিনে এসেছেন, বোর্ডারদের সঙ্গে কথা বলা যাবে। সুযোগ সুবিধা কী কী পাওয়া যায়, আরও কতটুকু পেলে ভাল হয়, সে সম্বন্ধে একটা ধারণাও মিলবে।

গেট বলতে কিছু নেই, তারের বেড়ায় একটুখানি ফাঁক, গলে ভেতরে ঢুকলেন বিমান। আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন। কাছে গিয়ে আওয়াজের উৎস নজরে পড়ল।

সামনেই একটা ঘর। বেশ বড়, ষোলো বাই কুড়ি তো নিশ্চয়। মাঝখানে ক্যারাম বোর্ড, একপাশে টেবিলের ওপর, একটু উঁচুতে টিভি। টিভি চলছে না, চলছে একটা মিউজিক সিস্টেম। আজকাল মাইক বাজলেই এই গানটা শোনা যায়। গানের তালে তালে নাচ।

গান, নাচ, মিউজিক সিস্টেম। মেনে নিতে বিমানের আপত্তি ছিল না। বিমান শকড হলেন ওদের পোশাক দেখে। ঊর্ধ্বাঙ্গ সকলেরই উন্মুক্ত, তাও ঠিক আছে। কিন্তু নীচে? দু'জন শর্টস, তারাই সবচেয়ে ডিসেন্ট। বাকিদের পরনে জাঙ্গিয়া। নাচের তালে তালে চলছে পেলভিক থ্রাস্ট, এবং তার জ্যামিতি একটি প্রক্রিয়াকেই স্মরণ করায়।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বিমান, এক শিল্পীর নজর পড়ল তাঁর ওপর।

আরে! এটা কোত্থেকে এল?

স্খলিত স্বর, টলমল পদক্ষেপ। ঘরের ভেতরে দেখলেন, কয়েকটা খালি বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কী ব্যাপার দাদা? এখানে কী?

দাদা কী রে? দাদু! পাকা চুল দেখতে পাচ্ছিস না? চোখে কী...গুঁজে আছিস?

অক্লেশে পুরুষাঙ্গের প্রতিশব্দ উচ্চারণ করল ছেলেটি, যে তাঁর নাতি হলেও হতে পারত।

কী বে? কী দেখতে এসেছিস? খোচর টোচর নয় তো? বিজয় পাল পাঠিয়েছে? চল মালটাকে ওপরে নিয়ে তোল। চারআনা পালিশ করলেই বেরিয়ে আসবে।

বিমানের শিক্ষা জ্ঞান বুদ্ধি এবং আক্কেল বিমানকে বলল, এক মুহূর্তও এখানে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। হনহন করে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ধাওয়া করে এল এক উচ্চকিত হাসির রোল।

বিজয় পাল। নামটা শুনেছেন। রিক্সাওয়ালা বলছিল। বাড়িটাও দেখিয়েছিল আসবার সময়। গুটিগুটি গিয়ে কড়া নাড়লেন।

কে?

খালি গা, লুঙ্গি, টাক, চশমা, ভদ্রলোককে দেখে বিমানের মনে হল ইনিই বিজয় পাল।

আমাকে আপনি চিনবেন না। আমরা মোহনপুরের পুরনো বাসিন্দা, রেললাইনের গায়ে আমাদের বাড়ি। আপনিই বিজয়বাবু?

হ্যাঁ। কিন্তু...

কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দু'য়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল।

কথা? আমাকে? ঠিক আছে, আসুন ভেতরে।

বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসতে দিলেন বিজয়। প্রশ্ন তাঁর চোখে-মুখে।

বিমান ভাঙলেন, আপনার মেসবাড়ি নিয়ে দু'-একটা প্রশ্ন ছিল। আপনিই তো বানিয়েছেন মেস?

কেন বলুন তো? মেস-এ কারওকে রাখবেন?

না। আমাদের একটা বাড়ি আছে। কেউ থাকে না। ওখানে মেস করার কথা ভাবছি।

ভুলেও ও রাস্তায় পা বাড়াবেন না।

কেন?

কেন? যান না, নিজে গিয়ে দেখে আসুন, বুঝতে পারবেন। জানোয়ার মশাই, জানোয়ার। এরা ভদ্রলোকের ছেলে? প্রথমে আটটা ছেলেকে ঘর ভাড়া দিয়েছিলাম। মাসে দুশ টাকা। দেড় বছর হয়ে গেল একটা টাকা ঠেকায় না কেউ। দেওয়াল ভেঙে পড়ছে। বলে, সারিয়ে দিতে হবে। টাকা চাইতে গেলে অকথ্য খিস্তি করে। থানায় কমপ্লেন করেছিলাম, আমার মেয়ের কলেজে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাড়ার লোকেরা টিকতে পারে না ওদের জ্বালায়। চেষ্টা করছি কারওকে বিক্রি করে যদি রেহাই পাওয়া যায়। স্থানীয় কেউ কিনবে বলে মনে হয় না।

বিমান অর্দ্ধেকটা জেনেই এসেছিলেন। বাকিটা মিলিয়ে নিচ্ছিলেন। বিজয় পালকে তাঁর কাছের মানুষ মনে হচ্ছিল। অথচ সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কীই বা করার আছে?

ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলেন বিমান।

৯

আজকাল হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। সাতটার আগে বিছানা ছাড়তেন না কোনও দিন। প্রত্যুষ অপরিচিত ছিল সেই কারণেই। দেখতে দেখতে এখন চেনা হয়ে গেছে।

দিন শুরু হবার ঘটনাপঞ্জীর একটা ক্রম আছে। প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক এই রকম। ইদানীং ঘুম ভাঙলে নাটকের কোন অঙ্কের কততম দৃশ্যে আছেন, সেটাও আন্দাজ করতে পারেন বিমান।

আকাশের নিকষ কালো রং ফিকে হওয়া এবং নিশাচর নক্ষত্র সমূহের লুকিয়ে পড়ায় দৃশ্যের সূচনা। এর পরেই শুরু হয়ে যায় পাখির ডাক। একটি পাখি শুরু করে। আওয়াজে আরও দু'চারজনের ঘুম ভাঙে। তারাও তারস্বরে ডাকতে থাকে। শুরু হয় কনসার্ট। কে কত জোরে ডাকতে পারে তার প্রতিযোগিতা। পুব আকাশে ততক্ষণে নীলচে রং ফুটে বেরতে শুরু করেছে। মেঘ থাকলে অবশ্য লাল রংয়ের প্রাধান্য। দিনমণির উদয় আপাতনিঃশব্দ কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উদয়ের মুহূর্তটিতে তিনি রক্তিম। নরম মিষ্টি

লাল। রক্তিমাভা ছড়িয়ে যেতে থাকে মেঘ হতে মেঘান্তরে, গাছের পাতায়, ফিঙের ল্যাজে, ঘুমভাঙা মানুষের মুগ্ধ চোখের তারায়। সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই পাখিরা একটু একটু করে কলরব থামিয়ে দেয়। ততক্ষণে প্রথম আলোর জায়গা নিয়েছে রোদ্দুর, যার রং হলুদ। দিন শুরুর ঘোষণা করে পাখিরা বেরিয়ে পড়ে যে যার কাজে।

শুয়ে শুয়ে পুরোটাই দেখতে পান বিমান, তাঁর মেজানাইন ফ্লোরের ঘরের চারিদিক উন্মুক্ত। সূর্যোদয় যেমন, সূর্যাস্তও তেমনি দৃশ্যমান। ভেতরে সূর্যাস্ত নিয়ত অনুভব করেন বলেই সূর্যোদয়ের প্রতি আসক্তি দিন দিন বাড়ছে।

দিন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু দৃশ্যান্তর চোখের সামনে ঘটে যেতে থাকে। স্বাস্থ্যসন্ধানী মানুষেরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েন। তাঁদের কলতান দু'পাশের বাড়ির দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়। বেঁচে থাকা ও আরও বেঁচে থাকার ইচ্ছা ঘোষণা করতে করতে এঁরা প্রাতঃভ্রমণে বের হন। বিমান ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকেন। ভয় হয়, কোনদিন তাঁকেও এঁরা দলবন্দি করে ফেলবেন। বৃদ্ধ হয়ে যাবেন বিমান।

আসে ফুলচোররাও। আঁকশি হাতে চুপিচুপি পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে নির্দয় হাতে ফুল ছিঁড়ে নিরাভরণ বৃক্ষ-পল্লবকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দেয়। গাছের এক দিক ফুলভারে আনত থাকে, সেটা ভেতরের দিক। অন্য পাশটা নিপুষ্প খাঁ খাঁ করে।

আগে নন্দিতা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকত। আঁকশি এগুলেই পাঁচিলের ধার থেকে পড়ত লাঠির বাড়ি। ঝগড়াঝাঁটি থেকে ইঁট ছোড়াছুড়ি অবধি গড়িয়েছে। খুব আমার আমার ছিল নন্দিতার। আমার গাছ, আমার ফুল। ইদানীং নন্দিতাও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

এই সময় কান পেতে শোনার চেষ্টা করেন বিমান। নীচে কোনও আওয়াজ? বাথরুমে জল পড়ার শব্দ? ঠাকুরঘরে ঠুকঠাক? রান্নাঘরে বাসনকোসনের ঠোকাঠুকি?

নন্দিতা ওঠেনি নিশ্চিত হলে, সন্তর্পণে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামেন বিমান। বাথরুমে ঢুকে হালকা হন। মুখ হাত ধুয়ে আর এক বার দেখে নেন। ভেতরের ঘর বন্ধ। দাড়িটাও কামিয়ে নেন। কখনও টাইমের গড়বড় হয়ে যায়। দরজা খুলে বেজার মুখে বেরিয়ে আসে নন্দিতা। আয়নার সামনে তাঁকে দেখে আবার ঘরে ঢুকে যায়। ক্ষুর হাতে সামান্য ইতস্তত করেন বিমান। দু'একটা টানে বাকি কাজটুকু সেরে মুখ মুছে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। শান্তি এবং সহাবস্থানের পূর্বশর্তই হল, সংঘাত এড়িয়ে চলা। আর সংঘাত এড়ানোর সহজ পন্থা মুখোমুখি না হওয়া। সাধ্যমতো সেটাই তিন চার বছর ধরে করে আসছেন। নন্দিতাও কো-অপারেট করছে।

রাত্তিরে ফ্লাস্ক-এ চা ভর্তি করে ওপরে ওঠেন। কৌটোয় বিস্কুট থাকে। এই সময় দু'টো বিস্কুট মুখে দিয়ে চায়ে ঠোঁট ডোবান। দু'খানা কাপডিশও কিনে রেখেছেন, সময়মতো ধুয়ে তুলে রাখেন।

ততক্ষণে বাইরের দৃশ্যের বদল হয়েছে, পথচলতি মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। ইউনিফর্ম পরা ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের হাত ধরে স্কুলে যাচ্ছে। তাঁদের সময়ে ইউনিফর্ম-এর চল ছিল না। দ্বিতীয় পরিবর্তনটা আরও লক্ষণীয়। বাবা-মা। বাচ্চা স্কুলে যাবে, মাকে সঙ্গে যেতে হবে। যতক্ষণ স্কুল চলবে, টিফিনবাক্স জলের বোতল হাতে মায়েরা বাইরে বসে আঁচলের হাওয়া খাবে। অবশ্য এখন ঝিনুকবাটি ছাড়ার বয়েসেই বাচ্চারা স্কুলে যেতে শুরু করে।

কাগজ দেয় যে ছেলেটা সেও এই সময়েই আসে। অব্যর্থ টিপ। কাগজটা রোল করে ছুড়ে দেয়। কারও বারান্দায় কারও ব্যালকনিতে, কখনও জানলার গ্রিল গলিয়ে ঘরে। দু'খানা কাগজ নেন বিমানরা। নন্দিতার কাগজ নীচে। তাঁরটা ওপরের ব্যালকনিতে। ভুল করে না। ঠিক পাঠিয়ে দেয়।

কাগজটা তুলে আনতে আনতে ঘরের ভেতর চোখ বুলিয়ে নেন বিমান। হ্যাঙারে দু'খানা পাঞ্জাবি ঝুলছে। যেটা এক সপ্তাহ ধরে টানা ব্যবহার করছেন, সেটার অবস্থা সঙ্গিন। আজ না কাচলেই নয়। পকেট থেকে রুমাল, চিরুনি খুচরো পয়সা, লাইটার বের করে পাঞ্জাবিটা দলা পাকিয়ে একপাশে রাখলেন। ঘরের মধ্যে দড়ি টাঙিয়ে নিয়েছেন। গেঞ্জি, রুমাল আর আন্ডারওয়ারও কাচার জন্য আলাদা করে রাখলেন।

নীচে তিনখানা ঘর। একটা নন্দিতার, পুব-দক্ষিণের সবচেয়ে ভাল ঘরখানা। অন্য দু'টো অপু আর তপুর। টাকা তিনিও দিয়েছেন, সাধ্যমতো। মেজানাইনটুক তাঁর জন্য বরাদ্দ হবার মতো। কিন্তু বাড়ি তৈরিতে তাঁর শ্রম কানাকড়িও আছে বললে ডাহা মিথ্যে বলা হবে। এ বাড়ি নন্দিতার।

ঠিক কী কারণে বিমান গা লাগাননি? উত্তরটা বিমানের নিজের কাছেও পরিষ্কার নয়। দেখি তো ও একা পারে কি না? পেরে দেখিয়ে দিয়েছে নন্দিতা।

কাগজের পাতায় মন দিতে চেষ্টা করে বিমান দেখলেন, পারছেন না। কাগজে আছেটাই বা কী? কিছু নেতার ছবি ও বাণী, কয়েকটা ডাকাতি ও ধর্ষণ,

শেয়ার বাজার। খেলাটা পেছনের পাতায়, ছিটকে যেতে যেতেও থেকে গিয়েছে, সেটাতেই চোখ বুলোন।

আজ ইচ্ছে করল না। দেওয়ালে খোপ করে তাক বানিয়ে নিয়েছেন। একটা তাকে টুথব্রাশ-পেস্ট-দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম-সাবান। নীচের তাকে ডাঁই করা পুরনো খবরের কাগজ। সেখানেই গুঁজে দিলেন। তারপর কান খাড়া করলেন।

না, সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে নন্দিতা জামা-কাপড় বদলাতে শোবার ঘরে ঢুকেছে। একটু পরে গ্রিলের তালা খোলার শব্দ পাওয়া যাবে। তখন চেয়ারটা চেনে সামনে নিয়ে বসবেন বিমান। পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে সামনের রাস্তা হয়ে হেঁটে যেতে হয় নন্দিতাকে। অধিকাংশ দিনই ছাতায় মুখ মাথা আড়াল করা থাকে। দৈবাৎ ছাতা সরিয়ে এক ঝলক ওপরে তাকায় নন্দিতা। বিমানের চোখে চোখ পড়ে। বিমান রোজই খোঁজার চেষ্টা করেন। নিরাশ হন। নন্দিতার চোখে ভাষা নেই। ধিক্কার, ভৎর্সনা, অনুযোগ, তিরস্কার কিছুই নেই।

পাঁউরুটি সেঁকে জ্যাম লাগাতে লাগাতে বিমান ভাবছিলেন। দশ বছর আগেও নন্দিতার গলায় প্রবল স্বর ছিল। ছিল তীব্র বিরাগ, কলহের উৎসারিত কলরোল, ছিল অভিমান-কান্না-অভিশাপের ধারাবর্ষণ। তখন অসহ্য লাগত। মনে হত, নন্দিতার সমস্ত অস্তিত্ব যেন ওর স্বরযন্ত্রে এসে বাসা বেঁধেছে।

কোনও দুর্ঘটনা নয়, আরোপিত অনুশাসনও নয়। সময়। নন্দিতা নিজেই নিজের কণ্ঠ প্রত্যাহার করে নিল। প্রত্যাহার করে নিল সমস্ত অভিযোগও। প্রয়োজনের জন্য যেটুকু কথা, না বললেই নয়—গ্যাস ফুরিয়ে গিয়েছে, কাল আনতে হবে; পশ্চিমের জানলার পাল্লা আলগা হয়ে গেছে, ঝড়বৃষ্টি এলে ঘরে জল ঢুকবে; রান্নাঘরের লাইনটা শর্ট হয়ে গেছে, ইলেকট্রিকের মিস্তিরিকে খবর দিতে হবে: স্বগতোক্তির ধাঁচে উচ্চারণ করে নন্দিতা। বিমান শোনেন কি না সেটুকুও জেনে নেবার দরকার মনে করে না। কাজটা হয়ে গেলে বিমানকে ধন্যবাদও জানায় না। এইভাবেই একটা অলিখিত চুক্তির ভিত্তিতে নন্দিতা ও বিমান, আইনত স্বামী-স্ত্রী, একই বাড়িতে সহাবস্থান করেন। বিমানের হাত থেমে গিয়েছিল। ফ্রিজ-এ উঁকি মেরে দেখলেন। দু'টো মাত্র ডিম আছে। ডিম এনে রাখতে হবে। আনাজপাতিও শেষ। ছোটবেলায় মাছ মাংসে প্রবল আসক্তি ছিল। এখন ক্রমশ নিরামিষভোজী হয়ে যাচ্ছেন।

জ্যাম লাগানো টোস্টে কামড় বসালেন। দু'কাপ চা বানিয়ে নিয়েছেন। চা-টা ভাল। ট্রাস্টফুল টি কোং, কখনও ঠকায়নি বিমানকে।

আচ্ছা, সেই কলহমুখর দিনগুলোকে কি মিস করেন বিমান? ফিরতে দেরি হলে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করা। স্কুলের দিন সকালে একরাশ ট্যাংরা মাছ এনে হাজির করায় মাছ শুদ্ধ প্লাস্টিকের প্যাকেট তাঁর মুখে ছুড়ে মারা। একা পার্বতী কাজ করছিল, খালি গায়ে লুঙ্গি পরে পা তুলে বসে কাগজ পড়ছিলেন বিমান, দেখে পার্বতীকে পত্রপাঠ বিদায় করে তাঁর মাথায় গরম জল ঢেলে দেওয়া। সত্যিই কি সেই দিনগুলো খুব আনন্দে কেটেছিল বিমানের?

দাঁড়িপাল্লার এক দিকে ফেলে আসা দিনগুলোকে চাপিয়ে অন্য পাশে শীতল প্রশ্নহীন পাথরের মতো এক সম্পর্ককে তুলে দেন বিমান। ওজন করেন। করতেই থাকেন। অনন্ত সকাল দুপুর হয়ে বিকেলে গড়িয়ে যায়।

আজ গ্যাস বুক করতে হবে। হরনাম সিংয়ের গ্যাসের দোকানে গিয়ে দেখলেন ফাঁকা, লাইন নেই। নাম লেখে যে ছেলেটা সে বলল, অনেকদিন পর এলেন মেসোমশাই।

আজ যে ফাঁকা ফাঁকা, কী ব্যাপার?

গ্যাস নিয়ে মারপিট আর নেই এখন। চাই বললেই গ্যাসের কানেকশন, সিলিন্ডার খালি হলে দশটা কোম্পানি দাঁড়িয়ে যাবে সাপ্লাই করার জন্য।

ফেরার পথে ছ'খানা ডিম নিলেন। টুথপেস্টটা শেষ হয়ে এসেছে, কিনলেন প্রয়োজনী থেকে। ব্যাঙ্ক-এ খোঁজ নিলেন, পেনশনের টাকা পৌঁছেছে কি না।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে সাইকেলের গতি ধীর হয় বিমানের। ঠিকই বলেছে ছেলেটা, যখন অলটারনেটিভ থাকে না, তখনই মারপিট। এখন ফ্রি মার্কেট, বাজারও বরফের মতো শীতল।

সাইকেলটা তুলতে গিয়ে মনে পড়ল, বিকাশ তপুর বন্ধু, ভাল প্র্যাকটিস করছে, দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

মেসোমশাই, আপনি সাইকেল চালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

কেন? অন্যায় করছি?

আলবত অন্যায় করছেন। গত বছর প্রেশার বেড়ে কী হয়েছিল খেয়াল নেই? ওষুধ খাচ্ছেন নিয়ম করে?

একটাই ওষুধ। নিয়ম করে খান। তবে ফুরিয়ে গেলে দু'য়েকদিন মিস হয়ে যায়। ফুরিয়ে গেছে, মনে ছিল না। রোদের মধ্যে আবার সাইকেল ঘুরিয়ে যেতে ইচ্ছে করল না। থাক, সন্ধেবেলা কিনে আনবেন।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখলেন একটা চিঠি, পোস্টম্যান ফেলে গেছে।

তাঁর নয়, নন্দিতার নাম লেখা, বন্ধ খাম। টিভির সামনে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রেখে দিলেন।

নন্দিতার চিঠি। তাঁর কি কোনও কৌতূহল হচ্ছে? কে লিখল? কী লেখা আছে বন্ধ পাতার ও পাশে? নিজেকে পড়তে পারেন বিমান। না। তাঁরও নন্দিতা সম্বন্ধে আর কোনও আগ্রহ নেই।

১০

সহকর্মী অনিলেন্দু, ছেলেকে নরেন্দ্রপুরে ভর্তি করেছিল, এক বার এসেও ছিলেন। আশ্রমিক পরিবেশ, ভাল লেগেছিল। মনে আছে বাউন্ডারির পর থেকেই ছিল ফাঁকা মাঠ আর জঙ্গল।

এবারে এসে অবাক হয়ে গেলেন।

মিশন পার হয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে বাস থেকে নামলেন। আশপাশে তাকিয়ে মনে হল, এও তো কলকাতা! একটা রাস্তা ডানদিকে ঘুরেছে। গাছগাছালি পুকুর ভেদ করে চলমান সেই রাস্তাও পিচের, পরিভাষায় মোটরেবল। পাখির ডাক, পুকুরে পানকৌড়ি ছাড়িয়ে একটা জায়গায় পৌঁছলেন, যেখানে রাস্তাটা দু'ভাগ। ইতস্তত করছেন, একজন পথচলতি মানুষ আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন?

বিমান বলতে যাচ্ছিলেন, পিন্টু বলল, রথতলা হাইস্কুলটা কোথায় বলতে পারেন?

ঢোঁক গিললেন বিমান। কোথায় কতটুকু বলতে হবে অথবা কী গোপন করতে হবে, এখনও রপ্ত হয়নি বিমানের। পিন্টু যখন সত্যিটা চেপে গেল, তখন সেটার প্রয়োজন আছে। তাঁরই ভুল হচ্ছিল।

দশ পা এগোতেই স্কুল, এবং স্কুলের সামনেই শান্তিনিবাস।

হোস্টেল তৈরির কল্পনা, তার নির্মাণ ও ধ্বংস কোনওটারই সাক্ষী ছিল না পিন্টু। তাই পিন্টু যখন ফোনে বলল, দারুণ একটা আইডিয়া এসেছে দাদা, রোববার ফাঁকা আছ, প্রথমে ভেবেছিলেন বলে দেন, না ফাঁকা নেই। গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়া বার্নারের মতো কোনও মতে শিখাটাকে উস্কে বলেছিলেন, মিত্রা আছে? ওকে দে।

মিত্রা ফোন-এ এসেছিল।

কী ব্যাপার? আবার মাথায় ভূত?

ভূত নয় দাদা। সত্যিই এটার ভবিষ্যৎ আছে।

কী রকম?

আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়, তার বিয়ে হয়েছে যে বাড়িতে, সেখানে ছেলে-মেয়েরা বিদেশে থাকে, বাবা-মাকে রেখে দিয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে। শুনে থেকে আপনার ভাই লাফাচ্ছে, বৃদ্ধাশ্রম করবে। ঠিকানা, ডিরেকশন সব নিয়েছে। মালিকের ফোননম্বরও জোগাড় করেছে। আপনি রাজি থাকলে কথা বলে দিন ঠিক করবে।

মালিক রাজি হবে?

আপনারাও বৃদ্ধাশ্রম করতে চান বললে দেখতে দেবে কেন? বলবেন, বৃদ্ধা বাবা বা মা, তাঁকে রাখব, জায়গাটা দেখতে চাই। সেই সুযোগে পুরোটাই যাচাই করে আসবেন। লাভ লোকসানের ব্যাপারটাও।

বিমানের মনে হল, আইডিয়াটায় বস্তু আছে। এতদিনে পিন্টু একটা কাজের কাজ করেছে। ওকে যতখানি অপদার্থ ভাবা হয় ততখানি হয়তো নয়। কিছু না হোক, গিয়ে দেখতে ক্ষতি কী?

ঠিক আছে, বলে দাও আমি যাব। শুক্রবার ফোন করে যেন জানিয়ে দেয়, কোথায় মিট করব, কীভাবে যাব।

বৃদ্ধাশ্রমের গেটের কাছে এসে মনে পড়ে গেল বিমানের।

মালিককে ফোন করেছিলি? পারমিশন নিয়েছিস?

হ্যাঁ। ভদ্রলোক ভাল। নিজে থেকেই বললেন, আসুন না, দেখে যান আমাদের বৃদ্ধাবাস। পছন্দ হলে টাকা পয়সার ব্যাপারে কথা বলা যাবে। তবে রবিবার আমি থাকব না। বিকাশ আমাদের কেয়ারটেকার, ও থাকবে। বলে রাখব। কোনও অসুবিধা হবে না।

ক'টায় আসব কোনও কথা হয়েছে?

সাড়ে ন'টা দশটা।

তা হলে চল, ঢুকে পড়া যাক।

লোহার গেট, খোলা। ভেতরে ঢুকে চোখ জুড়িয়ে গেল বিমানের। বলে উঠলেন, বাঃ।

পিন্টুর চোখেও মুগ্ধতা।

গেট পার হয়ে পুকুর, বাঁধানো ঘাট। আমগাছ, গাছের ছায়ায় সিমেন্টের বেঞ্চ। মোরাম ঢাকা রাস্তা ঘুরে শেষ হয়েছে দোতলা বাড়িতে। রাস্তার দু'ধারে

বাগান। এক পাশে তরিতরকারি আনাজপাতির কিচেন গার্ডেন। অন্য পাশে ফুল গাছ। শীতকালে গোলাপ ফোটে, লক্ষণ চতুর্দিকে ছড়ানো।

রাস্তা যেখানে শেষ, তার ডানপাশে ছোট মন্দির। মন্দিরে শিবের মূর্তি। ভেতরটা শ্বেতপাথরে বাঁধানো। সিঁড়ির মাথায় ঘণ্টা। পুজো হয়েছে সকালেই। ঠাকুরের পায়ের কাছে জড়ো করা ফুল। ধূপদানিতে ধূপ, এখনও গন্ধ। এক বৃদ্ধা একমনে মালা গাঁথছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন।

কাকে খুঁজছেন?

বিকাশবাবু, এখানকার কেয়ারটেকার...

বিকাশ তো বাজারে গেছে। আপনাদের কি আসার কথা ছিল?

হ্যাঁ, মিস্টার সমাদ্দারকে ফোন করেছিলাম। উনি বললেন, বিকাশবাবুকে বলা থাকবে।

কখন আসবেন কথা হয়েছিল?

এই রকম, সাড়ে ন'টা দশটায়।

তা হলে বিকাশ জানে। বিকাশ বাজারে গেলে আমরাও যার যা প্রয়োজন, লিস্ট ধরিয়ে দিই। চিন্তা নেই, অফিসে বসুন। এখুনি এসে পড়বে।

কথাবার্তার মধ্যে পনেরো-ষোলো বছরের এক কিশোর এগিয়ে এসেছিল। বৃদ্ধা ডাকলেন।

পীরু! এঁরা এসেছেন বিকাশের সঙ্গে দেখা করতে। বলা আছে। অফিস ঘরে নিয়ে বসা। ফ্যানটা ছেড়ে দিস। কারেন্ট আছে তো?

ঘাড় নেড়ে পীরু তাঁদের নিয়ে চলল। একটা ঘরের তালা খুলে ফ্যান চালিয়ে বসতে বলে, চলে গেল।

ছোট ঘর। এক পাশে বিছানা পাতা। একখানা আলমারি আর ওয়ারড্রোবও রয়েছে। ফোল্ডিং টেবিল, তিন চারখানা চেয়ার। দু'টোতে বসেছেন দু'জনে। দেয়াল ফুটিয়ে তাক, কাচ ঢাকা। সেখানে কয়েকটা ফোল্ডার, ফাইল। মুখোমুখি একটা ছবি, দূর থেকে তোলা, বৃদ্ধাশ্রমের। নীচে বড় করে লেখা 'শান্তিনিবাস'।

পিন্টুই প্রথম কথা বলল, বেশ সুন্দর কী বলো?

কতখানি জায়গা দেখেছিস ভেতরে?

বেশিটাই ফালতু নষ্ট হয়েছে। পুকুর-ঘাট-বাগানের কী প্রয়োজন ছিল? লোকজন থাকতে এসেছে, ব্যাস। সেটুকুই তো যথেষ্ট? বিমানের কিন্তু ভাল লাগছিল, মনে হচ্ছিল একটা টলটলে পুকুর, পাতায় ছাওয়া আমগাছ, ফুলে

ভরা গোলাপবাগান সবার ভেতরেই থাকে। অতীতে থাকে, বর্তমানে ঘুমিয়ে থাকে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন হয়ে থাকে। কেউ যদি স্বপ্নটাকে বের করে সামনে এনে হাজির করে বলে, মিলিয়ে নাও, তা হলে যতখানি বিস্ময় মিশে থাকে, আনন্দ তার চেয়ে কম থাকে না। তৃষিতের মতো বাইরে তাকিয়ে বসে রইলেন বিমান।

বারান্দা দিয়ে অনেকে হেঁটে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে আবাসের কর্মচারী যেমন ছিল, তেমনি ছিলেন আবাসিক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারাও। বৃদ্ধ একজনকেই দেখা গেল। বৃদ্ধাই বেশি। সালোয়ার কামিজপরা একজন শ্যামলী শ্যামলী বলে ডাকতে ডাকতে লঘু পদক্ষেপে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে হেঁটে গেলেন। তাঁর পদক্ষেপ ও কণ্ঠস্বরে অষ্টাদশী কিশোরীর চাপল্য। বিমানের অদ্ভুত লাগছিল। অন্য রকম।

আপনারা?

দেখেই বুঝতে পারলেন—বিকাশ।

আমরা মিস্টার সমাদ্দারকে ফোন করেছিলাম। উনি আসতে বলেছিলেন। আপনাকে কিছু বলেননি?

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কাজে কাজে ভুলে গিয়েছিলাম। কী যেন দরকার আপনাদের? এই অবধি এসে বিমান থেমে যান। এত বছর সংসার ধর্ম পালন করেও স্বচ্ছন্দ মিথ্যাভাষণ সহজে আয়ত্ত করতে পারেননি। জিভ জড়িয়ে যায়।

পিন্টু এ সব ব্যাপারে অনেক দড়। গড়গড় করে আউড়ে গেল।

আমরা দুই ভাই। উনি বড়। আমাদের মা, বিরাশি বছর বয়েস। একা থাকেন। ভাইয়েরা দূরে দূরে থাকি, মা কারও কাছে গিয়েই থাকতে চান না। তাই দু'জনে মিলে ঠিক করলাম, কোনও বৃদ্ধাবাসে রেখে দেব। তাই ভাবলাম...

খুব ভাল করেছেন। আজকাল ছেলেমেয়েরা কাজেকর্মে দূরে থাকে। আলাদা সংসার। বাবা-মাকে কাছে নেওয়া সম্ভব নয়। তাঁরাও থাকতে চান না। আবার বয়েস হয়েছে। অসুখ বিসুখ লেগেই থাকে। একা ফেলে রাখা যায় না। সব দিক চিন্তা করলে বৃদ্ধাবাসই একমাত্র জায়গা যেখানে সবকিছু একসঙ্গে পাওয়া যাবে।

আপনাদের এই হোম সম্বন্ধে অনেক শুনে এসেছি।

নিশ্চয়ই শুনবেন। এসেছেন যখন দেখেও যাবেন। এখানকার ব্যবস্থা এত ভাল, পরিবেশ এত চমৎকার, একবার এলে কেউ যেতে চান না। বাইশ নম্বরে মিস্টার সান্যাল আছেন, ছেলে মস্ত অফিসার। রোজ সাধাসাধি। কিছুতেই গেলেন না ভদ্রলোক। মুখের ওপর বলে দিলেন, এই বেশ আছি।

কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন তিনজনে।

বারান্দায় দাঁড়ালেই সোজাসুজি বাগান, রাস্তা, পুকুর, আমগাছ।

সিজন-এ এলে দেখতেন গাছ ভর্তি আম।

কী জাতের আম?

বলা মুস্কিল, তবে পাকলে স্বাদ হয় না। তাই কাঁচা আমের অম্বল করা হয়। আচারও বানানো হয়েছে। কালবৈশাখিতে আম ঝরে পড়ে দেদার। আম কুড়োবার সে কী ধুম?

পিন্টু বাগানের দিকে দেখল।

আগাছায় ভরে গেছে। পরিষ্কার করান না?

বর্ষায় আগাছা জন্মায়। এবারে মালি লাগানো হবে। মাটি কুপিয়ে গোলাপ চারা বসানো হবে। গত বছর এত গোলাপ ফুটেছিল, ভিজিটররা অবধি খোঁজ নিতেন, কোথায় পাওয়া যায়।

বিমান এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। বললেন, পুকুরসুদ্ধু জায়গাটা কিনেছিলেন আপনাদের মালিক?

হ্যাঁ, ওনার অনেক রকম শখ। পুকুরে পোনা ছাড়া হয়েছে। সামনের সিজনে এই সাইজের হয়ে যাবে। নিজেরাই বংশবৃদ্ধি করবে। মাছ ধরাও হয়। মাঝে মাঝে। বাবু নিজে আসেন, চার ফেলে মাছে ধরেন ছিপে। তবে মাছ ধরলেও জলে ছেড়ে দেন। অনেক মাছ হলে এই মাছই হয়তো বোর্ডারদের খাওয়ানো হবে।

মন্দিরের আইডিয়াটাও কি মালিকের?

মন্দির হবে ভেবেছিলেন উনি। কী ঠাকুর বসবে, শিব না কালী, তাই নিয়ে তর্ক উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল কালীপুজোয় অনেক হ্যাপা, মা কালী অসন্তুষ্ট হলে বিপদের শেষ নেই। শিবঠাকুর বেলপাতাতেই সন্তুষ্ট। তা ছাড়া এখানে বৃদ্ধার সংখ্যা বেশি। অনেকেই শিবের উপোস করেন। তাঁরাও শিব পেয়ে খুশি।

বারান্দা ধরে হাঁটছিলেন তিনজনে। সামনে বিকাশ, পেছনে পিন্টু, মাঝখানে বিমান। সারি সারি ঘর। বেশিরভাগই বন্ধ। কোনওটার দরজা খোলা। তবে ভারী পর্দা ঝুলছে। গানের আওয়াজ আসছে কোনও ঘরের ভেতর থেকে। কান পেতে শুনে বিমান বুঝতে পারলেন, সবই রেডিও বা ক্যাসেটের আওয়াজ নয়।

গান? বৃদ্ধাবাসে?

প্রশ্নটা নিজেকেই করেছিলেন বিমান। উত্তরও নিজেই দিলেন।

কেন নয়?

এইটা খাবার ঘর। কমিউনিটি হলও বলতে পারেন।

ঘরটা যথেষ্ট বড়। একপাশে কালার টিভি, সামনে দু'টো সোফা আড়াআড়ি পাতা। অন্য দিকে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দেওয়াল ঘেঁষে তিনটে খাবার টেবিল। পাশে চারটে করে চেয়ার।

সোফায় দুই বৃদ্ধ বসে টিভির প্রোগ্রাম দেখছিলেন। সম্ভ্রান্ত চেহারা, পরনে ড্রেসিং গাউন। একেবারে পাহাড়ী সান্যাল। বিমানদেরও লক্ষ করেছিলেন দু'জনে। আগ্রহ দেখালেন না। এই পরিশীলিত উপেক্ষাও সমাজের ওপরতলার বাসিন্দাদের চরিত্র লক্ষণ।

টিভিতে সব আসে?

পিন্টুর প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করলেন বিকাশ। নিজের মতো করে উত্তর দিলেন, কেব্‌ল কানেকশন আছে। সত্তর-বাহাত্তরটা চ্যানেল আসে। রাত এগারোটা অবধি লাইট জ্বলে। তারপর আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। ঘরের টিভিগুলোয় অবশ্য কেব্‌ল কানেকশন নেই।

ঘরের টিভি মানে?

প্রত্যেক ঘরে টিভি আছে। সাদা কালো, সেখানে কেব্‌ল কানেকশন দেওয়া যায়নি।

এ তো দারুণ বন্দোবস্ত!

বিমানের উচ্ছ্বাস পিন্টুকে স্পর্শ করল বলে মনে হল না। মেপে মেপে কথা বলছিল পিন্টু। খুঁটিয়ে সব জেনে নিতে চাইছিল।

খাওয়া দাওয়ার সময় সকলকেই কমিউনিটি হল-এ আসতে হয়?

বাধ্যবাধকতা নেই। সুস্থ থাকলে সকলেই সন্ধ্যাবেলা জড়ো হন। গল্পগুজব হয়। গানটানও করেন কেউ কেউ। ভাল প্রোগ্রাম থাকলে টিভি চালানো হয়। কোন প্রোগ্রাম দেখা হবে, তাই নিয়ে গোলমালও বেধে যায় মাঝে মাঝে। আমাদেরই মেটাতে হয়।

ঘরে খাবার পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আছে?

হ্যাঁ, কারও শরীর খারাপ করলে, বা নীচে নামতে ইচ্ছা না হলে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়।

তার জন্য আলাদা কোনও চার্জ? সতর্ক ভঙ্গিতে জানতে চাইল পিন্টু।

আমরা চার্জ করি না। তবে কর্মচারীদের ইনমেটেরা কিছু দেন। আমরা না বলি না।

যার সামর্থ্য বেশি সে তো বেশি দেবেই।

কিছু করার নেই।

পাশেই কিচেন। মেঝেতে উবু হয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল একটা ছেলে। অন্য একজন বেসিনে মাংস ধুচ্ছিল।

আজ মাংস।

প্রতি রবিবার মাংস হয়?

হ্যাঁ, রবিবার দুপুরে খাসির মাংস, বুধবার রাত্তিরে মুরগি।

অন্যান্য দিন?

মাছ প্রতিদিন। দুপুরে। ডাল ভাজা, অথবা তরকারি, মাছ, কোনও কোনও দিন চাটনি।

রাত্রে?

রাতে রুটিই পছন্দ করেন বোর্ডাররা। রুটি, ডাল, সবজি, দুধ অথবা দই। কেউ কেউ দুধটা ছানা করে খেতে চান। তাও করে দেওয়া হয়।

সকালে জলখাবার?

লুচি, পরোটা, তরকারি, কোনও দিন মুড়ি তেলেভাজা, জ্যাম, ব্রেড, অমলেট। সঙ্গে একটা ফল। বোর্ডাররাই মেনু সিলেক্ট করে দেন। সেই মতো বাজার করে আনি। বিকেলেও হালকা জলখাবার দেওয়া হয়। সঙ্গে চা।

এ তো রাজকীয় বন্দোবস্ত!

বিমানেব উৎসাহে জল ঢেলে পিন্টু জানতে চাইল, কেউ যদি নিমামিষ খেতে চান?

তারও ব্যবস্থা আছে। পনির, ধোঁকার ডালনা, পাঁচমেশালি তরকারি। যে যেমন চান করে দেওয়া হয়।

রান্না কিন্তু মোটেই বাড়ির মতো নয়। বড্ড ঝাল দেয় এরা।

সবাই ঘুরে তাকালেন। হাসলেন বিকাশ।

আসুন, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিসেস তৃপ্তি রায়, রিটায়ার্ড হেডমিস্ট্রেস, ভুবনেশ্বরী হাইস্কুল। এখানকার প্রথম বোর্ডারদের একজন। আর এঁরা এসেছেন খোঁজখবর নিতে, বৃদ্ধা মাকে এখানে রাখতে চান, সেই ব্যাপারে...

আর সব খুব ভাল। এঁদের ব্যবহার যত্নআত্তির তুলনা নেই। বিকাশ তো, কী বলব, হিরের টুকরো ছেলে। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার কোয়ালিটি খারাপ। জিনিসগুলো খারাপ আসছে তা নয়, রান্নাটাই জানে না।

মিসেস রায় অবশ্য মাঝে মাঝে নিজেই হাত লাগান।

কী করব? এমন মাংস রান্না করে, মুখে তোলা যায় না। ওই জন্যেই আজ সাত তাড়াতাড়ি নেমে এলাম।

কমিউনিটি হল আস্তে আস্তে ভরে উঠছে। বিকাশ বললেন, কোনও ভাল সিরিয়াল আছে। চলুন, আমরা অফিস ঘরে যাই।

রাস্তায় দেখা হল একজনের সঙ্গে।

এই যে মিস্টার সান্যাল, আপনার কথাই এঁদের বলছিলাম।

কী বলছিলে ভায়া? দুর্নাম নয় তো?

জিজ্ঞেস করুন।

হাসলেন সান্যাল। হাসিতে বয়েস আড়াল পড়ে গেল। এখানে অনেকেই আছেন যাঁদের দেখলে তাঁর চেয়েও ছোট মনে হয়। নিজেকে বৃদ্ধ বলে মানতে চান না বিমান। এখানে এলে ভাবনাটা ঘাড়ের ওপর চেপে বসে।

ভুল ভেঙে দিলেন সান্যাল।

এখানে থাকার সবচেয়ে বড় অ্যাডভানটেজ কী জানেন? ভুলেই যাই, আমরা বুড়ো হয়েছি। হাসিতে গানে হুল্লোড়ে মনে হয়, আবার ছোটবেলায় ফিরে গিয়েছি। বড় ভাল আছি জানেন, খুব আনন্দে আছি।

পাশ কাটিয়ে কমিউনিটি হলের দিকে এগিয়ে গেলেন সান্যাল। বিমানরা তিনজনে অফিস ঘরে এসে বসলেন।

পিন্টু গুছিয়ে বসল, এবারে কাজের কথাটা সেরে নেওয়া যাক।

হ্যাঁ বলুন।

খরচাপাতি কেমন লাগে?

মাসে সাড়ে তিন হাজার। মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হয়, এ ছাড়া টিভির জন্য বাড়তি পঞ্চাশ টাকা। কেউ যদি নিজের কিছু কিনতে চান, তাও এনে দেওয়া হয়। খরচটা তাঁকেই দিতে হয়।

পাঁচ তারিখ পার হয়ে গেলে?

সেটা মাথায় রেখেই, অ্যাডমিশনের সময় পনেরো হাজার অ্যাডভান্স নেওয়া হয়। টাকা বাকি থাকলে অ্যাডজাস্ট করা হয়, তবে তিন মাসের বেশি বাকি পড়লে নোটিস দেওয়া হয়।

পনেরো হাজার কি জমা থাকে?

তিন বছর পর্যন্ত। তারপর আবার পনেরো হাজার নেওয়া হয়। কেউ ছেড়ে গেলে পাঁচ হাজার কেটে রেখে বাকিটা ফেরত দেওয়া হয়।

জামাকাপড়, সাবান-টুথপেস্ট, চিরুনি-তোয়ালে?

নিজের নিজের। নিয়ে আসতে হয়।

অসুখ বিসুখ? এঁদের বয়েস হয়েছে। চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নিশ্চয়ই।

একজন ডাক্তারবাবু আছেন। মাসকাবারির বন্দোবস্ত। প্রতি শনিবার বিকেলে এসে রুটিন চেকআপ করে দিয়ে যান। হঠাৎ কেউ অসুস্থ হলেও তাঁকেই খবর দেওয়া হয়। বড় কিছু ঘটলে, নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হলে, আমরাই ভর্তি করে বাড়িতে খবর দিই। সেক্ষেত্রে খরচটা বাড়ির লোককেই দিতে হয়।

কেউ মারা গেলে?

নিষ্ঠুরের মতো প্রশ্নটা করল পিন্টু। বিমানের ভেতরটা ছমছম করে উঠল। ঠিকই তো, মৃত্যুর জন্যই তো অপেক্ষা। তাকে ধরে নিয়েই বসবাস। কিন্তু সত্যি সত্যিই সে দরজায় এসে দাঁড়ালে তখন?

এখনও কেউ মারা যাননি। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটে গেলে প্রথমেই বাড়িতে খবর দেওয়া হবে। মুশকিল হচ্ছে অনেকেরই নিকটাত্মীয়রা থাকেন দূরে দূরে। খবর পৌঁছে তাঁদের আসতে দেরি হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে হিন্দু সৎকার সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে, এই রকমই ঠিক করা আছে।

বেলা হয়ে যাচ্ছিল। বিকাশকে ধন্যবাদ জানিয়ে মোরাম রাস্তায় নেমে এলেন তাঁরা। দূর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন বিমান। হাসি দেখে এসেছেন, আনন্দও। কৈশোর ফিরে পেয়েছেন এঁরা।

কিন্তু বিমানের মনে হল, হাসির এই বাঁধভাঙা প্রকাশ, আনন্দের এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য আরও গভীর, আরও গোপন কিছু। একদিন এসে বাইরে থেকে দেখে এই মানুষগুলোকে চেনা সম্ভব নয়।

১১

আসুন, এবারে আপনাদের নিয়ে যাই বেহালা বকুলবাগান পুজোমণ্ডপে। সম্পূর্ণ দেশলাইয়ের কাঠির তৈরি এই প্রতিমা এরই মধ্যে ভারতীয় যাদুঘর, জাতীয় লোকশিল্প প্রদর্শনশালা এবং গ্যালারি নিরুপম-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কথা হচ্ছে, নষ্ট না করে এই অসামান্য শিল্পকীর্তিকে রেখে দেওয়া হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে দেখতে পায়, দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবে মানুষই কি এই অলোকসামান্য মূর্তির কারিগর? ময়দানবের কথা তা হলে মিথ্যা নয়?

ইন্দ্রপ্রস্থও সত্য? শুধু প্রতিমা নয়। ডোকরা শিল্পের অনুকরণে নির্মিত যে মণ্ডপ, তার স্থাপত্যও অসাধারণ!

টিভি চালিয়ে পুজো পরিক্রমা দেখছিলেন বিমান। বোসপুকুর তালবাগান, বোসপুকুর শীতলামন্দির, বড়িশা সহযাত্রী, সৃষ্টি। তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। কোথাও মূর্তিতে লোকশিল্পের আদল, কোথাও মণ্ডপে বিখ্যাত কোনও স্থাপত্য বা পুরাকীর্তির আভাস। এই বাংলারই শিল্পী এরা। বিষ্ণুপুর, গৌড়, হংসেশ্বরীর মন্দির এরাই তৈরি করেছিল বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। গৌড়ের আদিনা মসজিদ তো স্থাপত্যকীর্তির এক অতুলনীয় নিদর্শন।

কয়েক বছর এই ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। বাংলার লোকশিল্প, হারিয়ে যাওয়া পুরাকীর্তি দীপ-মালা-তুলসীমণ্ডপ সমস্ত যেন কলকাতার পুজোমণ্ডপে উঠে আসতে শুরু করেছে। ভিড়! জনসমুদ্র! গিয়ে দেখার প্রশ্ন নেই। বাড়ি বসে টিভির নব ঘুরিয়ে পুজো দেখেন বিমান। ঠাকুর দেখেন, মণ্ডপ দেখেন, আলো দেখেন, মানুষও দেখেন। কে বলেছে দূরদর্শন? নাম হওয়া উচিত নিকটদর্শন।

বছর তিরিশেক আগে এক বার কলকাতায় ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন। নন্দিতা ছিল। ছিলেন নন্দিতার দাদা বৌদিও। অপু তপুকে কোথাও একটা রেখে যাওয়া হয়েছিল। তখন নামকরা পুজো ছিল কুমোরটুলি, আহিরিটোলা, বাগবাজার। বাগবাজার দিয়ে শেষ হত পুজো দেখা। ওই চোখ! দেখলেই মাথা নুয়ে আসে। কলেজ স্ট্রিটের আলোর কাজ ছিল দেখবার মতো। ভিড়ও হত সেই রকম! সেই বছরই বোধহয় প্রথম মহম্মদ আলি পার্ক-এর ঠাকুর হল।

মহম্মদ আলি পার্ক-এর ঠাকুর দেখতে গিয়েই দেবিকা, নন্দিতার বৌদি হারিয়ে গিয়েছিলেন। ছেলে মেয়েদের আলাদা লাইন। ঠাকুর দেখে বেরিয়ে তিনজনে এক জায়গায় মিট করলেন, দেবিকা আর আসেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বিমানই সাজেস্ট করলেন, মাইকে অ্যানাউন্স করা হোক। নন্দিতার দাদা, সঞ্জয়ের ইচ্ছে ছিল না। বিমান ঠাট্টা করেছিলেন, ভাগ্যবানের বউ মরে না, হারায়ও। দাদা ভাবছেন বউ হারালে আর একটা বউ পাওয়া যাবে। আমরা থাকতে সেটি হতে দিচ্ছি না।

শেষ পর্যন্ত মাইকে অ্যানাউন্স করা হল। ব্যারাকপুর থেকে এসেছেন দেবিকা চৌধুরী। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নিকটাত্মীয়রা পুজো কমিটির অফিসে অপেক্ষা করছেন। যেখানেই থাকুন, অবিলম্বে এসে দেখা করুন।

ঘোষণা করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেবিকা এসে উপস্থিত। এসেই চোটপাট, —আমি কি তিন বছরের খুকি যে, মাইকে অ্যানাউন্স করতে হল?

লোকে কী ভাবল বলো তো? ডাহা মিথ্যেটা বলতে তোমাদের আটকাল না? হারিয়ে গেলে তোমরা, আর দোষ হল কি না আমার?

নন্দিতার দাদা কুঁইকুঁই করে বলার চেষ্টা করলেন, আমরা তিনজনে একসঙ্গে হারিয়ে গেলাম? পাগলেও তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।

চলো না, বাড়ি চলো, দেখাচ্ছি কে পাগল!

পুরো রাস্তা ফোঁসফোঁস করতে করতে চললেন দেবিকা। খেলেন না, কোনও পুজো মণ্ডপে ঢুকলেন না। ব্যারাকপুরের বাসে তুলে দিয়েও দুর্ভাবনা কাটল না বিমান আর নন্দিতার, ঠিকঠাক পৌঁছবে তো?

সেই কুমোরটুলি, অহিরিটোলা, কলেজ স্ট্রিট আর এখনকার বড়িশা, বোসপুকুর, সৃষ্টি। মাঝখানে একটা যুগ গেছে মুদিয়ালি, ম্যাডক্স স্কোয়ার, নবপল্লির। পুরোটাই উপভোগ করেন বিমান। ছোটবেলার পুজোর স্মৃতিও আবছা মনে পড়ে। খড়ের ওপর মাটির প্রলেপ, ঘাম তেল, চোখ আঁকা, ঢাকে কাঠি, নতুন জামাকাপড়। জুতোটাই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণের। মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্য একটা জীবন। যেন একটাই খাতা, মাঝখান থেকে দু'ভাঁজ করা। বাঁ পাশের পাতাগুলো মলিন উঁইয়ে কাটা, কালির দাগ পড়ে ধেবড়ে যাওয়া। কষ্ট করে লেখাগুলো খুঁজে নিতে হয়। ডান পাশের পাতাগুলো চকচকে, ছবিগুলো টাটকা, নতুন রিফিলে লেখা বলে পড়তে অসুবিধা হয় না।

বাইরে গলা শোনা গেল। দমনের গলাটাই সবচেয়ে জোরালো। দিউর সঙ্গে কিছু একটা নিয়ে জোর তর্ক করছে। গেটের তালা খোলার আওয়াজ। তাড়াতাড়ি টিভি অফ করে রিমোট তুলে রাখলেন বিমান।

হাসি হাসি মুখ করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন কী দাদুভাই, ক'টা ঠাকুর দেখলে? উত্তেজনায় গনগন করতে করতে ভেতরে ঢুকল দমন। আচ্ছা, তুমিই বলো, অসুর কখনও মানুষ হয়?

দমনকে থামিয়ে দিউ বলল, অসুর তো মানুষের মতোই দেখতে হবে। বড় মানুষ এই যা।

মোটেও না। অসুর অসুর আর মানুষ মানুষ।

তাঁর মুখের দিকে সমর্থনের আশায় তাকিয়ে রইল দমন। বিমান হেসে বললেন, মানুষই অসুর আবার মানুষই ঈশ্বর। অসুর কিংবা ঈশ্বর সবই মানুষের সৃষ্টি।

এ সব দিউ বা দমনের বোঝার কথা নয়। দমন উপযুক্ত সমর্থন না পেয়ে নিজের যুক্তিটাই জোরের সঙ্গে ঘোষণা করল, হাতে বালা, কানে দুল,

চোখে কাজল, এ কী রকম অসুর? কাজল তো মেয়েরা পরে! অসুর কি মেয়ে?

তা হলে অসুর কী রকম দেখতে দাদুভাই, বিমান নিজেকে সাইজ করে নিলেন।

অসুর মস্তবড় মেঘের মতন। লাল লাল চোখ, দাঁত দু'টো বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে, দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছে, হাতে বড় বড় নখ। এই অসুরকে দেখে ভয়ই করল না?

তুমি ভয় পাও?

আমি পাই না, কিন্তু দিদিও তো ভয় পেতে পারত!

হো হো করে হেসে উঠলেন বিমান। দিদি ভয় পেলেই দমনের চলে যেত। অত বড় দিদি, অথচ দিনরাত দিদির সঙ্গে পাল্লা না দিলেই নয়।

পরের বার অর্ডার দিয়ে দিবি, তোর পছন্দ মতো অসুর বানিয়ে রাখবে ওরা।

রাগ করে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল দিউ। পিউ এতক্ষণ কথা বলেনি। বিমান জিজ্ঞেস করলেন, সোনা দিদিভাই, তুমি ঠাকুর কেমন দেখলে?

পিউ এখন বড় হয়েছে। যতটা হয়েছে, নিজেকে তার চেয়েও বড় মনে করে। ঠোঁট উল্টে বলল, দুর্গা-সরস্বতী-লক্ষ্মী সবার সাজগোজই বড় জবরজং দাদু। ক্যাটকেটে শাড়ি, গলাভর্তি মোটামোটা গয়না। কোনও ড্রেস-সেন্স নেই।

কী করে হবে, এখানকার শিল্পীরা সব গাঁইয়া। কলকাতায় আসার তো সুযোগ পায়নি। ফ্যাশন সম্বন্ধে কোনও খবর রাখে না।

ফ্যাশনের কথা আমি বলছি না। লাল টকটকে শাড়ির সঙ্গে সবুজ রঙের ব্লাউজ। ম্যাচ করল, তুমি বলো?

মিতালি মেয়েকে ডাকল। ভাল শাড়িটা নষ্ট হবার আগে খুলে ভাঁজ করে তুলে রাখো। অকেশনে পরতে পারবে। খাটের ওপর এলিয়ে বসেছিল শাওন। পাগলের মতো ঘামে মেয়েটা। একটু ঘুরে এলেই ব্লাউজ ভিজে জবজব করে। প্রেশার-ট্রেশার আছে কি না কে জানে? অপুকে বলতে হবে চেকআপ করিয়ে নিতে।

কাত হল বিমানের দিকে, আপনি বেরুলেন না বাবা?

আমার কি ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখবার বয়েস আছে?

এমন কিছু বয়েস হয়নি আপনার। আপনার চেয়ে কত বেশি বয়েসের মানুষ ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে। হাঁটতে কষ্ট, না হয় একটা গাড়িই নিয়ে নেওয়া হত।

গাড়ি? ভিড় দেখেছ? হেঁটেই মানুষ এগুতে পারে না। তার ওপর রিকশা। এমন রিকশার জ্যামজট তুমি ভূ-ভারতে কোথাও দেখবে না।

তা ঠিক। এত রিকশা কোথাও দেখিনি। আমাদের ওখানে এই রকম জ্যাম বাধিয়ে দেয় অটো, যেখান সেখান দিয়ে মাথা গলিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দাঁত বের করে হাসতে থাকে। দেখলে গা জ্বালা করে।

নন্দিতা বাথরুমে ঢুকেছিলেন। বেরিয়ে টাওয়েলে মুখ মুছতে মুছতে শাওনের কথা শুনছিলেন, বললেন, তোমার শ্বশুর ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখেন না। দেখেন বাড়ি বসে টিভিতে, অবশ্য পরের পয়সায় কেনা টিভি।

মোটেও না। আমি তোমাদের টিভি ছুঁয়েও দেখি না। জোরের সঙ্গে অস্বীকার করলেন বিমান। জোরটা গলায় ভাল খেলল না।

নন্দিতা কাছে এগিয়ে গেলেন, টিভির গায়ে হাত রাখলেন। তারপর শাওনকে ডাকলেন।

শাওন বুঝতে পারছিল না। তবু শাশুড়িকে অমান্য করার সাহস হল না। উঠে টিভির গায়ে হাত দিল।

কী দেখছ?

গরম।

তার মানে টিভি চলছিল। বাড়িতে থাকার মধ্যে ছিলেন তোমার শ্বশুর। তিনি যদি না চালান, টিভি কি ভূতে চালাচ্ছিল?

ধরা পড়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন বিমান। টিভিটা এক্সচেঞ্জ-এ কেনা। আগের টিভিটায় তাঁর কনট্রিবিউশন ছিল। নতুন টিভি কেনার সময় বাড়তি হাজার চারেক টাকার দরকার পড়েছিল। নন্দিতা কথাটা তোলায় বিমান বলেছিলেন, টিভি তোমরাই দিনরাত দেখো। আমি টিভি চালাই না। ঠিক আছে, দেখা যাবে কে টিভি দেখে, বলে নন্দিতা চলে গিয়েছিলেন। মাসে মাসে কেব্‌ল-এর খরচও নন্দিতাই দেন। এখন প্রমাণ হয়ে গেল, বিমানও টিভি দেখেন। যাক গে, সামনের মাস থেকে কেব্‌ল-এর টাকাটা না হয় তিনিই দিয়ে দেবেন।

শাওন একটা প্যাকেট রাখল টেবিলে, বাবা, আপনার খাবার।

আমার খাবার? তোমরা?

আমরা বাইরে খেয়ে এসেছি।

পিউ এগিয়ে এল, জানো দাদু, আমরা আজ দারুণ দারুণ জিনিস খেয়েছি। চাট, আইসক্রিম, বুড়ির মাথার পাকা চুল। ফেরার সময় রুমালি রুটি আর কিমার তরকারি।

আমার জন্য কোনটা এনেছ?

রুটি আর কিমা, শাওন বলল।

মাংস খেতে ভাল লাগে না আজকাল। কিমা-টিমা আমার ঠিক...

আলুর দম রাখা আছে ফ্রিজে। আর রসমালাই। আলুর দমটা গরম করতে হবে।

নন্দিতার কথায় শাওন ফ্রিজ খুলে বের করে আনল। কিচেনে ঢুকে গ্যাস অন করে নেড়েচেড়ে বাটিতে তরকারি, প্লেটে মিষ্টি নিয়ে টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, খেয়ে নিন, রুটিগুলো নরম আছে।

হাত ধুয়ে খেতে বসলেন বিমান। বেশি রাত অবধি জেগে থাকলে দমন ঘুমোতে চায় না। অনর্থ করে, আবার দিদি না গেলে ও যাবে না। ওদের নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল শাওন।

মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল তপু। চোখ বন্ধ করে। পিউ বাবার পাশে গিয়ে কপালে হাত দিল, শরীর খারাপ লাগছে? জ্বর হয়নি তো?

গা-টা ম্যাজ ম্যাজ করছে, কপালটাও টিপটিপ করছে বিকেল থেকে।

বেরুলে কেন তা হলে? মিতালি রাগ রাগ গলায় বলল, —এখন জ্বরজারি বাধিয়ে বসলে সবই ভণ্ডুল।

লক্ষ্মীপুজোর পরেই ওদের ভাইজাগ যাওয়ার কথা। টিকিট কাটা, হোটেল বুকিং সব কমপ্লিট। তপুর শরীর খারাপ হলে সমস্ত ক্যানসেল করতে হবে।

আরও কিছু বলত হয়তো মিতালি, পিউ হাত ধরে বাবাকে ওঠাল, চলো, ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকবে। আমি মাথা টিপে দিচ্ছি, ঘুম এসে যাবে। ঘুম থেকে উঠলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অবেলায় স্নান করলে ও রকম হয়।

মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন বিমান। একটা ছোট্ট মা। দুই ছেলে বিমানের। ছেলেরা বড় হয়ে যে যার জগৎ তৈরি করে দূরে চলে গেছে। দুঃখে যন্ত্রণায় কাছে পাননি কারওকে। এখন মনে হল, একটা মেয়ে থাকলে বেশ হত।

খেতে খেতে ভাবছিলেন বিমান। এই দিনগুলোর জন্য অপেক্ষা করে থাকেন তাঁরা। ঝগড়া নয়, মনোমালিন্য নয়, বাকবিতণ্ডা নয়, নিজেদের ভালটুকুই দেখাতে চান ওদের। দুই ছেলে তপু আর অপু আসে, আসে মিতালি আর শাওন, ওদের বউ। তপুর মেয়ে পিউ, আর অপুর ছেলেমেয়ে দমন আর দিউও আসে। কলকাতার পুজো শেষ করে বিজয়া দশমীতেই চলে আসে ওরা। এখানে আরও দু'টো দিন মণ্ডপে ঠাকুর থাকে। একাদশীর

সন্ধ্যায় ঠাকুর দেখতে বেরোয় সবাই মিলে। প্রতিমা নিরঞ্জনের পর লক্ষ্মীপুজোর বাজার করে। লক্ষ্মীপুজো সেরে সবাই ফিরে যায়।

সরস্বতীপুজোর সময় এসেছিল। ক'টা দিনের মধ্যেই বাচ্চাগুলো হু হু করে বড় হয়ে গেল। দমনটা তো সেদিন অবধি আধো আধো কথা বলত। এখন দিদির সঙ্গে অসুরের চেহারা নিয়ে রীতিমতো তর্ক করে।

আর পিউ?

ঘুরে ফিরে পিউর কথাটাই মাথায় আসছিল বিমানের। সামনের সোফায় বসেছিল মিতালি। বলেই ফেললেন শেষ অবধি।

আমার সোনাদিদিকে একটু চোখে চোখে রেখো। এত সুন্দর দেখতে হয়েছে! যে দেখে তারই চোখ পড়ে যায়।

হ্যাঁ বাবা, চোখের সামনে মেয়েটা হঠাৎ বড় হয়ে গেল। বড্ড বাড়ন্ত গড়ন।

কোন ক্লাস হল?

নাইন। দু'বছর পরেই মাধ্যমিক।

ওরে বাবা! তারপরেই তো কলেজ!

সেটাই তো আরও বেশি চিন্তা।

কেন চিন্তা কীসের? লেখাপড়ায় ওরা তো খারাপ নয়।

খারাপ হলে চিন্তা কম করতে হত। ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। লেখাপড়ায় ভাল, আরও ভাল করার ইচ্ছা, অ্যামবিশন, এ সব থাকলেই মুশকিল।

মুশকিল কেন বলছ? আজকাল মেয়েরাও কত কিছু করছে। এবারে আইএএস পরীক্ষাতেও শুনলাম ফার্স্ট হয়েছে মেয়ে। দিদিভাইকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাও। দেখো ও-ও কিছু একটা করে ছাড়বে।

আজকাল সব কিছুই খরচসাপেক্ষ ব্যাপার বাবা! আইএএস-এর কথা বলছেন, বিখ্যাত কোচিং সেন্টারগুলোর পোস্টাল প্যাকেজ হাজার হাজার টাকা। অ্যাডভান্সড কোর্সগুলোর আরও বেশি। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং যাই-ই পড়তে যাক, প্রচুর টাকার প্রয়োজন। বিদেশে পড়তে চাইলে তো লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার।

কেন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই? আমাদের সময়ে কত স্কলারশিপ ছিল! কত গরিব ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখে উচ্চশিক্ষিত হয়েছে, বিদেশেও গেছে। দিনকাল কি পালটে গিয়েছে?

তপু পাশে বসে দাঁতে নখ কাটছিল, উত্তর দিল। দিনকাল সত্যিই পালটে

গিয়েছে বাবা। আমাদের সময়ে ন্যাশনাল স্কলারশিপ ছিল একশো পঁচিশ টাকা। যাতে খাওয়ার খরচ উঠে আসত। কুড়ি বছর পরে স্কলারশিপের টাকা বিশেষ কিছুই বাড়েনি। যেটুকু হয়েছে, তাতে বই কেনার খরচও ওঠে না। অন্য দিকে এডুকেশন এখন একটা র‍্যাট রেস। সেই প্রতিযোগিতার বাইরে থাকাও সম্ভব নয়। ছেলেমেয়ের জন্য যতখানি সাধ্য তা তো করবেই, দরকার হলে সাধ্যের বাইরে গিয়েও তোমাকে করতে হবে।

বিমানের হাত থেমে গিয়েছিল। রুটিগুলো শক্ত হয়ে গেছে। চুমুক দিয়ে রস খেলেন প্লেট থেকে। এই বয়েসে এত মিষ্টি খাওয়া কি ভাল? অথচ শেষ পাতে মিষ্টি না থাকলে মনে হয় খাওয়াটা পুরো হল না।

তপু কথাটা শেষ করেনি, মাঝপথে সুতো ধরল, ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটগুলোর খরচ জানো? ওই সব ইনস্টিটিউটে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের পড়তে যাওয়া এখন এক অলীক স্বপ্ন।

খুব আস্তে প্রায় স্বগতোক্তির মতো বিমান বললেন, তোমাদের তো অসুবিধা হবার কথা নয়।

মিতালিকে দৃশ্যতই অধৈর্য দেখাল। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, না বাবা। আপনার বড় ছেলে দেখতেই ডাক্তার। বাঁধা মাইনের সরকারি চাকরি, প্র্যাক্টিস করে না। থাকি সরকারি কোয়ার্টারে। বড়-সড় অসুখ করলে চিকিৎসার খরচও কেউ দেবে না। মেয়ের এডুকেশনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা আমাদের কাছে চাঁদে হাত বাড়ানো।

একটু থেমে আবার বলল, অথচ মেয়ে আমার ফেলনা নয়। ওর স্কুলের দিদিমণিরাও বলেন, একটু নারচার করলে ও অনেক কিছু করতে পারে।

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল বিমানের। উঠে মুখ ধুয়ে এলেন। মিতালি থালা তুলে বেসিনে নামিয়ে রাখতে গেল। চেয়ারে বসে তোয়ালেতে মুখ মুছছেন, অপু গলা নামাল, বাবা, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা ছিল।

অবাক হলেন বিমান। অপুকে যথেষ্ট সিরিয়াস দেখাচ্ছে। বললেন, কী কথা?

অপু সামনে এসে বসল।

একটা প্রবলেমে পড়েছি।

কী প্রবলেম?

তুমি তো জানো, আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকি। বাড়িওলার সঙ্গে খিটিরমিটির লেগেই থাকত। ইদানীং ব্যাপারটা এক্সট্রিমে পৌঁছয়।

বাড়ি বদলে ফেল।

সেই চেষ্টাই প্রথমে করছিলাম। দমনকে স্কুলে পৌঁছে দেবার একটা ব্যাপার আছে। বাড়ি খোঁজার সময় কথাটা আমাদের মাথায় রাখতে হয়েছিল। যেখানেই থাকি জায়গাটা যেন স্কুলের কাছাকাছি হয়। তা আমি আর শাওন মিলে তিন মাস সকাল বিকেল হন্যে হয়ে ঘুরেও থাকবার মতো বাড়ির সন্ধান পেলাম না। শেষকালে ব্রোকার-এর দ্বারস্থ হলাম। ব্রোকার ভদ্রলোক বয়স্ক, আমাদের সমস্যাটা বোঝেন, উনিই সাজেস্ট করলেন, ভাড়া গোনার চেয়ে নিজেদের ফ্ল্যাট কেনা বুদ্ধিমানের কাজ। ব্যাঙ্ক আজকাল ইজি ইনস্টলমেন্ট-এ লোন দেয়, ভাড়ার টাকাতেই ফ্ল্যাট হয়ে যাবে।

নিঃশ্বাস নেবার জন্য থামল অপু। সেই সুযোগে বিমান বললেন, ভদ্রলোক ভাল সাজেশনই দিয়েছেন। বয়েস অল্প, দু'জনে চাকরি করিস, এই বেলা নিজেদের একটা বাসস্থান করে ফেলাই উচিত।

অপু হাত ওল্টাল—সেই চেষ্টাই গত কয়েক মাস ধরে করছি। আমাদের এমন সামর্থ্য নয় যে, বছর বছর ফ্ল্যাট কিনব। যেটা কিনব, থাকব বলেই কেনা। তা কিনতে গিয়ে দেখলাম, আমাদের সাধ্যের বাইরে।

কেন? আজকাল যে আকছার বিজ্ঞাপন দেখি। প্রোমোটাররা শুনেছি সাধাসাধি করে। দামও আকাশছোঁয়া নয়।

হ্যাঁ, সাধ্যের মধ্যে ফ্ল্যাট পাওয়া যাবে, নরেন্দ্রপুর, জোকা, কিংবা মধ্যমগ্রামে। আমরা যেখানে চাইছি, দমনের স্কুল, আমাদের কলেজ, দিউর স্কুলবাস, দোকান বাজার, রাত এগারোটা অবধি যানবাহন, সে রকম পেতে গেলে যতখানি উঠতে হচ্ছে সেই ক্ষমতা আমাদের নেই।

বিমান অপেক্ষা করলেন। অপু কিছু বলতে চাইছে। অথবা এই কথাগুলো বলবে প্রস্তুতি নিয়েই এবার এসেছে। ওকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

অপু কিন্তু ওই অবধি বলেই থেমে গেল। বিমানই শুরু করলেন, সাধ্যের মধ্যে থাকাই ভাল। তাতে ঠকতে হয় না। নামতেও হয় না নীচে। সাধ্যের বাইরে কোনও কিছু করতে গেলে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেকেই সামলাতে পারে না।

কিন্তু বাবা, অর্পণ ব্যাকুল হয়ে বলল, আমাদের সাধ্য তো কম নেই। আমাদের দু'জনেরটা মিলিয়ে যেটুকু কম পড়ছে সেটা যদি তোমার কাছ থেকে নিই? পৈতৃক সম্পত্তি, তাতে তো আমাদেরও হক আছে?

চুপ করে শুনলেন বিমান। আন্দাজ করছিলেন। অপু নিজের মুখে বলে ভালই করল।

কথাটা যখন উঠলই, তখন আমিও বলি—মিতালি কখন এসে বসেছে খেয়াল করেননি বিমান—আপনার বড় ছেলেকে আপনি বলেছিলেন দেশের বাড়ির লাগোয়া জমির কথা। আপনার ছেলে বলেছিল, ওই সম্পত্তিতে তার আগ্রহ নেই। সেটা ও আমাকে বলেছে। আপনার ছেলের কোনও বাস্তববুদ্ধি নেই। ঠুনকো আদর্শবোধ নিয়ে ও চলে। সংসারটা চালাই আমি। আমি জানি টাকার কতখানি প্রয়োজন। জানি, আমাদের নিরাপত্তার জন্য, পিউয়ের ভবিষ্যতের জন্য ওই টাকার একটা অংশ পাওয়া কী ভীষণ জরুরি।

হাঁপাচ্ছিল মিতালি। তীব্র প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে ছিল অপুও। দু'জনেই তাঁর প্রিয়জন। এদের ইচ্ছাটাও অমূলক নয়। তবু ভেতরে একটা বিষাদের অনুভূতি আচ্ছন্ন করছিল বিমানকে। তিনি যে ওদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবেন না, সেই অক্ষমতাই এই বিষাদের একমাত্র কারণ নয়। কারণটা বুঝতে পারছিলেন, কিন্তু স্বীকার করতে মন চাইছিল না।

বিমান বললেন, ওই জমি তো বিক্রি হবে না মিতালি।

বিক্রি হবে না? হাহাকারের মতো শোনাল মিতালির গলার স্বর। অপুও যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

হ্যাঁ মা, আমি আর তোমার খুড়শ্বশুর দু'জনে মোহনপুরে গিয়েছিলাম। বিক্রির কথাবার্তাও এগিয়েছিল। কিন্তু যেদিন সব ফাইনাল হবার কথা, সে দিনই যার কেনার কথা, সে এল না। পরে জানা গেল, ওখানকার এক অ্যান্টিসোশ্যাল, তার নজর এড়িয়ে ওই জমি বিক্রি করা যাবে না। করলে তাকেই করতে হবে। সে যা দর দিচ্ছে তাতে জমিটা বিলিয়ে দেওয়াই ভাল। তাই ঠিক করেছি, ওই জমি আমরা বিক্রি করব না।

বাইরে রাত্রি ঘোর হয়ে আসছিল। ভেতরেও জমাট বাঁধছিল নৈঃশব্দ্য। অর্পণ জিজ্ঞেস করল, কী করবে কিছু ভেবেছ?

ঘাড় নাড়লেন বিমান।

ফাইনাল কিছু হয়নি। ভাবনা চিন্তা চলছে, খোঁজ খবর নিচ্ছি।...তোদের একটা সাজেশন নিই। বৃদ্ধাশ্রম করলে কেমন হয়?

বৃদ্ধাশ্রম?

হ্যাঁ বৃদ্ধাশ্রম। সংসারে যাদের থাকার জায়গা নেই তাদের শেষ বয়েসের আশ্রয়। মানুষের উপকার হল। আবার অর্থকরী দিকটাও ফেলে দেওয়া হল না।

বৃদ্ধাশ্রম? তুমি চালাবে?

আমি নয়, আমরা। ভাবছি। ভাবনাটা প্রাথমিক স্তরে আছে। ফাইনাল হলে জানাব।

১২

ট্রেন থেমেছে, আপ লাইনে। ট্রেনের মাথা এই অবধি আসে না। কিন্তু বোঝা যায়। স্টার্ট নেবার সময় আওয়াজ করে। মাথায় এক বার, ল্যাজে এক বার। ল্যাজেরটা আগে। টের পাওয়া যায় লোকজনের হেঁটে যাওয়া দেখে। খালি প্ল্যাটফর্মটা হঠাৎ সজীব হয়ে ওঠে। অনেক মানুষ নামে আজকাল। দুপুরেও স্টেশন গমগম করে। শেষ লোকটি পার হয়ে যাবার আগেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। হাঁটন্ত মানুষকে পার হয়ে দুলকি চালে এগিয়ে যায়। প্ল্যাটফর্মের মাথায় পৌঁছেই স্পিড নেয় ট্রেন।

আগে এমনটা ছিল না। গোড়ার দিকে সবই ছিল কাঠের বগি, স্টিম ইঞ্জিন। ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হলে বানপুর লোকাল নিজের চেহারায় থেকে গেল। একসময় নাম বদলে হল গেদে লোকাল। স্টিম ইঞ্জিনও বিদায় নিল। স্টিম ইঞ্জিন নিয়ে খুব উৎসাহ ছিল তাঁদের। লালগোলা প্যাসেঞ্জারে প্রথম লেগেছিল কানাডিয়ান ইঞ্জিন। দিশি ইঞ্জিনের মতো চ্যাপ্টা নয়, যথেষ্ট নাক উঁচু। তার গর্জনও অনেক গম্ভীর। কানাডিয়ান ইঞ্জিন সামনে নিয়ে থ্রু ট্রেন লালগোলা রোজই চলে যেত স্টেশন বাজিয়ে। এক দিন সিগনাল খারাপ ছিল, হঠাৎই লালগোলা দাঁড়িয়ে গেল স্টেশনে। সবাই ছুটেছিলেন, আশ মিটিয়ে কানাডিয়ান ইঞ্জিন দেখে নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য বানপুর লোকালেও নাক উঁচু ইঞ্জিন লাগল। লালগোলা প্যাসেঞ্জারও থামতে শুরু করল মোহনপুর স্টেশনে। মোহনপুরের জাতে ওঠার সেই শুরু।

প্ল্যাটফর্মের দু'টো ধারই তখন শুধু সিমেন্ট বাঁধানো ছিল। মাঝখানে মাটির ওপর ঘাস। বর্ষাকালে ঘাস বড় হলে রেলের লোক উপড়ে তুলে দিত। প্ল্যাটফর্মের কিনারায় ছিল কাঠের বেড়া। রোদ বৃষ্টিতে ক্ষয়ে এক সময় বেড়া ভেঙে যেত। বেড়ার ফাঁক গলে লোকজনের যাওয়া আসা তখন হয়ে যেত অবাধ। এখন লোহার বেড়া, লোহার শিকের মাথা তীক্ষ্ণ, ধারালো। তাও প্ল্যাটফর্মের ধারে ধারে যাদের বাড়ি, সবাই শিক উপড়ে নিজেদের যাওয়ার পথ

করে নিয়েছে। দোতলার বারান্দা থেকে পা ছড়িয়ে বসে দেখছিলেন বিমান। ট্রেনের দাঁড়ানো, মানুষের হেঁটে যাওয়া, মানুষকে পেছনে ফেলে ট্রেনের চলে যাওয়া। পরিচিত দৃশ্য। অথচ পুরনো হয় না। কেন? উত্তরটা সাজিয়ে নিতে গিয়ে দু'রকম জবাব পেলেন। এক : মানুষ। এত বৈচিত্র্য মানুষে—হেঁটে যাওয়া দু'টো মানুষ এক নয়। মানুষ দেখতে কখনও একঘেয়ে লাগে না। দ্বিতীয় কারণ, গতি। স্থিতিশীল নন্দনকাননেও এক ফুল এক গাছ এক রূপ দেখতে দেখতে নিশ্চয় ক্লান্তি আসে। এই যে চলমানতা—ট্রেনের, মানুষেরও, তা-ই বোধহয় দৃষ্টিকে দৃশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত রাখে, সরিয়ে নিতে দেয় না।

চোখ পিছিয়ে নিতেই আটকে গেল কাঁটাতারের বেড়ায়। সামনের জায়গাটা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা হয়েছে। আগাছা কেটে সাফ করেছে জগু। আগের ছেলেটা মহা ফাঁকিবাজ ছিল। তাকে বিদায় করে জগুকে রাখা অবধি কাজকর্মের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। মাটি কুপিয়ে ঝুরো করা হয়েছে, গোলাপ চারা আনবে পিন্টু। রান্নাটাও খারাপ করে না ছেলেটা। আজ দুপুরে ডাল, পোস্তর বড়া আর বাটা মাছের ঝাল রেঁধেছিল। এখনও জিভে লেগে রয়েছে। ওর মাইনে সামনের মাস থেকে বাড়িয়ে দিতে হবে। তিনশো টাকায় গাধার খাটুনি খাটে ছেলেটা।

টাকার কথাতে মনে পড়ে গেল, পিন্টু বলছিল, এখুনি হাজার দশেক টাকা খরচ না করলেই নয়। বাথরুম পায়খানা দু'টোই বাইরে ছিল। অ্যাটাচড না হোক, প্রতি তলাতে অন্তত দু'টো করে টয়লেট তো করতেই হবে। চব্বিশ ঘণ্টা জলের ব্যবস্থাও জরুরি। ওভারহেড ট্যাঙ্ক বসানো হয়েছে, নীচে রিজারভার। জল ভর্তি হলে, পাম্প করে ওপরে তোলা হবে। পিন্টু বলছিল, ডিপ টিউবওয়েল-এর প্রভিশন থাকা ভাল। কুয়োটা যেমন ছিল, রেখে দেওয়া হয়েছে, এমারজেন্সিতে কাজে লাগানো যাবে।

প্রভিডেন্ট ফান্ডে যতটুকু পড়েছিল পুরোটাই প্রায় তুলে নিয়েছে পিন্টু। লোনও করেছে এ দিক ও দিক থেকে। ব্যাঙ্কে যা জমা ছিল ঝেড়েপুঁছে বের করে নিয়েছেন বিমানও। জলের মতো টাকা খরচ হচ্ছে। এখনও জমার খাতা শূন্য। এক বার ভেবেছিলেন ছেলেদের কাছে হাত পাতবেন। পরে মনে হল, চেয়ে না পেলে সেই আঘাত নিতে পারবেন না। নন্দিতা? হয়তো দিত। আত্মসম্মানে লাগল। এত দিন পরে? নতুন করে?

দু'টো ফিক্সড ডিপোজিট ছিল, সামনের বছরেই ম্যাচিওর করত, ভাঙিয়ে ফেললেন। হাজার পাঁচেক টাকা বিপদ আপদের জন্য রেখে পুরোটাই দিয়ে

দিলেন। পিন্টু বলছে আরও হাজার দশেকের ধাক্কা। তার মানে ওই পাঁচ হাজারেও হাত পড়বে।

বিমানের কিন্তু খারাপ লাগছে না। চোখের সামনে একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে। মোহনপুরের মতো জায়গায় চলবে কি না তাই নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু আইডিয়াটা বাজারে ফেলতেই এত চমৎকার রেসপন্স আসছে যে, পেছন ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করছে না। বিমানও যেন সব কিছুতে উৎসাহ ফিরে পেয়েছেন। বেশ চনমনে লাগছে আজকাল। খিদে হচ্ছে। আজ তো বাটা মাছের ঝাল দিয়ে এক হাতা বেশিই ভাত খেয়ে নিলেন।

অফিসিয়াল কাজও অনেক ছিল। পিন্টু এক দিন গড়গড় করে সব বলে যাচ্ছিল। কোন কোন দফতরে অ্যাপ্লাই করতে হবে, পারমিশন নিতে হবে একগাদা। শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন বিমান। শেষে বলেছিলেন, ও সব আমাকে শুনিয়ে কী হবে? আমি কী জানি ও সবের?

পিন্টু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, কিন্তু এ সব না করলে তো বৃদ্ধাশ্রম করাই যাবে না।

ও সব তুই করবি। সরকারি অফিসের ঘাঁতঘোঁত তুই-ই বুঝিস। ডিআই অফিস অবধি দৌড়োদৌড়ি করেই আমার হাঁপ ধরে যেত, আর তুই যা ফর্দ দিলি...

কিন্তু তোমার যাওয়াটাও জরুরি। মালিক তো তুমিও।

তাতে কী হয়েছে? বলবি, দাদার বয়েস হয়েছে, আসতে পারবে না, দাদার হয়ে আমি এসেছি।

দু'জন মালিকের একজনও না থাকলে...যদি কোনও অসুবিধা হয়?

মিত্রাকে নিয়ে যাস।

চুপ করে অনেকক্ষণ বসেছিল পিন্টু। পিন্টু সরকারি চাকরি করে। তাই মিত্রার নামে ওর অংশটা হস্তান্তর করে ফেলেছিল। কাগজে কলমে বৃদ্ধাশ্রম হবে, বিমান আর মিত্রার নামে। যাওয়া উচিত বুঝতে পেরেও পিন্টুর ঘাড়েই ঝামেলাটা চাপিয়ে দিতে চাইছিলেন বিমান। নন্দিতা এই জন্যেই সারাটা জীবন বলে এসেছে, সুখের পায়রা।

দিন কয়েক বাদে অনেকগুলো কাগজপত্র নিয়ে এসেছিল পিন্টু। তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিল। ক'য়েকজন অফিসার সরেজমিন দেখতেও এসেছিলেন। বিমান ছিলেন। কথাবার্তা যা বলার পিন্টুই বলেছিল। বিমানের ভাল লেগেছিল। এমনিতে হাবাগবা মনে হলেও পিন্টু সে দিন খুব গুছিয়ে কথা

বলেছিল। অফিসাররাও খুশিই হয়েছিলেন মনে হয়। সামান্য মডিফিকেশনের পরামর্শ দিয়ে তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। একদিন লাফাতে লাফাতে পিন্টু এসেছিল, দাদা, আমাদের পারমিশন বেরিয়ে গেছে। এ বারে শুরু করলেই হয়।

দু'য়েকটা কাজ বাকি। একজন ডাক্তার রাখতে হবে। সপ্তাহে অন্তত এক দিন যেন ভিজিট করে যান। যারা থাকবে তারা সবাই বৃদ্ধ, অসুখবিসুখ লেগে থাকবে। বড় কিছু হলে কল্যাণী। তারও একটা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সবই গুছিয়ে আনছিল পিন্টু। ঘাঁটি আগলে তদারকি করছিলেন বিমান।

নাম কী হবে তাই নিয়েও অনেক কথা চালাচালি হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, নাম হোক শান্তির নীড়। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, ওই নামে আগেই কেউ রেজিস্ট্রেশন করিয়ে ফেলেছে। মিত্রা এসেছিল এক দিন। ঘুরে ঘুরে দেখল। দু'য়েকটা সাজেশনও দিল। বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে নামের ব্যাপারটা ওর কাছেই তুললেন বিমান। ওর আবার সাহিত্যের ঝোঁক। এক কালে নিজেও না কি কবিতা লিখত। ও দু'য়েকটা নাম সাজেস্ট করল— গোধূলির রং, দিগন্তের ছায়া—কোনওটাই পিন্টুর পছন্দ হল না। পিন্টুর বক্তব্য, অত দুঃখ-দুঃখ নাম হলে কেউ থাকতে চাইবে না। বার্ধক্যটা কেউ মেনে নেয় না। টগবগে নাম হলেই বরং বেশি মানুষ আকৃষ্ট হবে। ব্রত সঙ্গে ছিল, ওরও দেখা গেল তাই মত।

শেষ অবধি আলোচনাটা অসমাপ্তই থেকে গিয়েছিল। পারমিশনের কাগজ নিয়ে পিন্টু এলে দেখা গেল সাদামাঠা নাম দিয়েছে। মোহনপুর বৃদ্ধাবাস।

বৃদ্ধাবাসটা তো রইল!

বিমানের কথায় পিন্টু বলল, বৃদ্ধরা থাকবে, তাতে বৃদ্ধাবাস হলে ক্ষতি কী? কিন্তু দিগন্ত, সন্ধ্যা, ওই সব থাকলেই মরে যাওয়ার কথাটা টপ করে মাথায় এসে যায়। বুড়োরা কেউ মরতে চায় না। তা ছাড়া মোহনপুর নামটা থাকাও জরুরি। লোককে জানাতে, বিজ্ঞাপন দিতে সুবিধা হবে।

কিছু হ্যান্ডবিল বানাতে দিয়েছিল পিন্টু। সেগুলো কাছাকাছি স্টেশনে, সিনেমা হলে, ল্যাম্পপোস্টে লাগাবার বন্দোবস্ত করল। দিনও ঠিক হয়ে গেল, পয়লা জানুয়ারি। অবশ্য যোগাযোগ আগে থেকেই করা যেতে পারে।

বারান্দায় বসে এলোমেলো ভাবতে ভাবতে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল বিমানের। পিন্টুর কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরছিল, বুড়োরা কেউ মরতে চায় না। বিমান কি বুড়ো হয়েছেন? আগেকার দিন হলে তাঁকে অতিবৃদ্ধ ভাবা হত,

এত দিন সন্ন্যাস দিয়ে বনে পাঠিয়ে দিত। অথচ আজকাল কেউ এই বয়েসটাকে বয়েস বলেই ভাবে না। নতুন করে জীবন শুরু করে অনেকে।

তন্দ্রা আর জাগরণের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে বিমান দেখছিলেন, তাঁদের বৃদ্ধাবাস রমরম করে চলছে। ফাংশন হচ্ছে। আবাসিকরা গান গাইছে। বালতি হাতে খিচুড়ি পরিবেশন করছেন বিমান। তদারকি করছে পিন্টু। কে যেন খবর দিল, নীচে কেউ তাঁর নাম ধরে ডাকছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, একটি মেয়ে সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে। ব্যাগ থেকে একটা লিস্ট বের করে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনিই বিমান মুখোপাধ্যায়? ঘাড় নাড়লেন বিমান। মেয়েটি খুব শান্ত গলায় বলল, আপনার তো আজই যাওয়ার কথা। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল বিমানের। শুকনো জিভ ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে বললেন, আজই? মেয়েটা একই রকম নিরুত্তাপ স্বরে বলল, হ্যাঁ, এখনই। বিমান বলতে চাইলেন, কিন্তু আমার যে এখনও তৈরি হওয়া বাকি।

ঘেমে স্নান করে ধড়মড় করে উঠে দেখলেন, সত্যিই শাড়ি পরা কে যেন রেলিংয়ের ফাঁক গলে ঢুকছে। কাছে এসে মুখ তুলে ওপরে তাকাল। চিনতে পারলেন বিমান, মিলি।

মিলি বলল, বড়দা, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

বিমান বললেন, আয়।

গলা তুলে জগুকে ডাকলেন, নীচের দরজাটা খুলে দিয়ে আয়।

মিলি এসে প্রণাম করল। বিমান উঠে দাঁড়ালেন, আঙুলে পৈতে জড়িয়ে মাথায় ঠেকালেন মিলির, অস্ফুটে বললেন, কল্যাণ হোক।

কত দিন পর দেখা বলো?

হ্যাঁ, বলে চুপ করে গেলেন বিমান। মুখোমুখি থাকিস, রেল লাইন পার হলেই বাড়ি। বুড়ো দাদা একলা থাকছে, কিছু লাগবে কি না, শরীরটরির ঠিকঠাক আছে কি না এক বার খোঁজ নিতেও তো পারতিস।

বিমান চুপ করে থাকলেও মিলি কলকল করে বলে যেতে থাকল, শুনেছি আসছ, এসে থাকছও মাঝে মাঝে। কখন আস, কখন যাও টের পাই না। ইচ্ছা থাকলেও এসে দেখা করতে পারি না।

আজ এলি যে?

একজন খবর দিল, তোমাকে না কি ট্রেন থেকে কাল নামতে দেখেছে। ভাবলাম, কাল এসেছ যখন, আজকেই চলে যাবে না নিশ্চয়। তাই দেখা করতে এলাম।

ডাহা মিথ্যে। কাল আসেননি বিমান। এসেছেন ক'দিনই হল। আজকাল এক বার এলে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে যাচ্ছেন। না থাকলেই কাজ আটকে যায়। থাকলে তদারকি করতে সুবিধা হয়। ইচ্ছে হলে অদলবদলও করে নেওয়া যায়।

আসলে একজন নয়, পল্টু। কাল সন্ধের দিকে বাজারে গিয়েছিলেন। দাড়ি কামানোর ব্লেড ফুরিয়ে গিয়েছিল। ক্ষুর দিয়ে কামানোর অভ্যেস। ক্ষুরটা বাড়িতে ফেলে এসেছেন। এখানে একটা সস্তা শেভিংসেট কিনে রেখেছেন। একটাই মুশকিল, ব্লেড ফুরিয়ে গেলে কিনে আনতে হয়। দাড়ি কামাতে গিয়ে ব্লেড ফুরিয়ে গেছে আবিষ্কার করা খুবই বিরক্তিকর। জগুকেই পাঠানো যেত। তবু মনে হল। দুপুরে খাওয়ার পর একটু না হাঁটলে সন্ধের দিকে পেটটা দমসম লাগে, রাত্তিরে খাবার ইচ্ছে থাকে না। একটু হেঁটে আসা ভাল। বাজারের মুখেই পল্টুর সঙ্গে দেখা। দেখা বলা ভুল। দেখেই না দেখার ভান করে সুট করে একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল পল্টু। ওই গিয়ে মা-কে বলেছে। কথা ঘোরাবার জন্যে বিমান বললেন, কেমন আছিস তোরা?

ওর তো হার্টের অসুখ। পেসমেকার বসিয়ে আনা হয়েছে। আর বেরতে পারে না। হাঁটা চলা করলেই হাঁপিয়ে যায়।

হবে না? ভাবলেন বিমান, কম পাপ করেছে হর? কোথাও না কোথাও ঠিকই হিসাব হচ্ছে। যার যেমন প্রাপ্য এ জীবনেই পেয়ে যেতে হবে। নন্দিতার মতো আচারবিচার মানেন না বিমান, কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাস তাঁরও আছে। সে ঈশ্বর কল্যাণময়।

কী করি বলো? এই বয়েসে বলভরসা, সবই তো এই আমি। যতটুকু সাধ্য সেবাযত্ন করি, হাত ধরে বাইরে নিয়ে যাই, চোখে চোখে রাখি। ডাক্তার বলেছে, একা না ছাড়তে।

ন্যাকা! স্বামী তো নয়, সাক্ষাৎ শিবঠাকুর! বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যেই খারাপ জায়গায় যাওয়া শুরু করেছিল হর, অসুখ নিয়ে ফিরে এসেছিল। বহু চিকিৎসায় রোগ সারে। এই সে দিনও কার না কার সঙ্গে ভেগে গিয়েছিল, পাড়ার লোকেরা উদ্ধার করে নিয়ে আসে। প্রেমে গলে যাচ্ছেন উমা!

পুঁটুর জানো তো, পর পর বাচ্চা হতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কলকাতায় ডাক্তার দেখিয়েও কিছু হল না। শেষে বারুইপুরের কবিরাজি ওষুধ খেয়ে গত বছর খোকা হয়েছে। শাশুড়ির মুখ ঝামটা বন্ধ হয়েছে, আমরাও হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।

বিমান চুপ করে শুনছিলেন, লক্ষ করল মিলি। গালে হাত দিয়ে বলল, দেখেছ? একা একা কেমন বকে যাচ্ছি? তোমার কী খবর বলো? শরীর?

ভালই আছে। এই বয়েসে যেটুকু না থাকলে নয়, সেটুকু আছে। কাজকর্ম সবই করছি। কোনও অসুবিধে নেই।

বউদি?

নন্দিতা মিলির নাম শুনলে এখনও তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে—হাড়বজ্জাত! আমাকে কম জ্বালিয়েছে? সেই বউদির খবর নিচ্ছে মিলি।

ঠিক আছে। এখনও চাকরি করছে।

আগের মতো আছে? রাগী? গম্ভীর?

ঘাড়টা মাঝামাঝি রাখলেন বিমান। যার মানে, হ্যাঁ—না দুই-ই হয়।

ভাইপোরা? তপু আর অপু?

তপু ডাক্তার। অপু কলেজে পড়ায়। ওর বউও কলেজ টিচার। তপুর এক মেয়ে। অপুর এক ছেলে, এক মেয়ে। কলকাতায় থাকে।

আসে? দেখা সাক্ষাৎ হয়?

এই তো পুজোর পরেই এসেছিল।

এলে বোলো, এক বার যেন সবাই মিলে মোহনপুরে আসে। কত ছোট দেখেছি ওদের। দেখলে চিনতেই পারবে না। পিসি বলে পরিচয় দিতেও সঙ্কোচ হবে।

পিসির মতো পিসি হলে, নিশ্চয়ই পরিচয় দিত, মনে মনে বললেন বিমান।

মুগ্ধ চোখ নিয়ে এদিক ওদিক দেখছিল মিলি। বারান্দার এক ধারে সিমেন্টের বাঁধানো বেঞ্চে বসেছিল। ওখান থেকে সামনের বাগান, বেড়া, রেললাইনের ফেন্সিং অবধি দেখা যায়।

কী সুন্দর দেখাচ্ছে বাড়িটা! নতুন রং হয়েছে। ছাদের ওপর জলের ট্যাঙ্ক, নীচে টিউবওয়েল, বাগানটারও চেহারা ফিরে গেছে। এখানে পাকাপাকি থাকবার কথা ভাবছ না কি বড়দা?

ভয় পাচ্ছিস? বড়দা পাকাপাকি থেকে গেলে পল্টুর বাড়া ভাতে ছাই পড়বে? মুখে বললেন, দেখা যাক। বাড়িটা ভূতের বাড়ি হয়ে পড়েছিল। ভাবলাম, সংস্কার-টংস্কার করে যদি চেহারা ফেরানো যায়। পিন্টুকে বললাম। ও-ও সায় দিল।

ছোড়দাও থাকবে না কি এসে?

থাকবে না। তবে আছে আমার সঙ্গে।

তোমার সঙ্গে মানে? কিছু করবার কথা ভাবছ?

সাবধান হয়ে গেলেন বিমান। বেফাঁস বলে ফেলেছেন। তাঁর এই বোনটি অসম্ভব ধূর্ত। পেটের কথা টেনে বের করে। কথা না বাড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

এখনই কিছু ভাবছি না। দেখা যাক। পরে যদি ইচ্ছে হয়...

যাই ভাবো, যে কাজেই হাত দাও, পল্টুকে সঙ্গে নিও। ওর এই বাড়িতে হক আছে।

হক? পল্টুর? মাথা গরম হয়ে গেল বিমানের। বলে ফেললেন, পল্টুর? কী রকম?

মনে নেই? একতলার বড়ঘরে পল্টু হয়েছিল? আটমাসে এসে থেকে ছিলাম এখানে। আগের দিনও মোক্ষদা বলে গেল, প্রথম পোয়াতি, কম ভোগাবে ভেবেছিস? পরদিন সকাল থেকেই অল্প অল্প ব্যথা, দুপুরে জল ভেঙে গেল। খবর পেয়ে মোক্ষদা এসে বলল, কোথাও নিয়ে যাবার সময় নেই। শিগগির সব নিয়ে এসো। জিনিসপত্র রেডি করতে করতেই পল্টু হয়ে গেল।

এ বাড়িতে জন্মেছিল বলেই পল্টুর হক? সে তো বুধিগাইয়েরও বছর বছর বাচ্চা হত গোয়ালে। সে হিসাবে তাদেরও তো হক বাড়িতে।

চোখে আগুন নিয়ে উঠে দাঁড়াল মিলি।

দেখো বড়দা, বহু বছর তোমরা মোহনপুরের বাইরে। এখানকার হালহকিকত তোমাদের জানা নেই। সেই মোহনপুর আর নেই। এখানে থাকতে গেলে, পল্টুকে সঙ্গে নিয়েই তোমাদের থাকতে হবে। ভালর জন্যেই সাবধান করতে এসেছিলাম। বাড়িটার প্রতি পল্টুর দুর্বলতা আছে। আমাকে অনেক বার বলেছে, মামাদের বলো না, বাড়িটা যেন আমাকে দিয়ে দেয়। ওর অনেক পরিকল্পনা আছে। মার্কেট কমপ্লেক্স আরও কত কী!

গলা নামাল মিলি, ওকে পাঠিয়ে দেব এক বার? কথা বলবে?

বিমান নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে বললেন, পল্টুর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমাদের কথা হয়েছে। কেন, তোকে বলেনি পল্টু?

মিলির মুখ দেখে মনে হল, জেনেশুনেই ও এসেছে। পুরনো সম্পর্কের রসে ভিজিয়ে পল্টুর জন্যে জমিটা আদায় করতে পল্টুই হয়তো মিলিকে পাঠিয়েছে।

কাজ হবে না বুঝতে পেরে উঠে পড়ল মিলি। এক বার যাচ্ছিটুকুও বলে গেল না।

১৩

সকাল থেকেই হইহই ব্যাপার। বেশ উৎসব উৎসব লাগছিল। ব্রতকে নিয়ে মিত্রা এসেছে। পিন্টু তো কন্যাদায়গ্রস্ত বাবার মতো ছুটোছুটি করছে। বাড়িটা সাজানো হয়েছে ফুল দিয়ে। সামনে ছোট সামিয়ানা, কয়েকটা চেয়ার পাতা। ফুল কোথায় পাবি, জিজ্ঞেস করলে পিন্টু হেসে বলেছিল, দেখো না, সব জোগাড় হয়ে যাবে। সত্যিই সব জোগাড় হয়ে গেল। অবাক হয়ে বিমান দেখলেন, ফ্লোরিস্ট এসে ফুল দিয়ে বাড়ি সাজিয়ে গেল, ডেকরেটার বাঁশ বাঁধতে শুরু করল দু'দিন আগে থেকে। লাইটের কাজও ডেকরেটারই করল। কাল সারা দুপুর দু'টো ছেলে মেন থেকে তার টেনে, অনেক কারিকুরি করে রাত্তিরেই আলো জ্বালিয়ে হাত ঝেড়ে চলে গেল। ফ্লোরিস্ট ডেকরেটার ইলেকট্রিশিয়ান সকলেই মোহনপুরের ছেলে। অবাক হয়ে গেলেন বিমান। সেই মোহনপুর এত দূর পৌঁছে গেছে?

আজ লোকজন আসবে, জনা তিরিশের পাত তো পড়বেই। জগু এক বার বলেছিল, জিনিস কিনে দিন, আমি একাই সামলে দেব, বিমানই রাজি হননি। ক'টা টাকার সাশ্রয় করতে গিয়ে কোথাও ত্রুটি হয়ে গেলে লোকে ছিছি করবে।

কয়েকজন অফিসারকেও নেমন্তন্ন করেছিল পিন্টু। এদের অনেকেই ইন্সপেকশন করার সময় এসেছিলেন। সকলকে হাতে হাতে প্লেট ধরিয়ে দেওয়া হল। লুচি, তরকারি, মিষ্টি, কফি। খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে চলে গেলেন নিমন্ত্রিতরা।

দু'য়েকজন এলেন পরে। থানার দারোগা, লোকাল বিডিও। বিডিও ভদ্রলোক খুবই ইয়াং, চোখমুখ ধারালো, ব্যস্ত মানুষ, বেশিক্ষণ বসলেন না, সৌজন্য বিনিময় করেই চলে গেলেন। দারোগা রসেবশে মানুষ। গুছিয়ে বসলেন, টুপি খুলে টাকে হাওয়া লাগালেন, দু'খানা লুচি চেয়ে খেলেন, আবার আসবেন বলে সাঙ্গপাঙ্গসহ বিদায় নিলেন।

সকালের দিকটায় একজন পুরোহিতও এসেছিল। দরজার সামনে কলাগাছ বসিয়ে ছবি-টবি এঁকে অংবং করল। ইচ্ছে করেই কান দিলেন না বিমান। ভুল উচ্চারণে সংস্কৃত তাঁর অসহ্য লাগে। কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত এসে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা এঁকে শান্তিরজল ছিটিয়ে চলে গেল। বিমান দেখলেন পুরোহিত বছর তিরিশের এক যুবক—না কাটা দাড়ি, অন্তর্বাসহীন ধুতি, মলিন চাদর। পিন্টুকে ডেকে বললেন, পুরোহিতকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা

দিয়ে দিস। পিন্টুর বোধহয় কমে সেরে ফেলার ইচ্ছে ছিল। বলল, আচ্ছা।

সকাল থেকে বেলা এগারোটার মধ্যেই প্রাথমিক কাজকর্মগুলো শেষ হয়ে যাবার পর শুরু হল প্রতীক্ষা। আজ দু'জন আবাসিক আসবেন। তাঁরা এসে গেলেই বৃদ্ধাবাসের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল ধরে নিতে হবে।

প্রথমজন, অলকা দত্ত। বয়েস ছিয়াত্তর। বিয়ে করেননি। ওয়ার্কিং উইমেনস হস্টেলে থাকতেন। সেখানেও একটা বয়েসের পর অসুবিধা হয়। তা ছাড়া এখন তো তাঁকে ওয়ার্কিং উইমেন বলা যাবে না! হস্টেল ছেড়ে দিয়ে আত্মীয়স্বজনের কাছে থাকছিলেন। শেষ অবধি দিদির মেয়ে দায়িত্ব নিয়ে একটি ওল্ড এজ হোমে রেখে আসেন। সেখানকার পরিবেশ ভাল না লাগায়, এবং কলকাতার বাইরে নিরিবিলিতে কাটাবেন সেই অভিপ্রায়ে, এই বৃদ্ধাবাসের খোঁজ পেয়ে থাকতে আসছেন।

দ্বিতীয়জন জগদীশ ভদ্র। এঁর বয়েস আরও বেশি। আশির ওপর। দুই ছেলেই প্রতিষ্ঠিত, ভাল কাজ করেন। একজন বাড়ি করেছেন কল্যাণীতে। কাছাকাছি হবে বলে এই জায়গাটা নির্বাচন করেছেন। যখন খুশি দেখে যেতে পারবেন। বড় ছেলে সরকারি অফিসার। তাঁর কথায় অপরাধবোধ ধরা পড়ছিল।

আমরা ঠিক চাইনি বাবাকে এই ভাবে রেখে যেতে। কী করি বলুন? উপায় ছিল না। অ্যালজহাইমার হওয়ার পর থেকে নিজে কিছুই মনে রাখতে পারেন না। খাওয়া দাওয়া জামাকাপড় সবই গুলিয়ে ফেলেন। হাসপাতালে রেখে দেখেছি ভায়োলেন্ট হয়ে যান। আবার বাড়িতে লোক রাখলে তার ওপরে নজর রাখবার জন্যে আমাদের কাউকে থাকতে হয়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করি। ভাইয়েরও একই ব্যাপার। অনেক ভাবনাচিন্তা করে এটাই ঠিক সাব্যস্ত হল।

চার্জ কী রকম হবে, তাই নিয়ে দু'ভাই অনেক শলাপরামর্শ করেছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল কলকাতার বাইরে, সুযোগসুবিধাও তেমন দিতে পারছেন না, তাই প্রথম দিকটায় চার্জ কম রাখা হোক।

পিন্টু আপত্তি করল। ওর প্রথম যুক্তি, কলকাতার বাইরে হওয়া কিছু অযোগ্যতা নয়। বরং অনেকেই সেটা প্রেফার করবে। দ্বিতীয় কথা, রেট কম রাখলে লোকের ধারণা হবে এখানে কোয়ালিটি সার্ভিস পাওয়া যাবে না। তাই রিজনেবল চার্জ রাখাই ভাল।

শেষ অবধি ঠিক হল, মাসে মাসে তিন হাজার, আর পনেরো হাজার টাকা

অ্যাডভান্স। চলে গেলে অথবা মারা গেলে, খরচ-খরচা কেটে নিয়ে ফেরত দেওয়া হবে।

অলকা দত্তের বাড়ির লোক কিছু বললেন না। আপাতদৃষ্টিতে বেশি সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও জগদীশবাবুর ছেলেরা গাঁইগুঁই করতে লাগলেন। কলকাতা থেকে এত দূরে, নতুন শুরু করছেন, এখনই এত বেশি নিচ্ছেন, একটু কমসম করুন।

পিন্টু ঠাণ্ডা গলায় বলল, মিনিমামটুকুই ধরা হয়েছে। আপনার বাবার জন্য যদি স্পেশাল অ্যাটেনডেন্ট রাখতে হয়, উনি নিজের কেয়ার নিজে নিতে পারেন না, সেক্ষেত্রে বাড়তি যা লাগবে সেটাও দিতে হবে।

ছোট ছেলে বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বড় ছেলে ভাইকে টেনে নিয়ে গেল। যাবার আগে অবশ্য টাকা-পয়সা মিটিয়ে রশিদ বুঝে নিলেন।

দুপুরে সবাই খেতে বসেছে, এলেন অলকা দত্ত। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে গেল পিন্টু। অলকা ব্যস্ত হতে বারণ করলেন। বললেন, আমি খেয়ে এসেছি, আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না। আপনারা খাওয়ার পাটটা চুকিয়ে ফেলুন। আমি বসছি।

বিমান বললেন, জিনিসপত্র তা হলে ঘরে তুলে দিয়ে আসুক। আপনি না হয়...

না। কোন জিনিস কোথায় রাখবে আমি দেখিয়ে না দিলে এলোমেলো হয়ে যাবে। থাক না, আমার তাড়া নেই।

বিমান তবু ইতস্তত করছিলেন, এইভাবে মালপত্র ছড়িয়ে বাইরে বসে থাকবেন, আমাদের খারাপ লাগছে।

হাসলেন অলকা। প্রবোধ দেবার ভঙ্গিতে বললেন, থাকতেই তো এসেছি। দু'দিনের ব্যাপার তো নয়! এই সামান্য সময়, এ আর এমন কী?

বিমান থতমত খেয়ে গেলেন। পিন্টুও কথা না বাড়িয়ে খেতে বসে গেল। খাওয়া হয়ে গেলে জগুর মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে পিন্টু ওপরে গেল। পেছন পেছন অলকা। সঙ্গে অলকার বোনঝি এসেছিলেন, তিনিও সঙ্গে গেলেন।

নীচে গার্ডেন চেয়ারে বসে ভাবছিলেন বিমান। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা হচ্ছিল। ছোটবেলায় পরীক্ষার সময় যেমন হত। খাতা জমা দেবার পর টেনশন। কেমন হল। কত নম্বর পাওয়া যাবে। হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় খাতা দেখাতেন মাস্টারমশাইরা। অ্যানুয়ালে সরাসরি প্রগ্রেস রিপোর্ট। গ্রামের স্কুল। তাও হাতে লেখা রিপোর্ট পাঠানো হত বাড়িতে। নিতে গিয়ে হাত কাঁপত,

ভিজে উঠত হাতের তালু। প্রথম আবাসিক এসেছেন। ঘর দেখতে গেছেন। কী জানি কেমন লাগবে! যদি পছন্দ না হয়? যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলে বসেন? ভদ্রমহিলা, মনে হল, একটু ঠোঁটকাটা।

বসে থাকতে থাকতেই রাস্তার দিকে নজর গেল বিমানের। লোকজন প্ল্যাটফর্ম ধরে এসে রেলিং-এর ফাঁক গলে যাওয়া-আসা করে বলে, ওটাই আসার একমাত্র পথ তা তো নয়! গাড়ি যাওয়ার রাস্তা কাছেই, লেভেলক্রসিং এখান থেকে হাঁটা পথে মিনিট তিন-চার। সেখানেই গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলেন নিশ্চয়। দেখা গেল দুই ভাই দু'পাশে, মাঝখানে চেয়ারে বসিয়ে দু'জন মুটে গোছের মানুষ ধরে ধরে নিয়ে আসছে এক অশীতিপর বৃদ্ধকে। চিনতে দেরি হল না বিমানের, জগদীশ ভদ্র।

জগদীশকে দেখে একসঙ্গে তিনটে চিন্তা মাথায় এল বিমানের। প্রথম : যাক নিশ্চিন্ত! দু'জনেই এসে গেলেন। দ্বিতীয় : এ যে ঘোরতর অসুস্থ মানুষ। হেঁটে আসতেও পারেন না। তাঁরা বৃদ্ধাবাস খুলেছেন, নার্সিংহোম তো নয়? ম্যানেজ করতে পারবেন তো?

তৃতীয় যে চিন্তাটা শেষ অবধি প্রথম দু'টো চিন্তাকেই সরিয়ে দিয়ে জায়গা করে নিল, সেটা হল, এতক্ষণে সত্যিকারের এক বৃদ্ধের আগমন হল তাঁদের আবাসে। এক বৃদ্ধ, যাঁর সর্বাঙ্গে জরার নিশ্চিত স্পর্শ; এক বৃদ্ধ, যাঁর অবয়বে মৃত্যুর অমোঘ ছায়া। ভাবনাটা মাথায় আসতেই বিমর্ষ হয়ে গেলেন বিমান।

কিন্তু চিন্তা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। জগদীশকে মাটিতে নামিয়েছে দুই মুটে। হাঁপাচ্ছে। দুই ছেলে এ দিক ও দিক তাকাচ্ছেন। বিমান এগিয়ে গেলেন।

কোথায় নিয়ে যাব বাবাকে?

আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।

পিন্টুর সঙ্গে পরামর্শ করে আগেই একটা জিনিস স্থির করেছিলেন বিমান। পুরুষ আবাসিকরা থাকবেন একতলায়, মেয়েরা দোতলায়।

আলাদা আলাদা থাকাই ভাল। সিকিওরিটিরও একটা ব্যাপার আছে।

বলেই দেখলেন, চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে আছে পিন্টু। হয়তো ভাবছে, দাদা-বউদি কি এখনও...? তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বিমান বলেছিলেন, না, মানে কন্ট্রোভার্সি যত এড়ানো যায় ততই ভাল।

এখন আশ্বস্ত হলেন ভেবে যে, জগদীশকে বয়ে বয়ে দোতলা অবধি তুলতে হবে না।

গেটের মুখেই পিন্টুর সঙ্গে দেখা। অলকাকে ঘর দেখিয়ে নেমে আসছিল।

জগদীশের মুখোমুখি হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিমান ওর মুখে দেখতে পেলেন বিরক্তি। উদ্বেগও। কথা না বলে ওদের নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

ফিরে আসতে আসতে বিমান ভাবছিলেন, বয়েসকে ভেবেছেন, মৃত্যুকেও চিন্তার মধ্যে এনেছেন। কিন্তু অসুস্থতা, জড়তা, বৈকল্য, অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকা, বার্ধক্যের এই দিকটা বড় ভয়ঙ্কর। জগদীশ বার্ধক্যের আর একটি মাত্রা সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেন বিমানকে।

খুব তাড়াতাড়িই বেরিয়ে এল পিন্টু। সঙ্গে জগদীশের ছোট ছেলে।

পিন্টু উত্তেজিত হলে হাত নেড়ে কথা বলে।

আপনাদের আগেই বলেছিলাম, অসুস্থ মানুষকে এখানে রাখা মুশকিল। এটা নার্সিংহোম নয়।

উনি অসুস্থ কে বলল? দিব্যি কথাবার্তা বলেন, হাঁটা-চলা করেন...

দেখতে পাচ্ছি দু'পাশ থেকে দু'জন চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে এলেন আর বলছেন হাঁটা-চলা করেন? আমরা কি অন্ধ?

এতখানি রাস্তা, আসতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়েন যদি তাই চেয়ারের বন্দোবস্ত। আপনি অবুঝের মতো করছেন।

আমি সাফ সাফ বলে দিলাম, ওনার দেখভালের জন্য হয় আপনারা লোক রাখুন, নইলে আমরাই লোক রাখব, তার চার্জ জগদীশবাবুর সঙ্গে আমরা জুড়ে নেব।

আলোচনাটা কোন দিকে মোড় নিত বলা মুশকিল, তার আগেই বড় ছেলে বেরিয়ে এলেন।

আপনাদের এখানে তো কমোড নেই, বাবা বাথরুম করবেন কী করে? উনি বসতে পারেন না।

বিমান এগিয়ে গেলেন, ঠিক আছে, ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। আজকাল চেয়ার কমোড পাওয়া যায়। খবর দিয়ে দিচ্ছি, কল্যাণী থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই কেউ এনে দেবে।

পিন্টু গজগজ করছিল। গাড়ি থেকে একে একে জিনিসপত্র এনে রাখছিলেন জগদীশের ছেলেরা। বিমান ডাকলেন পিন্টুকে।

প্রথম দিনেই অত ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের দরকার কী? অ্যাডভান্স তো নেওয়াই আছে। কাটতে শুরু করে দে। মাসের শেষে বিল ধরিয়ে দিলেই হবে। কথাবার্তা বড় ছেলের সঙ্গে বলিস, ওর তবু চোখের চামড়া আছে।

তুমি জানো না দাদা! প্রথম দিনেই খোলাখুলি কথাবার্তা বলে না নিলে

ভবিষ্যতে এক পয়সাও ঠেকাবে না। এ সব লোককে আমি হাড়েহাড়ে চিনি।

একটা বাক্স ঢোকাতে গিয়ে দরজার পাল্লায় ঠোকা খেল মুটে। হাঁ হাঁ করে তেড়ে গেল পিন্টু।

কোনও রকমে জগদীশকে তাঁদের জিম্মায় রেখে যেমন এসেছিলেন তেমনি দ্রুত বিদায় নিলেন জগদীশের দুই ছেলে।

অলকা নামলেন অনেক পরে। হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছেন। হালকা প্রসাধনও করেছেন বলে মনে হল, সঙ্গে বোনঝি।

বিমান বসেছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ঘর পছন্দ হল?

হাসলেন অলকা। বললেন, কিছু কিছু অসুবিধে আছে। বাথরুমটা দূরে, ঘরে ওয়ার্ডরোব নেই, একটু রুম-ফ্রেশনার ছড়িয়ে দিলে ভাল হত। কিন্তু তেমন কিছু নয়। মানিয়ে নেওয়া যাবে। তা ছাড়া আমার কাছ থেকে সাজেশনও নিতে পারেন আপনারা। নতুন তো! অভিজ্ঞতা কম।

কৃতজ্ঞ হলেন বিমান।

নিশ্চয়ই, আপনার সুচিন্তিত মতামত আমাদের কাজে লাগবে।

তবে, গলা নামালেন অলকা, আপনাদের এই দ্বিতীয় বোর্ডার আপনাদের ভোগাবে। এ তো ঘাটের মড়া! আগে অন্তর্জলি যাত্রায় ফেলে আসত, আজকাল বৃদ্ধাশ্রমে দেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে। ছেলেগুলোকে দেখলেন না? পালাতে পারলে বাঁচে!

কী জবাব দেবেন ভাবছেন, অলকা নিজেই বললেন, আপনি বসুন, ওকে ছেড়ে আসছি।

স্টেশনের রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বোনঝিকে বিদায় জানালেন অলকা। খুব সহজ, যেন এখানটা তাঁর নিজের, বহু দিনের চেনা এমনি ভাব। বিমানের কাছে এসে বললেন, এখানকার প্লাসপয়েন্ট হচ্ছে নিরিবিলি, গাছপালা-ঘেরা, অথচ, সামনেই স্টেশন থাকায় প্রাণচঞ্চল। এমন জায়গা সত্যিই দেখা যায় না। বাগানটা হয়ে গেলে চমৎকার দেখাবে।

বিকেল হয়ে আসছিল। শীতকালের বেলা, ঝপ করে ফুরিয়ে যায়। পিন্টু এসে বলল, দাদা, ব্রতর কাল সকালেই ক্লাস, আমারও অফিস। আমরা এবার যাই?

প্রণাম করে একে একে চলে গেল ওরা। অলকা উঠে গিয়েছিলেন। পাম্প করে জল তুলছিল জগু। টুনি বাল্বগুলো জ্বলছিল-নিবছিল। কাল খুলে নিয়ে যাবে ডেকরেটার-এর লোক। কয়েকটা প্লেট পড়েছিল ইতস্তত। কুকুর, জটলা করছিল।

ভেতরে যেতে গিয়ে থমকালেন বিমান। ভাল করে দেখলেন। তাঁদেরই তো বাড়ি। কত স্মৃতি মিশে রয়েছে এই বাড়িতে। বাবা-মায়ের স্মৃতি, শৈশবের-বাল্যের-যৌবনের স্মৃতি। এবারে যুক্ত হবে বার্ধক্যের স্মৃতি।

বৃদ্ধরা থাকতে আসবে এই বাড়িতে, শেষ বেলার সঙ্গী করে নেবে এই আবাসকে।

আর তিনি?

১৪

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল।

এই একটা মাস ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলেন বিমান। খানিকটা প্রয়োজনে। রোজই কিছু না কিছু কাজ আটকে গিয়েছে, বিমান থাকায় জট খুলে গেছে সঙ্গে সঙ্গেই। আবার পুরোটাই প্রয়োজনে তাও নয়। একটা নতুন জিনিস জন্ম নিচ্ছে, তাকে সামনে দাঁড়িয়ে দেখা, তত্ত্বাবধান করার, অন্য আকর্ষণ আছে। বিমান নিজেকে সরিয়ে নিতে পারছিলেন না।

এক মাসে অনেক কিছু ঘটতে দেখলেন বিমান। শিখলেনও অনেক কিছু। জগু ভূতের বেগার খাটতে পারে, কোনও কিছুতেই ওর ক্লান্তি নেই। তবু জগুর ঘাড় থেকে চাপ কমাতে লোক নিতে হল। একজন জমাদার রাখতে হল। তার কাজ বাড়িটা সাফসুতর রাখা, জমা ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা। তার চেয়েও বড় জগদীশের মলমূত্রের দায়িত্ব নেওয়া। ওই ব্যাপারটায় জগদীশের নিয়ন্ত্রণ নেই, যত্র-তত্র করে ফেলেন। ভজুয়া, এখানেও বিহারি জমাদার পাওয়া যায় জানতেন না বিমান, রোজ সকালে নাকে কাপড় বেঁধে জগদীশের ঘর পরিষ্কার করে। ফিনাইল ছিটোয় আর শাপশাপান্ত করে। সুখের কথা, ভজুয়ার বাণী উপলব্ধি করার মতো মস্তিষ্কের জোর জগদীশের অবশিষ্ট নেই।

ঘরের কাজ বাইরের কাজ দু'টোই সামলানো জগুর একার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। বাজার হাট রান্নাবান্না অবধি ঠিক ছিল। কিন্তু কাপড়-জামা কাচা বাসন মাজা জল তোলার জন্য একজন ঠিকে লোক রাখতেই হল। যেহেতু দু'জন মহিলা থাকছেন, একজন মাসিকে রাখাই সাব্যস্ত হল। যে এল তার নাম মায়া, বয়েস চল্লিশের আশপাশে, শক্তসমর্থ গড়ন, কটকট করে কথা শোনায়,

তবে কাজকর্ম পরিষ্কার। দুপুরের খাওয়াটা দিতে হল, তবে মাইনেপত্রর চাহিদা তেমন কিছু নয়।

প্রথম মাসটা খুচরো জিনিসপত্র দোকান থেকে এনে কাজ চালানো হচ্ছিল। মাসের শেষে দেখা গেল তাতে খরচ বেশি হচ্ছে। কাছাকাছি লালার দোকান সবার পরিচিত। সেখানে মাসকাবারি বন্দোবস্ত করা হল। যখন যা দরকার জগু গিয়ে নিয়ে আসবে। মাসের শেষে দাম মিটিয়ে দেওয়া হবে।

বাজারের ক্ষেত্রে সেটার অসুবিধা আছে। কাঁচা সবজিটা রোজকার বাজার না করলেই নয়। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ রাখার জন্য একটা ফ্রিজের প্রয়োজন। পিন্টু চেয়েছিল সেকেন্ড হ্যান্ড ছোট ফ্রিজ কিনতে। বিমান আপত্তি করলেন। প্রথম কথা, সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস সহজেই বিগড়ে যায়। এখানে চাইলেই সারানোর লোক পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় কথা, আবাসিকের সংখ্যা ভবিষ্যতে বাড়বেই। তখন ছোট ফ্রিজ ফেলে দিয়ে একটা বড় কিনতে হবে। হায়ার পারচেজ-এ বড় ফ্রিজই নেওয়া হল, মাসে মাসে শোধ দিতে হবে।

দুধ, ডিম, মাছ সব কিছুর জন্যই লোক ঠিক করা হল। এখানেও ডেয়ারির প্যাকেট পাওয়া যায়। গোয়ালাদের ব্যবসা কি উঠে গেছে? জগু শুধরে দিল, গোয়ালারা ডেয়ারিতেই দুধ বেচে আসে। মাংস নিয়ে চিন্তা ছিল। কে দেবে? মুরগী না খাসি? কতখানি লাগবে? এক মাসেই বোঝা গেল, তিনজনের একজনও মাংস পছন্দ করেন না। এ মাস থেকে মাংসের পাট তুলেই দিয়েছেন বিমান।

হ্যাঁ, আর একজন যোগ হয়েছেন লিস্টে, কুন্তলা মিত্র। অলকার সঙ্গে নামের মিল আছে, মিল পদবিতেও। যখন জামাই মেয়ে এসে কথাবার্তা বলে গেল, বিমানের ধারণা ছিল, অলকার মতোই বৃদ্ধা কেউ হবেন। প্রথম দিন দেখে বুকের মধ্যে ধক করে উঠেছিল বিমানের। ইনিও বৃদ্ধা?

অবশ্য, অলকার সঙ্গে অন্য ব্যাপারেও মিল সামান্যই। অলকা আগে বৃদ্ধাবাসে থেকে এসেছেন, এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত। সহজে মানিয়ে নিয়েছেন। বিভিন্ন ব্যাপারে বিমানকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্যও করেন।

কুন্তলা একেবারেই উল্টো। চুপচাপ। ঘরেই কাটান বেশিরভাগ। বইটই পড়েন, গান শোনেন। খাওয়ার সময়টা শুধু বড় ঘরে নামেন। টিভি দেখার অভ্যেস নেই। নিজে থেকে কোনও কথা বলেন না। জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেন। সেটাও খুব মাপা।

কুন্তলা কারও সম্বন্ধেই কোনও মন্তব্য করেন না। কোনও অভিযোগ নেই।

অলকা নিজের মতামত ভালভাবেই প্রকাশ করেন। জগদীশকে নিয়ে তাঁর ক্ষোভের অন্ত নেই। মুখে না বললেও বিমান বুঝতে পারেন. কুন্তলাকেও তিনি ভেতরে ভেতরে পছন্দ করেন না।

বিমানের অবশ্য কিছু যায় আসে না। একটা বয়েসের পর মানুষের বন্ধুত্ব পাতাতে দেরি লাগে। তা ছাড়া সব মানুষ সমান মিশুকে হবে তারও কোনও মানে নেই। সবাইকে নিয়ে বিমানকে চলতে হবে। বরং মানুষ বিচিত্র চরিত্রের হলেই বেশি আকর্ষক। মানুষের চেয়ে চমৎকার দ্রষ্টব্য আর কী আছে?

জগদীশ কিন্তু সত্যিই সমস্যায় ফেলে দিলেন।

মস্তিষ্ক থাকা না থাকায় কতখানি ফারাক হয়ে যায়, জগদীশকে দেখলে বোঝা যায়। এক কালে নাম করা বিজ্ঞানী ছিলেন, বিদেশের অজস্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। এখন তাঁর একটা বাক্যও সম্পূর্ণ হয় না, কথা শুনতে গেলে ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে যেতে হয়, কী বলতে চান অধিকাংশ সময়ই বোঝা যায় না। খাইয়ে দিতে হয়, স্নান করিয়ে দিতে হয়, জামাকাপড় পরিয়ে দিতে হয়। তাঁর ঘরের দরজা সব সময় খোলা রাখা হয়। কিছুক্ষণ পরপরই কেউ না কেউ গিয়ে দেখে আসে।

ফোনের অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে, এখনও লাইন আসেনি। স্টেশনের গায়েই একটা এসটিডি বুথ। বুথের ছেলেটা ভাল। দরকারি মেসেজ থাকলে পৌঁছে দেওয়া, ফোন এলে ডেকে দেওয়া, এমন কী লিখে রেখে, পরে জানিয়ে দেওয়া সবই করে।

জগদীশের ব্যাপারটা পিন্টুকে বলতেই হয়েছিল, ও ফোনে জগদীশের ছেলেদেরও ডেকে পাঠিয়েছিল। নিজেও এসেছিল কথাবার্তা বলতে।

এ ভাবে তো পারা যাচ্ছে না। বলুন কী করবেন? নিয়ে যেতে পারেন। আমরা কিছু মনে করব না। এ মাসের টাকা কেটে রেখে বাকিটা ফেরত দিয়ে দেব।

রতীশ, বড় ছেলে এসেছিলেন। ছোট এলে হয়তো বাকবিতণ্ডা হত। রতীশ ও রাস্তায় গেলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কেঁদে ফেললেন।

পিন্টুর হাত ধরে বললেন, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অ্যাডভান্স-এর টাকাটা তো রয়েছে। ওটা থেকেই অ্যাডজাস্ট করে ক'দিন চালান। আমি দেখছি। কথা দিচ্ছি, সামনের মাসেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

পিন্টু ফিরে গেল। জগদীশও রয়ে গেলেন আগের মতোই। এর মধ্যে এক দিন পেট খারাপ করল জগদীশের। ঘর নোংরা করে যা-তা করলেন। ভজুয়া

যাচ্ছেতাই মুখ করল। ভয় পেয়ে বিমান ডাক্তার হালদারকে খবর দিলেন।

ডাক্তার সাত্যকি হালদার। বয়েস হয়েছে। জেনারেল প্র্যাক্টিসনার হিসেবে এককালে নাম ছিল। এখন পসার কমে গিয়েছে। পিন্টুই মাসকাবারি বন্দোবস্ত করে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু দেখে ওষুধপত্র দিয়ে গেলেন। নুন চিনির সরবত খাওয়াতে বললেন। না ধরলে, স্যালাইন দিতে হবে সে ভয়ও দেখালেন।

জগদীশকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাওয়ানোও এক সমস্যা। চোয়ালের ফাঁকে চামচে গুঁজে হাঁ করিয়ে জল খাইয়ে চাঙ্গা করা হল জগদীশকে। বিকেলের দিকে পেট ধরল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল সকলের।

সেই থেকে জগদীশের খাবার দাবারের ব্যাপারে আরও সতর্ক হয়েছেন বিমান। সহজপাচ্য ছাড়া কিছু দেওয়া হয় না। জগুর কষ্ট বাড়ল। দু'রকম রান্না করতে হয়।

এর মধ্যে রমেন একদিন এসে উপস্থিত। সঙ্গে বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক। বিমান অবাক হয়েছিলেন। দোতলার বারান্দাটাই হয়েছে বসবার ঘর। সেখানেই ডেকে বসালেন। জগুকে চা আনতে বললেন।

তারপর কী খবর?

এই এলাম, আপনাদের হোম কেমন চলছে দেখতে।... আলাপ করিয়ে দিই, ইনি সন্তোষদা, সন্তোষ বসাক, এলাকার গণ্যমান্য মানুষ।

হাতজোড় করে নমস্কার করলেন বিমান।

সবে শুরু হয়েছে। এখনও অনেক সমস্যা। বৃদ্ধাশ্রম হবে মনে করে তো তৈরি হয়নি বাড়িটা। ঠাকুরদা বানিয়েছিলেন, বাবা কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই বাড়িয়ে গেছেন। একটা ঘর লাগবে, পশ্চিমের বারান্দাটা ঘিরে নাও; দোতলা একতলা করার অসুবিধে, ঠিক আছে, গোয়ালঘরটা ছোট করে রান্নাঘর বানিয়ে নাও, এই ভাবে কাজ হয়েছে এত কাল, সমস্যায় পড়ছি আমরা। তা ছাড়া, বুঝতেই পারছ, এ সব চালাতে ব্যবসাবুদ্ধি লাগে। বুড়ো হয়েছি, আর পোষায়?

সন্তোষ মুখ খুললেন। জর্দাপানে মুখ বোঝাই, কথার অর্ধেকই জড়িয়ে যায়।

আমরা আপনাদের বাড়িকে জমিদার বাড়ি বলে জেনে এসেছি ছোট থেকেই। আমার বাবা কাকারাও তাই বলতেন। বড় পুকুরের পশ্চিমপাড়ে আমাদের তাঁত ছিল ক'ঘর, আপনার খেয়াল আছে?

বিমানের মনে পড়ল। এই বসাকরা পাকিস্তান থেকে এসেছিল। বাংলাদেশ হয়নি তখনও, পাকিস্তান। শুকনো মুখে ঘোরাফেরা করেছিল ক'দিন। শেষ অবধি বাবাই বসার জায়গা করে দিয়েছিলেন। তাঁত বসিয়েছিল ওরা। ফি বছর

পুজোয় বাবাকে নতুন ধুতি আর মাকে তাঁতের শাড়ি দিয়ে যেত। পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াত। দাম দিতে গেলে জিভ কেটে বলত, অধর্ম হবে। সেই বসাকদের বাড়ির ছেলে সন্তোষ। সন্তোষ কি তাঁত বুনতে জানেন?

জিজ্ঞেস করে ফেললেন বিমান, তাঁতগুলো চলে?

হাসলেন সন্তোষ—পাগল? কবে তাঁত উঠে গেছে। ওখানে জিম বসিয়েছি। ছেলেরা আসে। সাওনা আছে। আসুন না এক বার?

হাঁ হয়ে গেলেন বিমান। জিম? সাওনা? এক দিন বাজারে হাঁটতে হাঁটতে বিউটি পার্লার দেখে চমকে উঠেছিলেন। সে দিনের বিস্ময়টা আজকের চেয়ে কম ছিল।

বিমানকে নিরুত্তর দেখে, সন্তোষই শুরু করলেন, আপনারা দু'ভাই এসে বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করলেন। আমরা অবাকই হয়েছিলাম। ভালও লেগেছিল। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেন, এটাই তো স্বাভাবিক।

বিমান কিছু বলার জন্য হাঁ করেও মুখ বন্ধ করে ফেললেন। আড়চোখে রমেনের দিকে তাকালেন। রমেন বোধহয় ধরতে পারল। সন্তোষের দিকে তাকিয়ে বলল, ওনাদের কিন্তু আসলে ওল্ড এজ হোম করার প্ল্যান ছিল না।

সন্তোষ ঘুরে তাকালেন, কী রকম?

ওনারা চেয়েছিলেন, সামনের জমিটা বিক্রি করে দেবেন। খদ্দেরও দেখা শুরু করেছিলাম। তখনই পল্টু এসে পড়ে। ভয় দেখায়। বলে মার্কেট কমপ্লেক্স করবে। ওকে ছাড়া কাউকে জমি দেওয়া চলবে না। প্ল্যান বদলান ওঁরা। তার পর এই হোম।

রমেনের কথাগুলো মিথ্যে নয়। কিন্তু কোনও কোনও সময় সত্য শুনতে ভাল লাগে না। বিমান সহজ করার চেষ্টা করলেন, রিটায়ার করার পর ভাবছিলাম, প্রপার্টিটা পড়ে রয়েছে। কিছু একটা করলে হয়। প্রথমে সামনের জমিটা বিক্রির কথা ভাবা হয়েছিল। পরে দু'ভাই মিলে ঠিক করলাম, তার চেয়ে বৃদ্ধাবাস করলে মানুষের উপকার হয়।

খুব ভাল করেছেন। এ দিকে এ জিনিস একটাও নেই। ইনভেস্টমেন্ট হিসেবেও খারাপ নয়। ফিনান্সিয়াল ভায়াবিলিটি কেমন? টাকা উঠছে?

আড়ষ্ট হয়ে গেলেন বিমান। কী জানতে চাইছেন সন্তোষ? কত লাভ হচ্ছে?

সতর্ক ভঙ্গিতে বিমান বললেন, এখন অবধি পুরোটাই লস। তিনজন বোর্ডার। যেটুকু আদায় হয়, তার দু'গুণ খরচ। একজন বোর্ডার অসুস্থ। তাঁর

চিকিৎসার খরচ, অ্যাটেনডেন্ট। পুরো ভর্তি হলে, হয়তো খরচ উঠে আসবে। তাও খুব কিছু প্রফিট হবে বলে মনে হয় না।

উঠে দাঁড়ালেন সন্তোষ। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে, যেন মনে পড়ে গেছে এই ভাবে বললেন, পল্টু আপনাদের রিলেটিভ, কিন্তু ও একটা হারামির বাচ্চা। ভাল কাজ ও সহ্য করতে পারে না। মানুষের ভালর জন্যে কিছু করছেন ও চাইবে না। বাগড়া দিতে আসবে। ভয় পাবেন না। আমরা আছি। অসুবিধা হলেই খবর দেবেন। রমেন আছে। ওকে জানাবেন, তা হলেই হবে।

দরজা অবধি গিয়ে ফিরে এলেন।

বাবা বেঁচে থাকতে আপনাদের কথা বলতেন। বলতেন জমিদারবাড়ি আশ্রয় না দিলে, তাঁত বসানোর জায়গা না দিলে, তোদের হাত ধরে ভিক্ষা করতে হত। সুযোগ পেলে উপকারের প্রতিদান দিস। বাবা নেই, কিন্তু আমি তো আছি। চিন্তা করবেন না।

সন্তোষ বেরিয়ে গেলে সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন বিমান। উপকার পেয়ে সেটা মনে রাখা, প্রতিদান দেওয়া, এ সব এখনও আছে? মোহনপুর সত্যিই বিচিত্র জায়গা।

জগু এসে বলল, খাবার দেওয়া হয়েছে, সবাই অপেক্ষা করছে।

লজ্জা পেলেন বিমান। অন্যান্য দিন তিনিই সবার আগে পৌঁছন। আজ দেরি করে ফেললেন।

ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ এই দু'টোই একসঙ্গে খাওয়া হয়। লাঞ্চে ভাত, ডাল টেবিলে রাখা থাকে। যে যার মতো প্লেটে নিয়ে নেন। ভাজা, তরকারি, মাছ, চাটনি এগুলো জগু সার্ভ করে। ডিনার-এ কেউই বেরুতে চান না। জগু যার যার ঘরে পৌঁছে দেয়। জগদীশ অবশ্য কোনও দিনই বেরন না। জগুই যা করার করে। ওর পক্ষেও আর সম্ভব হচ্ছে না। একজন আয়া রাখা হবে সামনের মাস থেকে।

কুন্তলা চুপচাপ থাকেন। সৌজন্যসূচক দু'একটা কথাবার্তা, যা না বললেই নয়, বলেন। বাংলা ইংরেজি দু'খানা কাগজ আসে। দু'টোই পড়েন। খাবার ঘরটা নীচে। সেখানেই টিভিটা রাখা হয়েছে। দুপুরে খেতে বসে সিনেমা বা সিরিয়াল চালিয়ে দেওয়া হয়। অলকার সিলেকশন, কুন্তলা নিজের মত প্রকাশ করেন না। বিমান ওঁদের সঙ্গেই খেতে বসেন। কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না জেনে নেন। রান্না ঠিকঠাক হয়েছে কি না তদারকি করেন। দরকার হলে জগুকে ডেকে নির্দেশ দেন।

অলকার সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক সহজ হয়ে এসেছে। যেন বড় যৌথ পরিবারের বড়দিদি, অলকা সেই ভাবেই খবরদারি করেন। বিমানের ভুলত্রুটি দেখলে ধমক দিতেও ছাড়েন না।

আজকেও খাবার ঘরে তাঁকে দেখেই অলকা বললেন, লেট মার্ক পড়ে গেল। দু'দিন লেট হলেই ছুটি কাটা যাবে, জানেন তো?

হাসতে হাসতে বিমান বললেন, ঠিক আছে। সিএল-এর অ্যাপ্লিকেশন করে দেব। কাকে অ্যাড্রেস করে লিখতে হবে?

আমাকে, বুকে আঙুল দিয়ে দেখালেন অলকা।

লাউয়ের তরকারি হয়েছিল বড়ি দিয়ে। খেতে গিয়ে বিমান দেখলেন, ঝালে ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে যাচ্ছে। জগুকে ডাকলেন. এটা কী করেছিস? বলেছি না ঝাল কম দিবি?

জগু মাথা চুলকে বলল, বড়দিদি যে বললেন, ঝাল দিতে!

আপনি বলেছেন? অলকার দিকে ফিরলেন বিমান।

হ্যাঁ, আমরা বরিশালের লোক। ঝাল খেতে ভালবাসি। রোজ আলুনি খেতে ভাল লাগে না, আজ জগুকে বলেছিলাম অল্প ঝাল দিতে। এত বেশি দিয়ে দেবে, বুঝতে পারিনি।

বিমান আড়চোখে দেখলেন, কুন্তলাও নেড়েচেড়ে তরকারির বাটি সরিয়ে রাখলেন। অলকা খেলেন চেটেপুটে। রান্না নিয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করলেন না কুন্তলা। অন্য দিনের মতোই খাওয়া শেষ হলে, উঠছি তা হলে বলে, হাত ধুয়ে ঘরে চলে গেলেন।

দুপুরে ঘুমোন না অলকা। বিমানও অভ্যেস করে ফেলেছেন। দু'জনে দোতলার বারান্দায় বসলেন। মুখে লবঙ্গ ফেলে বিমান বললেন, আজ কিন্তু ছাড়ছি না। আপনার গল্প শুনব।

মিষ্টি হাসলেন অলকা।

আমার গল্প? আমি একটা সাধারণ মেয়ে। আমার আবার গল্প কী?

সাধারণ মেয়েকে নিয়েই তো যত গল্প।

আপনি কি আমার গল্প লিখবেন?

বলা যায় না, লিখতেও পারি।

অলকাকে দেখে মনে হচ্ছিল, আজ উনি বলার মুডে আছেন। টোকা দিলেই টুপটাপ গল্প ঝরবে।

আমি বরিশালের মেয়ে, কথাটা পুরো সত্যি নয়। আমার জন্ম বরিশালে,

কিন্তু দেশ ভাগের আগেই বাবার সঙ্গে আমরা এ দিকে চলে আসি। মা আগেই মারা গিয়েছিলেন, এক দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, দাদা, আমার ওপরের দিদি আর আমি, তিনজনের হাত ধরে বাবা বর্ডার পেরিয়ে চলে এল। আমি ক্লাশ টেন-এ পড়ি, দিদি পড়া ছেড়ে দিয়েছে, দাদা ঢাকায় কলেজ-এ পড়ছিল। উদ্বাস্তু হয়ে আসা কতখানি কষ্টের তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। ওই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে এখনও চেষ্টা করি ভুলে যেতে।

স্টেশনে ট্রেন এল। লোকজন নামল। প্ল্যাটফর্ম খালি করে চলেও গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন অলকা, আবার শুরু করলেন।

যা সম্বল ছিল তাই দিয়ে দিদির বিয়ে দিল বাবা। ম্যাট্রিক পাশ করে আইএ পড়লাম মনীন্দ্র কলেজ থেকে। হিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বেথুনে ভর্তি হলাম। দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেল শিবপুরে। বাবা প্রাইভেট কম্পানিতে কাজ নিয়ে আজ গৌহাটি, কাল শিলচর করে বেড়াতে লাগল। আমাকে একা বাড়িতে রেখে যাওয়া নিরাপদ নয়, তাই বেথুনে ভর্তি করা হল। হোস্টেল জীবনের সেই শুরু।

কথা থামিয়ে আনমনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন অলকা, তার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, গুনছিলাম। আপনাদের এই হোমকে যদি হোস্টেল ধরি, তা হলে সাত সাতখানা হোস্টেল ঘোরা হয়ে গেল আমার।

এ লাইনে তা হলে আপনাকে বিশেষজ্ঞ বলে ধরা যায়? পরিস্থিতি হালকা করার জন্যে বিমান বললেন।

মলিন হাসি ঠোঁটে এনে অলকা বললেন, বলতে পারেন। গ্র্যাজুয়েশন করতে না করতেই বাবা মারা গেলেন, আমাকেও হোস্টেলেই থেকে যেতে হল। বেথুন কলেজের হোস্টেল থেকে বিদ্যাসাগর স্ট্রিটে মেয়েদের হোস্টেল। তখন দিনরাত টিউশনি করি, আর কাজের ধান্দা করি। এমএ-তে ভর্তি হবার চেয়েও তখন মনে হয়েছিল চাকরি পেতে গেলে কয়েকটা কোর্স করে নেওয়া বেশি জরুরি। তখন অবশ্য কলকাতা জুড়ে এত সব সেন্টার গজিয়ে ওঠেনি। বেহালার দিকে একটা এনজিও সবে তৈরি হচ্ছিল, সেখানেই জয়েন করলাম। রেসিডেনশিয়াল পোস্ট। হোস্টেলটা ছাড়তে হল।

বিকেল হয়ে আসছিল। শীত চলে যাচ্ছে। তবু বিকেল এখনো ছোট। জগু জিজ্ঞেস করল চা দেবে কিনা। অলকা বললেন, একটু পরে দিলেও হবে।

হ্যাঁ, বেহালার দিকে একটা এনজিও...

মন দিয়ে কাজ করছিলাম জানেন? অনাথ ছেলেমেয়ে, তাদের মানুষ করা,

লেখাপড়া শেখানো, একটা চ্যালেঞ্জ! একদম অন্য রকম। ভীষণ জড়িয়ে গিয়েছিলাম। ষোলো বছর কাটিয়েছি ওই সেন্টারে।

ছাড়লেন কেন?

ছেড়েছি কি নিজের ইচ্ছায়? ভয়ে। যত দিন যেতে লাগল, ভেতরের ব্যাপারগুলো আস্তে আস্তে চোখে পড়ে যেতে লাগল। বিদেশি গ্র্যান্ট, তার নয়ছয়। কয়েকজন ট্রাস্টির দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ানো। শেষকালে বুঝে ফেললাম স্কুল, ট্রেনিং সেন্টার এ সবই আইওয়াশ। আসল ব্যবসা অ্যাডপশন। নিঃসন্তান বাবা-মার সন্ধান দিত এজেন্ট, দাম ঠিক হত। বেশিটাই পকেটে যেত দু'তিনজন ট্রাস্টির। প্রতিবাদ করব, সে ক্ষমতা ছিল না। আমি যে জেনে গিয়েছি সেটাও ওরা টের পেয়ে গিয়েছিল। ভয় হল, কবে না আমারও মহেশ্বরীর দশা হয়।

মহেশ্বরী?

মেয়েদের হোস্টেলে মেট্রন ছিল। একদিন পুকুরে ভেসে উঠল ওর বডি। সবাই জানল, স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা গেছে।

স্নান করতে গিয়ে নয়?

মধ্যরাতে কেউ পুকুরে স্নান করতে যায়?

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিমান, তারপর?

তার পর আর কী? কত জায়গায় কাজ করলাম! স্কুলে পড়ালাম, দু'-একটা এনজিওতে সার্ভিস দিলাম। এই করতে করতেই বুড়ো হয়ে গেলাম। ভাবছি কী করব, তখনই ভাইপোদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম, আপনার সেই দাদার কী হল?

দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ইন্দোরে চাকরি নিয়ে চলে গেল, বিয়ে করল, বাবাকে খবর অবধি দিল না। বাবার যে কাজ করতে করতে হার্ট অ্যাটাক, কারণ তো দাদাই।

তা এত দিন পরে ভাইপো? হঠাৎ দেখা?

আমিও তা-ই ভেবেছিলাম। পরে বুঝলাম, ওরা বহু দিন ধরেই আমার ট্র্যাক রেখে গেছে। আদর আপ্যায়ন করে বাড়িতে নিয়ে তুলল। দাদার প্যারালিসিস, আপনাদের ওই জগদীশবাবুর চেয়েও অবস্থা খারাপ, ছেলেরাই সর্বেসর্বা। মাসখানেক খুব পিসিপিসি করার পর, পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করিয়ে এক দিন ঝোলা থেকে বেড়াল বের করল। এক রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর একটা কাগজ বের করে বড় ছেলে বলল, পিসি এখানটায় সই করে দাও। তত দিনে

আমিও হাজার ঘাটের জল খেয়ে সেয়ানা হয়ে গেছি। বললাম, চশমা হারিয়ে গেছে, কী লিখতে কী লিখে ফেলব, কাগজখানা দিয়ে যাও, চশমাটা খুঁজে পাই, সই করে রাখব। বিশ্বাস করে কাগজখানা রেখে গেল ভাইপো। আমিও পর দিন কাক-ডাকা ভোরে কাউকে কিছু না বলে একমাত্র সম্বল প্যাঁটরাটা বগলে করে সোজা সরোর বাড়ি।

সরো?

ওই যে আমাকে দিয়ে গেল যে, আমার বোনঝি, দিদির মেয়ে। সরোর বর ইনকাম ট্যাক্সের উকিল। কাগজখানা বের করে দিতেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ল। খোঁজখবর নিয়ে বলল, কিছু টাকা আমাব নামে জমা রয়েছে, বাবা মারা গেলে অফিস থেকে দিয়েছিল! আমাকে নমিনি করে রেখেছিল বাবা, সেটাই হাতাবার জন্যে দাদার ছেলেরা ফন্দি করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তাই অত আদরের ঘটা।

তারপর?

চা দিয়ে গিয়েছিল জগু। চুমুক দিয়ে অলকা বললেন, তিন বছর হয়ে গেল হোম-যাপন, এ বারে আপনাদের এখানে।

টাকা তো এক দিন ফুরিয়ে যাবে, তখন?

বিমানের দিকে তাকিয়ে হাসলেন অলকা, সেটাও ভেবে রেখেছি। সামনেই স্টেশন, রেললাইন। এত সুবিধা আর কোথায় আছে বলুন?

১৫

লুচি, ছোলার ডাল, ছানার ডালনা, খাসির মাংস আর পায়েস। সন্ধেবেলা অবশ্য কেক কাটা হয়েছে। দমনের বন্ধুরা এসেছিল। তার মধ্যে স্পেশাল গেস্ট নেহা। কাছেই একটা মালটিস্টোরিড কমপ্লেক্স-এ থাকে, পার্কে খেলতে গিয়ে আলাপ। নেহা কোঠারি! শাওন ফিসফিস করে বলল, ওর গার্লফ্রেন্ড। কেক কাটা হলে, সাড়ে তিন বছরের নেহা দমনকে খাইয়ে দিল। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল, হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।

লুচিটা দমনের চয়েস। আজকাল কথা বলতে শিখলেই বাচ্চারা পছন্দ অপছন্দ জানাতে থাকে। দমন সাফসাফ বলেছিল, লুচি না হলে আমি কিন্তু খাব না। দিউর পছন্দ ছানা। অবশ্য ছানা এখন পনির। পিউ মাটনের ভক্ত। যেদিন

অর্পণ আর শাওন নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল, সে দিনই জিজ্ঞেস করেছিল, মাটন করছ তো কাকিমা? শাওন চুলের ঝুঁটি ধরে আদর করে বলেছিল, হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ। তুই যাচ্ছিস, আর মাটন হবে না, তাই হয়? পায়েস অবশ্য নন্দিতাই বানিয়েছিলেন। এখনকার মেয়েরা পায়েস রান্না করতে জানে না। দুধটাকে মেরে ক্ষীর না করলে পায়েসের টেস্ট হয়? পায়েস নিয়ে অপুর আপত্তি ছিল। কী দরকার হাঙ্গামায় গিয়ে? ছানার পায়েস কিনে আনলেই তো হয়! নন্দিতা আপত্তি করেছিলেন, জন্মদিন পায়েস ছাড়া পালন করতে নেই। অর্পণ কথা বাড়ায়নি। অনেক কষ্টে রাজি করিয়ে মাকে নিয়ে এসেছে। পায়েসের ইস্যুতে মা বেঁকে বসলে অনুষ্ঠানটাই মাটি। পরে বললেও আর আসতে চাইবে না।

পায়েস খেয়ে সবাই আহা উহু করছিল। দমন তো চেয়ে চেয়ে খেল। আর খেলে পেট ব্যথা করবে বলে ওর মা শেষ পর্যন্ত টেনে তুলে হাত ধোয়াতে নিয়ে গেল। কষ্ট পেয়েছিলেন নন্দিতা। ওইটুকু খেলে পেট ব্যথা করবে? থাক। যার ছেলে সেই বুঝবে।

বন্ধুরা প্রেজেনটেশন নিয়ে এসেছিল। তাদেরও প্রত্যেককে রিটার্ন গিফট দেওয়া হল। এটা নতুন অভিজ্ঞতা। টফি, বেলুন, খেলনা। নাম লেখা প্যাকেটে রাখা ছিল আলাদা করে। নেহার জন্য স্পেশাল গিফট্। কী আছে ভরসা করে জিজ্ঞেস করতে পারলেন না। গম্ভীর হয়ে যদি দমন উত্তর দেয়, ওটা আমাদের প্রাইভেট ব্যাপার, কী জবাব দেবেন? চুপচাপ দেখে গেলেন। বন্ধুরা বিদায় নিলে গাম্ভীর্য বিসর্জন দিয়ে মার কোলে উঠে দমন বলল, ঘুমু। শাওন ওকে নিয়ে শোবার ঘরে ঘুম পাড়াতে গেল।

দমনের চলে যাওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছিল পিউ আর দিউ। ঝাঁপিয়ে পড়ল উপহারগুলোর ওপর। মোড়ক খুলে বের করে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। বেশিরভাগই বাচ্চাদের খেলনা। কিছু জামাকাপড়, একটা বড় ক্যাডবেরি। একটা জিনিসের ওপর দু'জনেরই চোখ গিয়ে পড়ল। কমপিউটার। স্কুলে কম্পিউটার আছে, শিখতে হয়। খেলনা কম্পিউটারখানা নিয়ে দু'জনে ছোট ঘরে ঢুকে গেল।

ফাল্গুনের শেষ। এবারে তাড়াতাড়িই গরম পড়ে গেল। সারাদিন রান্নাবান্না আয়োজন হইহই। ঘাম প্যাচপ্যাচ করছিল, ঘাম সহ্য হয় না নন্দিতার। শাওন খেতে বসার জন্য ডাকাডাকি করছিল, নন্দিতা বললেন, তোমরা বোসো, আমি গায়ে জল ঢেলে আসি।

রাত্তিরে স্নান করে জ্বরজারি না বাধালেই নয়?

তপুর কথায় জবাব না দিয়ে নিজের তোয়ালেখানা বের করে বাথরুমে ঢুকে গেলেন নন্দিতা।

শাওয়ার খুলে নীচে দাঁড়িয়ে শান্তি হল। তোয়ালেতে গা মুছে শাড়ি পরতে পরতে তপু-অপুর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল।

জন্মদিন ওদেরও পালন করা হত। তপুর জন্ম আষাঢ় মাসে, অপুর অঘ্রানে। ওদের মনে থাকত না। নন্দিতা স্নান করিয়ে নতুন জামা পরিয়ে দিতেন। ফিবছর নতুন শার্টপ্যান্ট কেনার সামর্থ্য থাকত না। জামা না হলে গেঞ্জি। তবে যা হত, দু'জনেরই একসঙ্গে হত। রোজকার মতো স্কুলে যেত দুই ভাই। রাত্তিরে একসঙ্গে ভালমন্দ খাওয়া। পায়েসটা হতই। একটা স্পেশাল কিছু। ইলিশ মাছ ভালবাসত তপু। চেষ্টা করতেন ইলিশ কিনে আনতে। ডিমভরা ইলিশ। অপু ছিল ডিমের পোকা। বেশি পেঁয়াজ দিয়ে এক পাশ নরম অমলেট পেলে অপু আর কিছুই চাইত না। তাই অপুর জন্মদিনে অমলেটটা ছিল বাঁধা। তেমন খরচ পড়ত না বলে কোনও বছরই মিস হত না।

কেক কাটা ছিল না, বন্ধুবান্ধবের হই হট্টগোল ছিল না, 'হ্যাপি বার্থ ডে' গান ছিল না। ঘরের এক কোনায় তিনজনে মিলে জন্মদিন পালন করতেন। সে সব অপু-তপুরা মনে রেখেছে?

আসলে, সন্তানের জন্মদিন বাবা-মায়েদের কাছে উৎসব। মনে পড়ে যায়, প্রথম জন্মদিনটার কথা, যেদিন ওদের পৃথিবীতে এনেছিলেন। সেই যন্ত্রণা, যন্ত্রণার নিবৃত্তি, একটা নতুন প্রাণ, তার পুষ্টি, বৃদ্ধি। আনন্দে আলোকিত পৃথিবী। সময়ের স্রোত ঠেলে প্রথম সেই দিনটি তার আলো পৌঁছে দেয় প্রতিটি জন্মদিনের শুভ মুহূর্তে।

ভাবতে গিয়েই শক্ত হয়ে গেলেন নন্দিতা। বাবা-মা। সন্তানের জন্মদিন প্রতিটা বাবা-মায়ের কাছেই এক বিশেষ দিন। শুধু মা নয়, বাবাও। অপু-তপুর বেলায়? কতগুলো জন্মদিনে উপস্থিত ছিল তাদের বাবা? কর গুনতে শুরু করলেই শেষ হয়ে যায়। কীসের রাগ? কোথায় জ্বালা?

চোখ করকর করে উঠল নন্দিতার। চোখে জল ছিটিয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

অন্যদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। শাওন খাবার সাজিয়ে বসেছিল। বসতে বসতে নন্দিতা বললেন, তুমি আবার আমার জন্যে বসে আছ কেন? খেয়ে নিলেই তো পারতে।

শাওন হাসল, আমার অনেক রাতে খাওয়া অভ্যেস। মাঝেমাঝে ওই নিয়েই

আপনার ছেলের সঙ্গে লেগে যায়। ও খাওয়া সেরে রাত জেগে লেখাপড়া করে। আমার আবার খাওয়া শেষ হলেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে, জেগে থাকতে পারি না।

অপু সোফায় বসে টিভি চালিয়ে কী যেন দেখছিল। বন্ধ করে এ দিকে ফিরল।

ওর স্বভাব একদম বাবার মতো। বাবা মনে আছে, এক বার খেতে খেতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল?

খেতে খেতে? কথা বলতে বলতে, বই পড়তে পড়তে, টিভি দেখতে দেখতে। অথবা কিছু না করেই। সাধা ঘুম। যখন চাইত তখনই ঘুমিয়ে পড়তে পারত। ইদানীং অবশ্য ঘুম কমে গিয়েছিল মানুষটার।

তপু বলল, বাবা কোনও কিছু নিয়েই টেনশন করত না। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার সিট পড়েছিল হুগলিতে। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং দিইনি। পরীক্ষা শুরু দুপুরে। সকাল সকাল বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে উঠে বসলাম। দশটার মধ্যে পৌঁছে যাব। কিছুদূর গিয়েই ট্রেন থেমে গেল। আধ ঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট-এক ঘণ্টা কেটে গেল। ট্রেন আর নড়ে না। বাবা দিব্যি চোখের ওপর কাগজ চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। শেষে থাকতে না পেরে ঠেলে তুললাম। চোখ রগড়ে উঠে বাবা বলল, কী হল, পৌঁছে গেছে? আমার তখন কান্না পেয়ে গেছে। পরীক্ষা দিতে পারব কি না ঠিক নেই। চোখের জল সামলিয়ে বললাম, এক ঘণ্টা হয়ে গেল ট্রেন দাঁড়িয়ে, যদি না যায়? বলতে বলতেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। বাবার খুব একটা হেলদোল হল বলে মনে হল না। নামল। কোথায় যেন গিয়ে খোঁজ নিয়ে এল। গা হেলিয়ে বসে ভেঙে যাওয়া ঘুমটা জোড়া দিতে দিতে বলল, চিন্তা নেই, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে, নতুন ইঞ্জিন লাগলেই ট্রেন চলতে শুরু করবে।

ট্রেন চলেছিল? ঠিক সময়ে পৌঁছেছিলে?

মিতালির উদ্বেগটুকু উপভোগ করল তপু। বলল, হ্যাঁ, আরও ঘণ্টাখানেক সময় পার করে নতুন ইঞ্জিন লাগার পর ট্রেন ছেড়েছিল। সাড়ে বারোটা নাগাদ ট্রেন পৌঁছল। নেমে স্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে ঢুকল বাবা। আমার তখন খাওয়াদাওয়া মাথায়। উপায় নেই। বাবা যখন নিয়ে গেছে, খেতেই হবে। খালি পেটে পরীক্ষা দেয়? শ্বেতকেতুর গল্প পড়িসনি? আমার মাছ আর দইয়ের ভাঁড় নিজেই শেষ করল। অবশেষে রিক্সা নিয়ে পরীক্ষার হলে যখন পৌঁছলাম পরীক্ষা শুরু হতে মিনিট দশেক বাকি।

পরে বলোনি ওনাকে?

বলেছি। বাবা নিরুত্তাপ। বলেছিল, আরও আগে পৌঁছলেই বরং ক্ষতি হত। টেনশন করতিস। বই খুলে দু'পাতা পড়ার চেষ্টা করতিস। তার চেয়ে এ-ই ভাল। হলে পৌঁছলি, ঢুকে গেলি। দেখিস, এই পেপারটাতেই সবচেয়ে ভাল করবি।

ভাল করেছিলে?

ওই পেপারটায় কত পেয়েছিলাম তা জানি না, জয়েন্ট-এ পেপার-ওয়াইজ নম্বর টাঙিয়ে দেয় না। তবে চান্স পেয়েছিলাম যখন, খুব খারাপ হয়নি নিশ্চয়।

অপু এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। তপুর বলা শেষ হওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছিল বোধহয়।

আসলে সুখী হতে গেলে মানুষকে স্বার্থপর হতে হয়। অন্যের কথা ভাবলে সুখী হওয়া যায় না। বাবা ছিল অসম্ভব স্বার্থপর। তাই মনের সুখে যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তে পারত।

মাংসর বাটিটা সরিয়ে রাখলেন নন্দিতা। রাত্তিরে মাংস খেলে পেট গরম হয়। অপুর কথা শুনছিলেন কান খাড়া করে। তাঁর কথাগুলোই বলছে অপু।

কেউ কোনও কথা বলছে না দেখে অর্পণ ধরে নিল কথাগুলোয় সকলেরই সায় আছে।

দাদা তো ডাক্তারি পড়তে কলকাতা চলে গেল। বাজার করার দায়টা অটোমেটিকালি আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। আমার তখন ক্লাশ নাইন। এখনকার ক্লাশ নাইনের ছেলেদের মায়েরা দুধ খাইয়ে দেয়, বাবা ডাব আর সন্দেশ হাতে পরীক্ষার হলে দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের সে প্রশ্নই ছিল না। ভাবলে অবাক লাগে, কিন্তু তখন কোনও প্রশ্ন না করেই রোজ সকালে থলে হাতে বাজারে যেতাম। মা টাকা পয়সা দিয়ে বুঝিয়ে দিত কী কী আনতে হবে। বাজার থেকে ফিরে রান্নাঘরে জিনিসপত্র রেখে দেখতাম বাবা ক্ষুর হাতে দাড়ি কামাচ্ছে, কিংবা কাগজ পড়ছে, কিংবা পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরে স্কুলে যাচ্ছে।

আশ্চর্য মানুষ! সাধু-সন্ন্যাসী গোছের। শাওন বলল।

অথবা পাগল। মিতালির মন্তব্য।

সেয়ানা পাগল, দাঁতে দাঁত চেপে বলল অপু। আমার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার দিন, মনে আছে, অঙ্ক পরীক্ষা ছিল, বাবাকে বাজার করতে বলেছে মা। গজগজ করছে বাবা, উপায় নেই, বাজারে যেতেই হবে। পরীক্ষার ঘন্টা খানেক বাকি, বাজার এনে ফেলল, কয়েকটা চারাপোনা। মার মাথায় আগুন,

এই মাছ কখন কুটব, কখন রান্না করব, আর কখনই বা খেতে দেব? ছেলেটা কি না খেয়ে যাবে? বাবা অম্লান বদনে বলেছিল, না হয় একটু দেরি করেই যাবে।

মা কী বলেছিলেন?

শাওনের প্রশ্নের জবাবে নন্দিতার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে অর্পণ বলল, মা আর কী বলবে? যা বলার আমিই বলেছিলাম।

কী বলেছিলে?

বাবাকে কিছু বলিনি। মাকে বলেছিলাম, বাবাকে মাছের ঝাল রান্না করে দাও মা, আমার খেয়ে যাবার দরকার নেই।

বাবা কিছু বলেননি?

হ্যাঁ। বাবা বলেছিল, পরীক্ষায় কিছু কম নম্বর পেলেই জীবনের সব শেষ হয়ে গেল, এ ধারণা ভুল। পরীক্ষা ছাড়াও অনেক কিছু করার আছে। স্কুল মাস্টারি পেশা হিসেবে খারাপ নয়।

হেসে উঠেছিল শাওন, ঠিকই তো বলেছিলেন, দেখো কেমন খেটে গেল কথাগুলো। সেই মাস্টারিই করতে হল। স্কুলে না হয়ে, কলেজে এই যা।

আগুন ঝরানো চোখে অর্পণ বলল, যেটুকু হয়েছি নিজের ক্ষমতায় হয়েছি। বাবার কথা শুনে চললে স্কুল মাস্টারি কেন, পিওনের চাকরিও জুটত না।

শাওন বলল, গলা থেকে কৌতুকের সুরটুকু না তুলেই, নিজের নিজের করছ? শুধু নিজের ক্ষমতায় কেউ অত দূর যেতে পারে? মায়ের স্যাক্রিফাইসটা উড়িয়ে দিচ্ছ কেন? মা-ও তো যথেষ্ট করেছিলেন।

অর্পণ শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। বলল, অনেক কিছু করতে পারতাম। বিদেশে যেতে পারতাম, ম্যানেজমেন্ট পড়তে পারতাম। সমাজে সফল বলতে যা বোঝায় তা-ই হতে পারতাম। কিছুই হওয়া হল না। একটা পাতি হয়ে রইলাম, অর্ডিনারি, মিডিওকার। সব বাবার জন্যে।

শাওন গম্ভীর হল, যথেষ্ট হয়েছে, এ বার থামো তো! দাদাও তো এক বাড়ি, এক পরিবেশ থেকেই মানুষ হয়েছেন। দাদা বেরিয়ে আসেননি? নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি? যারা পারে, তারা সব কিছুর ভেতর থেকেই পারে। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয় না।

শাওনের কথার জবাব এল মিতালির কাছ থেকে।

কী সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা বলছ শাওন? তোমাদের দাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত? প্রতিষ্ঠা একে বলে? প্রতিষ্ঠা মানে একটা ডেজ়িগনেশন, কিছুটা

সম্মান? তোমরা জানো, দাদার সংসার কীভাবে চলে? কতখানি ত্যাগ তোমার বউদিকে করতে হয়? মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কতগুলো রাত না ঘুমিয়ে কাটান তোমার দাদা?

শাওন ছাড়ল না, প্রতিষ্ঠা শব্দটাই আপেক্ষিক মিতালিদি। কেউ দশ হাজারে সন্তুষ্ট, কেউ লাখেও সন্তুষ্ট নয়।

নাক দিয়ে একটা শব্দ ছাড়ল মিতালি, হুঁঃ, লাখ। লাখ টাকা একসঙ্গে দেখেছে তোমার দাদা? আমাদের বাড়ি থেকে সাপোর্ট না থাকলে...

হাত শুকিয়ে যাচ্ছিল। উঠে হাত ধুয়ে এসে বসলেন নন্দিতা। বাটি থেকে ভাজা মৌরি নিয়ে মুখে ফেললেন।

শুনলেন, মিতালি বলছে।

অপুর রাগটা মিথ্যে নয়। ওর রাগের যথেষ্ট কারণ আছে। নিজেকে দিয়ে আমিও বুঝতে পারি। তোমাদের দাদার যতটুকু ক্ষমতা তাই দিয়ে সব হয় না। অপুরও তাই। সামর্থ্য ও প্রয়োজনের মধ্যে খানিকটা ফাঁক থেকেই যায়। চাইলেই বাবা ফাঁকটা পূরণ করতে পারতেন। ওনাদের প্রপার্টিটা বিক্রি করলেই যথেষ্ট টাকা পাওয়া যেত। নিজের জন্য যথেষ্ট রেখেও যদি...

কিন্তু বাবা যে বললেন, কী সব গোলমাল হয়েছে, জমি বিক্রি করা যাবে না। বৃদ্ধাশ্রম বানাচ্ছেন দুই ভাই।

শাওনকে থামিয়ে দিল মিতালি, বাজে কথা। প্রপার্টি বিক্রি করতে চান না বলেই অজুহাত খুঁজছেন। আসলে মানুষ হিসেবে উনি অত্যন্ত স্বার্থপর। নিশ্চয়ই ভাবলেন, ওই প্রপার্টি শেষ বয়েসের সম্বল, বিক্রি করে খালি হাতে ছেলেদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ছেলেরা যদি না দেখে? অসুখ-বিসুখ করলে যদি চিকিৎসা না পান। তার চেয়ে বৃদ্ধাশ্রম করলে ফিক্সড ইনকাম থাকবে, আবার প্রপার্টিটাও যেমনকে তেমন রইল, প্রয়োজনে বিক্রি করা যাবে।

শাওন বলল, ভাবনাটা কি ভুল? তাঁর সম্বন্ধে ছেলেদের কী অ্যাসেসমেন্ট তা নিশ্চয়ই জানা আছে তাঁর। সেইজন্যেই রিস্ক নেননি।

মিতালি শাওনের কথায় আমল না দিয়ে বলল, অদ্ভুত চরিত্র! এত বয়েস হল, তবু জাগতিক বস্তুর প্রতি এত মোহ, এত লোভ!

আর থাকতে পারলেন না নন্দিতা। কতটুকু দেখেছে এরা মানুষটাকে? ছেলেরাও কতটুকু পেয়েছে বাবাকে? স্কুলের চৌহদ্দি পার হয়েই পড়াশুনা করতে চলে গিয়েছে কলকাতায়। তিনি, তিনিই একমাত্র জানেন সেই মানুষটাকে। ক'টা বছর পার হলেই তাঁদের সম্পর্কের বয়েস অর্ধ শতাব্দী পার

হয়ে যাবে। সমালোচনা, তিরস্কার এ সবে হক তাঁর একার। অন্যরা যা করছে, তা নিছক অনধিকারচর্চা।

একটা প্রতিবাদ গলা দিয়ে উঠে আসতে চাইছিল। শিক্ষা, সভ্যতা এবং সম্ভ্রমবোধ তাঁকে নিরস্ত করল। চোখ ভিজে এল। ভেতরে পিউ আর দিউ কম্পিউটার নিয়ে খেলছিল। দু'বোনের গলা শোনা যাচ্ছিল। কাউকে কিছু না বলে টেবিল থেকে উঠে ঘরে চলে গেলেন নন্দিতা। দুই নাতনির পাশে বসে বললেন, আমাকে খেলাটা একটু শিখিয়ে দেবে?

১৬

পিন্টুর বাড়ি গিয়ে দেখলেন থমথমে অবস্থা। ব্রত দু'টো পরীক্ষা দিয়েছিল, তার রেজাল্ট বেরিয়েছে। কোনওটাতেই ব্রতর নাম নেই। ওর বন্ধুবান্ধব, যারা একসঙ্গে প্রিপারেশন নিয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই কোয়ালিফাই করেছে। কেন ব্রতর হল না, পিন্টু-মিত্রা তো বুঝতে পারছেই না, ব্রতর নিজেরও মাথায় ঢুকছে না। ভীষণ মুষড়ে পড়েছে ব্রত। একা ঘরে দরজা জানলা বন্ধ করে বসে আছে। কথাবার্তা বন্ধ। বাড়িতে শ্মশানের স্তব্ধতা।

আজকাল কমপিটিটিভ পরীক্ষাগুলোও সব গটআপ জানো দাদা?

পিন্টুর এই কথার কোনও উত্তর হয় না। ওপর নীচ ঘাড় নাড়ালেন বিমান। চায়ের কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে ভান করলেন, যেন ওই জন্যেই কথা বলতে পারছেন না।

মিত্রা পকোড়া বানাচ্ছিল, একটা প্লেট সামনে রেখে বলল, আজকাল পড়াশুনো, পরিশ্রম এ সবের কোনও দাম নেই। আসল কথা হচ্ছে কে কতখানি লাইন করতে পারল। সব চ্যানেলে হচ্ছে।

টাকাপয়সার ব্যাপারও আছে, পিন্টু গম্ভীর গলায় বলল।

আসল কথা কী জানো, মিত্রা আঁচল দিয়ে টেবিলের একপাশে একটু জল পড়েছিল, মুছে নিতে নিতে বলল, আজকাল খাতাটাতা যারা দেখে, কলেজের অধ্যাপকরা, তারাও তো এইভাবেই ঢুকেছে। দেখো গিয়ে ও যা লিখেছে, পড়ে মানেই বুঝতে পারেনি।

'বিন্দুর ছেলে'। দেশটা শরৎচন্দ্রের সময় থেকে একটুও এগোয়নি। সব সময় সুবিচার হয় না সত্যি, সমস্ত অধ্যাপক-শিক্ষক মন দিয়ে খাতা দেখেন না

সেটাও মিথ্যা নয়। কিন্তু কোনও ছাত্র যথাযথ উত্তর লিখেছে, অথচ ভাল নম্বর পায়নি, এটা মেনে নিতে তাঁর এখনও কষ্ট হয়।

খাওয়াদাওয়ার পর আসল কথাটা পাড়ল মিত্রা। ওই বৃদ্ধাশ্রম ছাড়া ব্রতর তা হলে আর কিছু রইল না।

কথাগুলো বুকের মধ্যে ধাক্কা মারল বিমানের। দু'টো কারণে। বৃদ্ধাশ্রম যে আসলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আশ্রয় নয়, সবকিছুর আড়ালে রয়েছে ব্যবসা, সেই সত্যটা নগ্নভাবে বেরিয়ে এল মিত্রার কথায়। দ্বিতীয় কারণ, বিমান নন, বিমানের ছেলেরাও নয়, মোহনপুরের সমস্ত উদ্যোগই যে মূলত পিন্টুর ছেলে ব্রতর ভবিষ্যতের সংস্থান সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মিত্রা।

বিমানের অপরাধবোধ হতে থাকল। মনে হল, তাঁর সন্তানদের তিনি বঞ্চিত করেছেন। পৈতৃক সম্পত্তিতে তাদেরও যে অধিকার ছিল তাকে অস্বীকার করেছেন তিনি। পিন্টু তা করেনি। মিত্রা তো নয়ই। ওরা এটাকেই শেষ ও একমাত্র ভরসা বলে আঁকড়ে ধরেছে। তাঁর ছেলেদের প্রয়োজন নেই, এই বলে নিজেকে বুঝিয়েছেন বিমান। কিন্তু প্রয়োজনটা কি আপেক্ষিক নয়? আর প্রয়োজন যে আছে, সেটাও তো তারা প্রকাশ করেছে তাঁর কাছে? তিনিই তাদের প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দেননি।

সোজা কথা খোলাখুলি বলাই ভাল। বিমানের ওপর ভরসা করে ব্যবসা চালাচ্ছে পিন্টু ও মিত্রা। তাই বিমান ব্যবসার হাল-হকিকত ওদের জানানোর প্রয়োজন মনে করলেন।

একটা কথা জানিয়ে রাখি। এখনও পর্যন্ত বৃদ্ধাশ্রম যা চলছে, তাতে লাভের সম্ভাবনা খুবই কম। সুতরাং চালিয়ে যেতে গেলে ভাবনাটাও সেই-ভাবে করতে হবে। না হলে অলটারনেটিভ কিছু ভাবতে হবে।

কেন? এত ওল্ডএজ হোম, প্রফিট না হলে সে গুলো চলছে কী করে? কেউ তো চ্যারিটি করছে না?

এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না বিমান। বিমানের মনে হল, মালিকের সামনে হিসেব পেশ করেছেন তিনি। মালিক ক্ষুব্ধ। তাঁর সততার বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। হিসাবে কারচুপি করে নিজের জন্য কিছু সরাচ্ছেন কি না সেটাই পিন্টু জানতে চাইছে।

গলা নামিয়ে ধীরে বিমান বললেন, অবিশ্বাস হলে হিসাবপত্র পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

মিত্রা আঁচ করেছিল। পিন্টুর কথায় তিনি যে আঘাত পেয়েছেন ওর বুঝতে দেরি হল না।

তাড়াতাড়ি দু'জনের মাঝে এসে পড়ল, ও'রকমভাবে বলছ কেন? দাদা না থাকলে তোমার হোম এত দিনে লাটে উঠে যেত। ঝগড়াঝাঁটি না করে কথাবার্তা বলো, দেখো কোথায় অসুবিধে হচ্ছে, কী করলে অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায়।

বিমান লক্ষ করলেন, মিত্রা বলল, তোমার হোম।

ঠিক আছে, পিন্টু স্বর নরম করল, বলো কোথায় কোথায় খরচ বেশি হচ্ছে?

বিমান নিস্পৃহ গলায় বললেন, এ পর্যন্ত বোর্ডারের সংখ্যা তিন। খাওয়ার লোক পাঁচজন। আরও দু'জন একবেলা খাচ্ছে। তার মানে সঠিক হিসেব মতো ছ'টা মুখ। আমদানি ন' হাজার টাকা। রান্নার খরচ, গ্যাস-ইলেকট্রিসিটি-জল, কাজের লোকের মাইনে, সমস্ত কিছু মিটিয়ে আমি যা হিসেব করেছি তাতে প্রায় কিছুই থাকছে না। হিসাবটা নিয়ে আসিনি। যে কোনও দিন চলে এসো। পাই-পয়সা মিলিয়ে দেব।

গুম হয়ে বসে রইল পিন্টু। মিত্রারও মুখ শুকনো। টিভিটা চালানো ছিল। সিরিয়াল-টিরিয়াল হচ্ছিল বোধহয়। মিত্রা সুইচ অফ করে এল। ব্রতর ঘরের লাইট অফ। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কান পেতে আওয়াজ শোনার চেষ্টা করল মিত্রা। তার পর 'ঘুমিয়ে পড়েছে' বলে সামনে এসে বসল।

একটা সলিউশন বের করতে হবে। ঘরের থেকে পয়সা বের করে তো হোম চালানো যাবে না। তা ছাড়া, যেটুকু সঞ্চয় ছিল সমস্তই এর পেছনে ঢালা হয়েছে।

মিত্রার কথায় যুক্তি ছিল। বিমান নড়েচড়ে বসলেন, বললেন, তবে খরচের একটা বড় অংশ কনস্ট্যান্ট। মানে, বোর্ডার বাড়লেও সেই খরচটা বাড়বে না। যেমন কাজের লোকদের মাইনে, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি। আমার মনে হয় আরও বোর্ডার এসে গেলে ব্রেক-ইভন হয়ে যাবে। প্রফিটের মুখ দেখতে শুরু করব আমরা।

কতজন হলে সেটা সম্ভব?

আরও তিনজন।

পুরো ভরে গেলে, আরও ঘর তৈরি করে নেওয়া যায় অবশ্য, প্রভিশন রয়েছে। প্রতিটা ঘরে একাধিক বোর্ডারও রাখা যেতে পারে।

মিত্রার কথায় আপত্তি করলেন বিমান, না। তা হলে অনেকেই ছেড়ে চলে যাবে। বৃদ্ধ বয়েসে প্রিভেসিটা মূল্যবান।

আমার তো উল্টোটা মনে হয়। একা একাই বেশি মন খারাপ হয় বৃদ্ধদের।

জবাব দিলেন না বিমান। যে জবাবটা মুখে এসে গিয়েছিল, বৃদ্ধ কে, আমি না তুমি, সেটা বলে দিলে মিত্রার ভাল লাগত না।

পিন্টু বলল, আর একটা জিনিস আমার মাথায় ঘুরছে। তোমরা ভেবে বলো করা সম্ভব কি না। মাসে মাসে টাকা নেওয়ার থেকে একবারে থোক টাকা নিলে কেমন হয়?

যেমন?

ধরো, বোর্ডারদের বলা হল, এক লক্ষ টাকা দিয়ে ভর্তি হয়ে যান। মাসে মাসে আর টাকা দিতে হবে না।

তিন বছরেই তো টাকা উঠে যাবে।

আবার উল্টোটাও সত্যি। তিন বছরের আগে কেউ মারা গেলে তার টাকাটা আমাদের থেকে গেল।

সেক্ষেত্রে শর্ত করে নিতে হবে, কেউ আগে মারা গেলে টাকা ফেরত পাবেন না।

বিমান ভাবছিলেন। বললেন, এই শর্তে সবাই রাজি নাও হতে পারে। বিশেষ করে যারা বেশি অসুস্থ। তাদের আত্মীয়স্বজন ভাবতেই পারে, পুরো টাকাটাই জলে যাবে। তার চেয়ে দু'টো সিস্টেমই চালু থাক। যার যেটা পছন্দ।

মিত্রা বলল, তাই ভাল। আমাদেরও সুবিধা। কোনটায় লাভ বেশি, দু'টো সিস্টেম চালু থাকলে বুঝতে পারা যাবে। তবে ওই যে বললেন, অনেকেই থোক টাকা দিতে রাজি হবে না, আমার মনে হয়, সেটা ঠিক নয়। একবারে এক লক্ষ টাকা দেওয়া, মাসে মাসে টাকা গোনার চেয়ে অনেক ভাল।

বেশ গরম পড়ে গিয়েছে। বাইরের ঘরে মাটিতে বিছানা পেতে শুতে পছন্দ করেন বিমান। অনেক রাত অবধি এ পাশ ও পাশ করলেন। উঠে জল খেলেন। দু'তিন বার বাথরুমে গেলেন। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পর দিন ট্রেনে ফেরার পথে মনের মেঘ অনেকটাই কেটে গেল, দু'জন উজ্জ্বল তরুণের সঙ্গে আলাপ হয়ে।

রোববার সকালের আপ ট্রেন, ফাঁকা। পেছনেই বসেছিল ওরা। প্রথমে খেয়াল করেননি, ওদের কথাবার্তায় মন দিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। ঘুরে কাছাকাছি গিয়ে বসলেন।

একটা জিনিস ক্লিয়ার করে নে অনিরুদ্ধ। আমরা কিন্তু ভিখিরিদের হোম করিনি। ভিখিরি আর ডেস্টিটিউট আলাদা।

তফাতটা কীসের? ভিখিরিরা কি ডেস্টিটিউট নয়?

ভিখিরিদের অনেকেই ভাল রোজগার করে। কেউ কেউ সংসার প্রতিপালন করে। তা ছাড়া, হোম-এ রাখলেও তারা অনেক সময় থাকতে চায় না। লুকিয়ে ভিক্ষা করতে বেরয়। এদের সঙ্গে সোশ্যাল ডেস্টিটিউটদের ফারাক আছে।

আমি বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছিস না নয়, বুঝতে চাইছিস না। সোশ্যাল ডেস্টিটিউট বলতে আমরা বোঝাচ্ছি সেই সব বৃদ্ধাদের যাদের বাড়িতে জায়গা নেই। ছেলেমেয়ে রাখতে চাইছে না, স্বামী মারা গেছেন, অথবা তিনকুলে কেউ নেই। ভিখিরিদের সঙ্গে এঁদের চরিত্রগত তফাৎ আছে। আরও একটা কথা। এঁদের কিছুই নেই, তবু আত্মসম্মানবোধ আছে। এঁরা নিজেদের ভিখিরি ভাবতে ভালবাসেন না। ভিখিরিদের সঙ্গে রাখলে সেই সম্মানবোধে আঘাত লাগবে।

বিমানের ভাল লাগছিল দু'জনকে। যেচে আলাপ করলেন।

কিছু মনে করবেন না। আপনারা কি কোনও হোম চালান?

হ্যাঁ, আপনি?

আমার নাম বিমান, বিমান মুখোপাধ্যায়। আমরাও দুই ভাই মিলে মোহনপুরে একটা বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করেছি। আপনাদের কথাগুলো কানে এল, তাই আলাপ করতে এলাম।

ওদের একজন হাতজোড় করে বলল, নমস্কার। আমি গৌতম, গৌতম রায়। ও আমার বন্ধু, অনিরুদ্ধ। আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমরা দুঃস্থ বৃদ্ধাদের জন্য একটা হোম চালাই। বেশি দিন হয়নি, কিন্তু এর মধ্যেই আমরা ছ'জন বুড়িমা পেয়ে গিয়েছি। আসুন না একদিন, ভাল লাগবে।

গৌতম পেশায় গবেষক, অনিরুদ্ধদের পৈতৃক ব্যবসা। দু'জনেই ঝকঝকে ছেলে। কেন, কীসের নেশায় দুই তরুণ দুঃস্থ বৃদ্ধাদের নিয়ে পড়ল, মাথায় ঢুকছিল না বিমানের। কিন্তু একটা ভাললাগা মৃদু সৌরভের মতো আচ্ছন্ন করছিল বিমানকে।

ঠিকানা নিলেন বিমান। ওরাও বিমানের নাম ঠিকানা লিখে নিল। নৈহাটিতে ওরা নেমে যেতে বিমান দেখলেন, গতরাতের অস্বস্তিটা ভিতর থেকে উধাও।

ফিরে পর পর দু'সপ্তাহে দু'জন নতুন বোর্ডার পাওয়া গেল। তার মধ্যে একজন পিন্টুর সাজেশন মতো থোক টাকার শর্তেই রাজি হলেন। রাতারাতি অ্যাকাউন্ট-এ লক্ষ টাকা জমা পড়ে গেল। নড়েচড়ে বসলেন বিমান। ভেঞ্চারটা এ বার বোধহয় সাকসেসফুল হতে চলেছে।

অবাক করলেন জগদীশের দুই ছেলে। পরের মাসের গোড়ায় যখন ওঁরা এলেন, এককালীন টাকা জমা দেবার প্রস্তাবটা রাখতে এমন আগ্রহ দেখালেন, মনে হল এ রকম একটা প্রস্তাবের জন্যই ওঁরা অপেক্ষা করছিলেন। পিন্টু ছিল সেদিন। ওর ব্যবসা-বুদ্ধি প্রখর। বলল, কিন্তু আপনাদের বাবার তো এক লক্ষ টাকায় হবে না। ওঁর জন্যে একজন অ্যাটেনডেন্ট রাখতে হয়। তার খরচও যোগ করতে হবে। আপনারা এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা দেবেন।

সাত দিনের মধ্যে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকার ড্রাফট এনে বিমানের হাতে জমা দিয়ে চলে গেলেন জগদীশের বড় ছেলে।

রাত্তিরে ফোন করলেন বিমান। পিন্টু ছিল না। মিত্রা ধরল। শুনেটুনে বলল, হবে না? আগের মাসেই দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে এসেছি যে!

ব্রতর জন্য কি কম পুজো দিয়েছিলে?

প্রশ্নটা আর করলেন না বিমান।

১৭

সকালে ঘুম থেকে উঠলেন অসহ্য মাথার যন্ত্রণা নিয়ে। প্রথমে ভাবলেন, আর একটু শুয়ে থাকি, জগুকে দিয়ে ওষুধ আনিয়ে খেয়ে নিই। মনে পড়ে গেল, গ্যাস বুক করতে হবে। মাসকাবারি জিনিসপত্রের লিস্টটাও দিয়ে আসতে হবে। গেল মাসে দু'একটা জিনিসের দাম বেশি ধরেছিল। এখনই ক্লিয়ার না করে এলে, এ মাসেও দাম ফেলে দেবে। জগু ছেলেটা এমনিতে ভাল, কাজেরও, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি কম। তা ছাড়া, টাকাপয়সার হিসেব একদম বোঝে না। লেখাপড়া শেখেনি, ইংরেজি পড়তে পারে না। সেটাও একটা ড্র-ব্যাক।

চৈত্রমাস শেষ হয়ে এল। প্রচণ্ড রোদের তাপ। বেরিয়ে খেয়াল হল, ছাতাটা নিয়ে আসা হয়নি। অনেকখানি চলে এসেছেন, আর ফিরে যাওয়ার মানে হয় না। বাজারে ঢুকে প্রথমে গেলেন ওষুধের দোকানে। ছেলেটা নতুন, আগে দেখেননি। বললেন, মাথা ব্যথার ওষুধ আছে? তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিল, মাথা ব্যথার ওষুধ কি একটা? ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন আছে? বিমান বুঝলেন, এর সঙ্গে তর্ক করলে ব্যথাটা বাড়বে বই কমবে না। চেনা ব্র্যান্ড-এর ওষুধ চারখানা কিনে একটু জল চেয়ে একটা খেয়ে ফেললেন। ব্যথাটা একটু কমল। গ্যাসের দোকানে নাম লিখিয়ে মুদিখানায় চললেন।

দোকানি পরিচিত, মধ্য পঞ্চাশের প্রৌঢ় মানুষ। তাঁকে দেখে উঠে এল।

কী হয়েছে? শরীর খারাপ?

তেমন কিছু নয়। সামান্য মাথাব্যথা। ওষুধ খেয়েছি, ঠিক হয়ে যাবে।

না, আপনার মুখচোখ ভাল নেই। দরদর করে ঘামছেন। ছেলেকে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি, বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসুক।

বারণ করলেন বিমান, শুনল না। রিক্সায় বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল। ভাড়াটাও দিতে দিল না।

তাঁর রিক্সা থেকে নামা, হাঁটা চলা দেখেই জগুর সন্দেহ হয়েছিল। ছুটে বেরিয়ে এল। ধরে ধরে ওপরে তুলে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিল। ফুলস্পিডে ফ্যান চালিয়ে বলে গেল, শুয়ে থাকুন, আমি ডাক্তার ডেকে আনছি।

বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন বিমান।

ঘুম ভাঙল অনেকের গলার আওয়াজে। তাকিয়ে দেখলেন, ঘরভর্তি লোক, ডাক্তারবাবু ঝুঁকে আছেন মুখের দিকে।

কেমন বুঝছেন?

একটু ভাল। কিন্তু ভীষণ মাথার যন্ত্রণা।

এই শরীর নিয়ে রোদ মাথায় করে বেরিয়েছিলেন?

কী করব? জরুরি দরকার ছিল।

আর কাউকে পাওয়া গেল না?

হাতে প্রেশার মাপার যন্ত্রটা জড়াতে জড়াতে ডাক্তারবাবু নিজের মনেই বকে যাচ্ছিলেন, বয়েসটাও তো খেয়াল রাখতে হয়! কিছু একটা হয়ে গেলে...। তবু ভাল বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে গেছে।

বিমানের লজ্জা করছিল। ভিড়ের মধ্যে জগু, অলকা, কাজের মেয়েটিকে দেখতে পেলেন বিমান। আবছা মনে হল, পেছনে কুন্তলাও। সকলেই তাঁর দিকে তাকিয়ে। চোখে উৎকণ্ঠা।

নিজেকে আড়াল করার জন্যে চোখ বন্ধ করে ফেললেন বিমান। প্রেশার মাপা হয়ে গিয়েছিল। থার্মোমিটারখানা জিভের তলায় রাখলেন ডাক্তার। বুক-পেট-পিঠ চেক করলেন। মাথার নিচে হাত দিয়ে দেখলেন ঘাড় শক্ত হয়েছে কি না।

চোখ খুললেন বিমান। ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। মুখ না দেখলে মানুষের মন পড়তে পারা যায় না। খারাপ কিছু কি না জেনে নেওয়া উচিত।

প্রেশারটা বেড়েছে। ওষুধ খাননি?

ফুরিয়ে গিয়েছিল। ক'টাদিন খাওয়া হয়নি।

প্রেশারের ওষুধ এক দিনও যেন বন্ধ না হয়, খেয়াল রাখবেন। শেষ হবার আগেই কিনে নেবেন। কোথাও যেতে হলে সঙ্গে রাখবেন।

ঘাড় নাড়লেন বিমান, শুয়ে শুয়ে যতটুকু নাড়া যায়। ডাক্তারবাবু ব্যাগ গুছোতে গুছোতে বললেন, জ্বরও এসেছে। এ দিকে ম্যালেরিয়া হয়; টাইফয়েডও। এটাই সিজন। রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে যাবে। ওঠা হাঁটা বিশেষ করবেন না। যে ওষুধটা কিনে এনেছেন, জ্বর কিংবা মাথাব্যথা বাড়লে খেয়ে নেবেন। খালি পেটে খাবেন না। খাওয়াদাওয়া হালকা করাই ভাল। দুধ পাঁউরুটি, ভেজিটেবল সুপ। চিন্তা নেই, ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু চলে যেতে প্রথম যে কথাটা বিমানের মাথায় এল, ফান্ড থেকে অনেকগুলো টাকা তাঁর চিকিৎসার জন্য খরচ হয়ে গেল। পিন্টু জানতে পারলে কী মনে করবে?

যথাসময়ে কম্পাউন্ডার এসে রক্ত নিয়ে গেল। সামান্য কিছু খেলেনও দুপুরে। নির্দেশ মতো ওষুধটাও জল দিয়ে গিলে ফেললেন। কিন্তু বিকেলের পর থেকে শরীরটা আর বশে রইল না।

জ্বর বাড়তে লাগল হু হু করে। মাথাটা ছিঁড়ে যেতে লাগল। চোখে আলো পড়লেও যেন কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছন্নভাব। সেটাই কুয়াশার মতো এক সময় চেতনাকে ঢেকে দিয়ে গেল।

ভাবনা কিন্তু থেমে রইল না। সুসংবদ্ধ চিন্তা নয়, তুলোর মতো ছেঁড়া ছেঁড়া, উড়ন্ত চিন্তাটাকে ধরে যেন মাথার মধ্যে গেঁথে নিতে হচ্ছে। বিমানের মনে হল, মৃত্যু নিয়ে অত ভাবনার কিছু নেই। মৃত্যু যন্ত্রণাহীন। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে মন শরীর থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নেয়। তাই যন্ত্রণাবোধ থাকে না। তা হলে মৃত্যু কি আনন্দময়? শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তিই কি অসীম আনন্দের দ্যোতক নয়?

মৃত্যুচিন্তাও বেশিক্ষণ অধিকার করে রাখতে পারল না বিমানকে। মনে পড়তে লাগল, ছোটবেলায় একবার টাইফয়েড হয়েছিল। ক্লোরোমাইসিটিন আসেনি তখনও। ডাক্তারবাবু আর কিছু না পেয়ে পেনিসিলিন ইনজেকশন দিতেন রোজ দু'তিনখানা করে। মস্ত ছুঁচ। ফুঁড়িয়ে ফুঁড়িয়ে শরীরের কিছু রাখেননি। জ্বর সারল। পথ্য করলেন বিমান। কিন্তু হাঁটতে গিয়ে দেখলেন হাঁটুতে জোর নেই। হামাগুড়ি দিতে হয়েছিল বেশ কিছু দিন। নতুন করে

হাঁটা শিখতে হয়েছিল। মা এ ঘর ও ঘর হাঁটাতে নিয়ে শ্বেত মনে আছে।

আর এক বার রক্ত আমাশা হয়েছিল। মেস বানিয়ে দু'তিনজন টিচার একসঙ্গে থাকতেন। ওখানে দু'বার গ্রীষ্মের ছুটি পড়ত। একবার গ্রীষ্মে, একবার বর্ষায়। চাষের সময় পনেরো দিন ছুটি দেওয়া হত। পরীক্ষার খাতা দেখতে হত বলে বাড়ি আসা হত না। বর্ষাকালে পেটের অসুখ লেগেই থাকত। সে-বারে যা হল, একেবারে ধুন্ধুমার। অন্য টিচাররা চলে গিয়েছিলেন। প্রথম দিনটা নিজে নিজেই ঘরবার করেছেন। দ্বিতীয় দিন বিছানা ছেড়ে উঠবেন, সে অবস্থাও রইল না। ছাত্ররা খবর পেয়ে জিপ ভাড়া করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল।

সে দিনও এমনি ঘোরের মধ্যে টলতে টলতে বিছানা অবধি গিয়েই পড়ে গিয়েছিলেন। নন্দিতা বলেছিল এটা খেয়ে নিন, না হলে আরও কাহিল হয়ে পড়বেন।

আবার একই কথা বলল নন্দিতা। মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করলেন বিমান। নন্দিতা কবে থেকে আপনি-আজ্ঞে করা শুরু করল?

ঘোলাটে চোখ খুললেন বিমান। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। জগু, প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে। পেছনে কুন্তলা।

গলাটা কুন্তলার, খেয়ে নিন, না হলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বেন।

বিমান ইঙ্গিতে বললেন, খিদে নেই, ইচ্ছে করছে না।

ইচ্ছে না করলেও খেতে হবে। অসুখের সময়ই ভালমন্দ খেতে হয়। জগু চমৎকার চিকেন স্টু বানিয়েছে। হাঁ করুন! আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

মাথার কাছে বসলেন কুন্তলা। টুলের ওপর রাখলেন খাবারের প্লেটটা। গলায় একটা তোয়ালে জড়িয়ে দিলেন। মাথাটা উঁচু করে একটু একটু করে খাইয়ে দিতে লাগলেন।

কষ্ট হচ্ছিল। খাবার নীচে নামতে চাইছিল না। কিন্তু পেট ভরে উঠতে শরীরের ক্লান্তিটাও যেন কেটে যাচ্ছিল একটু একটু করে।

কুন্তলা খাওয়াতে খাওয়াতে কথা বলছিলেন।

টাইফয়েড নয়, ম্যালেরিয়াও নয়। এ রকম আমি বহু দেখেছি। হাজার রক্ত পরীক্ষা করেও কিছু পাওয়া যাবে না। রোদে রোদে ঘোরাঘুরি করেছেন। মাথায় রোদ লেগে গিয়েছে। তার থেকেই জ্বর।

খাওয়ানো শেষ করে মাথাটা আলতো করে নামিয়ে রাখলেন বালিশে। তোয়ালে খুলে নিলেন গলা থেকে। মুখ মুছিয়ে দিলেন। তোয়ালে আর ট্রে হাতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

একটুপরেই ফিরে এলেন কুন্তলা। হাতে ভিজে তোয়ালে। কপাল, মাথা, ঘাড়, গলা, ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর জগু এল। কুন্তলা বাইরে গেলেন। দরজা ভেজিয়ে জামাকাপড় পাল্টে পরিষ্কার লুঙ্গি গেঞ্জি পরিয়ে দিল। কুন্তলা আবার এলেন। বললেন, গা থেকে গেঞ্জিটা খুলে দাও জগু। বাধ্য ছেলের মতো কুন্তলার হুকুম তামিল করল জগু।

কুন্তলা তোয়ালে ভিজিয়ে এনেছিলেন। এ বারে শুধু মাথা নয়, বুক পিঠ পা সবই মুছিয়ে দিতে লাগলেন। বিমান বুঝতে পারছিলেন সমস্ত শরীরময় যে তীব্র জ্বালা, যে প্রদাহ ছিল, তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে। ঘুম পাচ্ছে বিমানের। মাথার যন্ত্রণাও যেন ছেড়ে যাচ্ছে।

আলো নিভিয়ে জগুকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন কুন্তলা।

জ্বরটা কিন্তু ছাড়ল না।

রক্তের কিছু রিপোর্ট পর দিনই এসে গেল, ডাক্তারবাবু রোজই এসে দেখে যেতে লাগলেন, একটা অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুলও খেতে দিলেন নিয়ম করে। তবু জ্বর একশ দুই ডিগ্রিতে দাঁড়িয়ে রইল। জ্বরের ওষুধ খেলে কিংবা গা স্পঞ্জ করিয়ে দিলে কিছুটা কমে; দু'তিন ঘণ্টা বাদে যে কে সেই।

চার দিন পর ডাক্তারবাবুর মুখ গম্ভীর হল। বলেই ফেললেন, আর দু'টো দিন দেখব, না কমলে কল্যাণী পাঠিয়ে দেব; হাসপাতালে ভর্তি হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে নেবেন।

আবার পরীক্ষা? এত দিন তা হলে কী করলেন?

ও গুলো তো রক্তের মামুলি পরীক্ষা। দরকার হলে বুকের ছবি, পেটের আলট্রাসাউন্ড সবই করতে হবে।

বিমান ঘাবড়ে গেলেন। জগুকে পইপই করে বারণ করেছেন, কোনওভাবেই তাঁর অসুখের কথা কেউ জানতে না পারে। তাঁর বাড়ির কেউ তো নয়ই, পিন্টুরা জানলেও বিপদ হবে। পিন্টুর পেটে কথা থাকে না। নন্দিতাকে ফোন করে বসবে! নন্দিতা আসবে মনে হয় না। ছেলেদের পাঠাবে। শেষ পর্যন্ত সেই নন্দিতার ঘাড়ে গিয়ে পড়তে হবে। কিছুই বলবে না নন্দিতা, ডাক্তার-বদ্যি সেবা সবই করবে, কিন্তু সব কিছুর মধ্যে থাকবে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

তার চেয়ে যেমন আছেন থেকে যাওয়াই ভাল।

একমাত্র ব্যতিক্রম কুন্তলা।

আগাগোড়া বলে এসেছেন, হিটফিভার। সাত দিন লাগে জ্বর কমতে। ওষুধ

অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ হয় না। ভাল খাওয়া দাওয়া করে শরীরটাকে চাঙ্গা রাখতে হয়, বেশি জল খেতে হয়, আর গায়ের জ্বরটাকে কমিয়ে রাখতে হয়।

আপনি কি ডাক্তার?

বিমানের কথায় হেসেছিলেন কুন্তলা—কাছাকাছি।

নিজের কথা কখনওই কিছু বলেন না, তাই আগ্রহ হয়েছিল বিমানের। জিজ্ঞেস করেছিলেন, ডাক্তারের কাছাকাছি কী? কম্পাউন্ডার?

না, নার্স।

আপনি নার্স? মানে সেবিকা?

ভাবতে কষ্ট হচ্ছে?

না, মানে ভেবে দেখিনি। কোন হাসপাতালে ছিলেন?

হাসপাতাল ছাড়া বুঝি নার্স হয় না? আর কথা নয়, এ বার শুয়ে পড়ুন। আলো নিভিয়ে দিই? কুন্তলার ধরনটাই এই রকম। একটা কথা বললে, দশটা আড়াল করে রাখেন। এটুকু যে জানা গেল তা-ই কত!

অলকা দু'এক বার উঁকি মেরেছেন। দরজার কাছ থেকে ফিরে গেছেন। একবার বিমান জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করেছিলেন, কেমন আছেন, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো! অলকা তাড়াতাড়ি, আপনি আগে সুস্থ হয়ে উঠুন, তারপর অন্য কথা হবে, বলে সরে গিয়েছিলেন।

কল্যাণী নিয়ে যাওয়া হবে প্রায় ঠিকঠাক, ডাক্তারবাবু কার সঙ্গে যেন কথাও বলে রেখেছেন, জগুও পুরোটা না ভেঙে পিন্টুকে ফোন করে আসতে বলেছে, তখনই ছ'দিনের মাথায় বিকেলে জ্বরটা একশ ছাড়াল না।

বিমান লক্ষ করলেন, ছ'দিন টানা জ্বর থাকলে যে রকম দুর্বল হয়ে যাবার কথা, এ বার তা হননি। পুরো কৃতিত্বই কুন্তলার, সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জগুকে দিয়ে এমন মেনু তৈরি করে এনেছেন যে না খেয়ে থাকতে পারেননি বিমান।

তাই জ্বরটা না বাড়তেই বিমানের মনে হল, তিনি এখন সুস্থ, তা হলে আর শুয়ে আছেন কেন?

জোর করেই উঠে বসলেন। বারান্দায় গিয়ে বসতে চেয়েছিলেন, সবাই ধরে রাখল। কিন্তু সে দিনই এসে হাজির হল ট্রেনে আলাপ হওয়া দুই বন্ধু, গৌতম আর অনিরুদ্ধ।

দেখুন, ঠিক খুঁজে খুঁজে চলে এলাম। আপনি তো যাবেন বলেও গেলেন না।

কী করব বলো? এসে থেকেই এমন জ্বরে পড়েছি, ক'টা দিন মাথা তুলতে পারিনি।

বলেই বিমানের মনে হল, ওদের তুমি বলে ফেললেন। শুধরে নেবার জন্য বললেন, দেখেছেন, জ্বর হয়ে মাথাটাও গেছে। আপনাদের তুমি বলে ফেললাম।

দু'জনে একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠল, সে কী কথা? আমাদের তুমিই তো বলবেন, আপনি আজ্ঞে করলে আমরা আর আসবই না।

খুশি হলেন বিমান। জানতে চাইলেন, তা তোমাদের হোম কেমন চলছে?

চলছে ভালয়-মন্দয়। সমস্যা আছে। তা ছাড়া, অনিরুদ্ধ, ওকে দেখছেন ভাল মানুষ, রেগে গেলে কিন্তু মাথার ঠিক থাকে না। আমাদের লেগেও যায় তাই মাঝে মাঝে।

অনিরুদ্ধ হাসছিল। বলল, আর গৌতম? ওকে তো চেনেন? একবার যেটাকে ঠিক বলে মনে করবে, তা থেকে নড়ায় কার সাধ্য? ষাঁড়ের গোঁ।

বিমানের মন ভাল হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তিনি ব্যবসা করতে নেমেছেন। এদের মিশনারি ব্রত। ওদের উপস্থিতি বিমানকে পবিত্র করছিল।

কবে যাবেন বলুন? আমরা না হয় এসে নিয়ে যাব।

নিয়ে যেতে হবে না। একটু সুস্থ হই, আমি নিজেই যাব, কী বারে গেলে তোমাদের সুবিধে হয়?

রবিবার, আমরা দু'জনেই থাকি।

চা সিঙাড়া খাইয়ে দু'জনকে বিদায় দিলেন। সিঙাড়ার কথাটা তো জগুকে বলেননি? জগুর মাথায় এ সব আসার কথা নয়!

ওরা চলে যেতে অলকা এলেন, ক'টা দিন এমন পরিবৃত হয়ে ছিলেন, ইচ্ছে হলেও আসতে পারিনি।

কথাটায় প্রচ্ছন্ন হুল ছিল। বিমান বুঝতে পারলেও উপেক্ষা করলেন। অলকা কিন্তু ছাড়লেন না। বললেন, চিকিৎসা আর ডাক্তার কতটুকু করল? একজনকেই দেখলাম, দিন নেই, রাত নেই, কী সেবাটাই না করল?

বিমান বললেন, হ্যাঁ, উনি প্রফেশনাল নার্স। সেবা করাই ওঁর পেশা।

নার্স? বলেছে আপনাকে? ঠিক আছে, খোঁজ নিচ্ছি।

কুন্তলা সেদিন এলেনই না। বিমানের সন্ধ্যাটা খালি খালি লাগল। পর

দিন সকালবেলা যখন এলেন, বিমান বাচ্চা ছেলের মতো ঠোঁট ফোলালেন, কাল এলেন না?

কুন্তলা ভুরু তুললেন, সে কী? আপনার গেস্টদের সিঙাড়া বানিয়ে কে খাওয়াল? জগুই অবশ্য সব করেছে, আমি শুধু দেখিয়ে দিয়েছি।

চুপ করে রইলেন বিমান। কথা বলছিলেন না কুন্তলাও। বিমান ভাবছিলেন কুন্তলার কতটুকু তাঁরা জানেন? এত দিন হয়ে গেল, কেউ এক বার দেখা করতেও আসেনি।

বলতে হয়, তাই বললেন, এখানে...মানে আমাদের এই হোম-এ আপনার ভাল লাগছে?

ভাল? হাসলেন কুন্তলা। ভিজে গলায় বললেন, হ্যাঁ, ভাল তো নিশ্চয়ই। সংসারে থাকলে কাছের মানুষের থেকে প্রত্যাশা জন্মায়, তারাও কিছু চায় আপনার কাছে। প্রত্যাশা পূরণ না হলেই দুঃখ যন্ত্রণা। এখানে কারও কাছে কোনও প্রত্যাশা নেই, তাই প্রত্যাশা পূরণ না হবার যন্ত্রণাও নেই। দুঃখ না পাওয়ার নামই তো ভাল থাকা।

কুন্তলার সামনে বিমানের কেমন অসহায় লাগে। কোনও কথারই জবাব খুঁজে পান না।

কুন্তলা আজ যেন বলার জন্যই এসেছিলেন। বললেন, এখানে মানুষের এক একটা দিনের কথা ভাবুন তো! সকাল থেকে রাত অবধি প্রতিটা সেকেন্ড-মিনিট-ঘণ্টা আমরা শুধু বাঁচছি। কোনও কাজ নেই, দিনগুলোকে ভরিয়ে রাখা নেই, সৃষ্টির আনন্দ নেই। বাঁচতে বাঁচতে একসময় দিন ফুরিয়ে ফেলা। তার চেয়ে, মাঝে মাঝে মনে হয়, দাঁড়ি টেনে দেওয়াই ভাল।

এই যে, আমার অসুখের ক'টা দিন চিকিৎসার তদারকি করলেন, পথ্য থেকে সব কিছুই আপনার নির্দেশ মতো হল, আমি সেরে উঠলাম, ভাল লাগেনি আপনার?

উজ্জ্বল হল কুন্তলার মুখ, হ্যাঁ, ভাল লেগেছে। কিছু করতে পারার আনন্দ! জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া। কিন্তু এটা তো সাময়িক। রোজ রোজ তো কেউ অসুস্থ হবে না!

একটা বেদনাবোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল বিমানের মন। বিমান যেন চাইছিলেন, আর পাঁচটা মানুষের অসুখ, তার সেবা, তার চিকিৎসায় নিজেকে নিযুক্ত রাখার থেকে কুন্তলা তাঁর সেবা তাঁর সান্নিধ্যকে আলাদা করে দেখুন!

কিন্তু এই বয়েসে, জীবনের এতখানি পার হয়ে এসে সব কথা কি খুলে বলা যায়?

কুন্তলার খোলা চুল, ছোট কপাল, উজ্জ্বল চোখ থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিলেন বিমান। চোখ বন্ধ করে বললেন, বাইরের আলো বড্ড চোখে লাগছে, যাবার সময় কাইন্ডলি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবেন।

১৮

নন্দিতার মনে হয় আগেই ভাল ছিল। এখন সেশন শেডিউল চেঞ্জ হয়ে যাওয়ায় মাধ্যমিকের খাতা আর স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষার খাতা একেবারে ঘাড়ে ঘাড়ে এসে পড়ে। কেউ কেউ তো হায়ার সেকেন্ডারিরও এগজ়ামিনার। কী করে যে সামলায়? নন্দিতা চেষ্টা করে দেখেছেন, দিনে বারো থেকে পনেরোটা খাতা ঠিকমতো দেখা যায়। তার বেশি দেখতে গেলেই ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর অবিচার করা হয়।

ব্যাপারটাকে সহজ করে নিলে অবশ্য কিছুরই প্রয়োজন পড়ে না। টিচার্সরুমে তাঁর পাশের টেবিলে বসে খাতা দেখছে বেলা। খাতা দেখতে দেখতে দিব্যি টাবুর নতুন সিনেমা নিয়ে মল্লিকার সঙ্গে গল্প করছে, খুলে রাখা টিফিন বাক্স থেকে শশার টুকরো তুলে মুখে ঢোকাচ্ছে, এবং পাশের মেয়েলি ম্যাগাজিনটার পাতা উল্টে ফ্যাশনের নতুন দিশা দেখে নিচ্ছে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে খাতাটা দেখছে কী করে? বেলার দিকে তাকালেই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বেলার হাতের লাল পেনসিল খাতার প্রতিটা পাতায় দাগ দিচ্ছে। আন্ডারলাইন করছে, টিক মারছে, কেটে দিচ্ছে, মার্জিনে প্রশ্নচিহ্নও বসিয়ে দিচ্ছে কোথাও কোথাও। খাতার পাতায় চোখ বোলালে যে কেউ মনে করবে, এতখানি খুঁটিয়ে পড়েছেন এগজামিনার? উত্তর শেষ হচ্ছে যেখানে, সেখানে একটা নম্বরও বসিয়ে চলেছে বেলা। গড় নম্বর। দশে পাঁচ। আটে চার। শেষ হলে কেজিং করে কমপ্লিট করে ফেলছে খাতা। সইটুকু অবধি পড়ে থাকছে না।

আগে জিজ্ঞেস করতেন, ওইভাবে খাতা দেখছ, কতজনের ওপর অবিচার হচ্ছে, খারাপ লাগে না?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসত বেলা, অবিচার? কেন? আমার হাতে কেউ ফেল করে

না জানেন? পাশের জন্যই তো পরীক্ষা দেওয়া। সেটাই যখন হয়ে গেল, তখন অবিচারের প্রশ্ন উঠছে কোথা থেকে?

সকলেই কি শুধু পাশ করার জন্য পরীক্ষা দেয়? যে ছেলেটা লেটার পেতে পারত, তাকে তুমি পঞ্চাশ কি বাহান্ন ঠেকিয়ে দিলে, সেটা অন্যায় নয়? শেষকালে যদি কিছু করে বসে সেই স্টুডেন্ট?

আপনি ভীষণ আবেগপ্রবণ, হেসে উঠেছিল বেলা, আজকালকার ছেলেমেয়েরা আপনার মতো নয়। তারা সব কিছু সহজ করে নিতে জানে। একটা সাবজেক্ট-এ নম্বর কম পেয়েছে তো কী হয়েছে? দ্যাট ইজ নট দ্য এন্ড অব লাইফ!

তা ঠিক। বেলার দিকে তাকালে বিশ্বাস হয়, জীবনে এন্ড বলে কিছু নেই। কোথাও হেমন্ত নেই, শীতের তো প্রশ্নই ওঠে না। জীবনময় শুধু বসন্ত।

মল্লিকা উঠে গেল। কথা না বলে থাকতে পারে না বেলা। ডানদিকে ঘুরে নন্দিতার দিকে তাকাল।

একটা প্রবলেম-এ পড়েছি নন্দিতাদি, আপনার সাজেশন চাইব।

নন্দিতা জানেন, তাঁর পরামর্শের বেলার কোনও প্রয়োজন নেই। যেহেতু তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস, রুটিন তাঁকেই তৈরি করতে হয়, পরের বছর রুটিন করার আগে নিজের পছন্দ-অপছন্দগুলো যাতে পাশ করিয়ে নিতে পারে সেইজন্যই গুরুত্ব দেখানোর ভান করছে বেলা।

শনিবার সন্ধ্যার ব্যাচটা ভাবছি ছেড়ে দেব।

সায়েন্স পড়ায় বেলা। সায়েন্স টিচারদের বাজারদর চড়া। প্রাইভেট টিউশনি নিয়ে চেঁচামেচি স্তিমিত হয়ে গেছে। অনেকেই ছেড়ে দেওয়া ব্যাচগুলো আবার ধরেছে। বেলা বোধহয় কখনওই ছাড়েনি। স্কুলের মাইনেতে ওর লিপস্টিকের খরচটুকু কুলোয়। হয়তো পারফিউমটাও।

উত্তর না দিয়ে বসে রইলেন নন্দিতা। দু'টো খাতা দেখা বাকি। তা হলেই এই বান্ডিলটা হয়ে যেত। বেলার পাল্লায় পড়ে আর হবে না।

শনিবার শনিবার সন্ধেয় জিম-এ যাব ভাবছি।

চেনা মুখ, পরিচিত চেহারা, তবু বেলাকে আর একবার অপাঙ্গে দেখলেন নন্দিতা। রংটা বেশ ফর্সা, থলথলে চেহারা ব্লাউজের ফাঁকফোকর গলে উপচিয়ে পড়ছে। ইদানীং শরীরের যত্ন নিতে শুরু করেছে বেলা। ম্যানিকিওর, ফেসিয়াল। রংবেরংয়ের চুল এখন ফ্যাশন, বেলাও ব্যতিক্রম নয়। কথা বলার সময় কমলালেবুর কোয়ার মতো ঠোঁট উল্টে দেয়। ওর কি ধারণা, ওইরকম করলে ওকে আরও আকর্ষণীয় লাগে?

গলা নামাল বেলা, ওর ইচ্ছে আমি জিম-এ যাই।

নন্দিতা জানেন, এই 'ও' বেলার স্বামী নন। ব্যবসার কাজে তাঁকে বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। বেলা নীচের তলায় একটা বুটিক শুরু করেছিল। বুটিকের মাল সাপ্লাই করতেন এক ভদ্রলোক। প্রায়ই আসতেন। সেইথেকে আলাপ। আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা।

বেলার কোনও লুকোছাপা নেই। ভদ্রলোককে দেখেছেন নন্দিতা, নন্দিতা কেন, স্কুলের অনেকেই দেখেছে। একটা পুরনো মডেলের ফিয়াট নিজে চালিয়ে আসেন, সামনের দরজা খুলে দেন, বেলা উঠে যায়। বেলারই কাছে শুনেছেন, হাইওয়ের ধারের হোটেল রিসর্টগুলো ওদের লক্ষ্য। বেলার দুই ছেলেই বাইরে, বড়জন পুণেয় ডাক্তারি পড়ে, ছোটটি পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন। কখন বাড়িতে ফিরল, আদৌ ফিরল কি না, খোঁজখবর নেওয়ার কেউ নেই। মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখে, হাজব্যান্ড-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য।

একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, একটা দারুণ এসএমএস পেলাম জানো মল্লিকা?

মল্লিকারা হামলে পড়েছিল, কী বেলাদি?

প্রশ্ন: আপনি স্বামীর সঙ্গে মোবাইলে কখন কথা বলেন? কী উত্তর হবে বলো তো?

জানি না, আপনি বলুন।

বয়ফ্রেন্ড-এর সঙ্গে ইনটিমেট হবার ঠিক আগে এবং পরে।

প্রত্যাশা মতো জবাব না পেয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে গেল বেলা। বাইরে বিকেলের রোদ এবং পড়ন্ত যৌবন। হেলায় নষ্ট করার মেয়ে বেলা নয়।

উঠতে যাবেন, হইহই করে ঢুকল বর্ষা।

দিদি, আমাদের রিহার্সাল দেখতে যাবেন বলেছিলেন। আজ ছাড়ছি না, যেতেই হবে।

বর্ষা এলেই মন ভাল হয়ে যায় নন্দিতার। বর্ষারা বাঙালি নয়। এই শহরে বর্ষার বাবা এসেছিলেন রাজস্থান থেকে, ব্যবসা করতে। বর্ষাদের বাড়িতে কেউ বাংলায় কথা বলে না। বর্ষা ইংলিশে অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। কমলকুমারের 'নিম অন্নপূর্ণা' নাটকে রূপ দিচ্ছে বর্ষা, মহলা চলছে, সেটাই দেখার জন্যে টানাটানি তাঁকে নিয়ে।

আজ আর ঠেকাতে পারলেন না।

গলির ভেতরে একতলায় ওদের ঘর। বাইরের আলো ঘরের মধ্যে ছিটেফোঁটাও পৌঁছয় না। টিমটিমে একটা বাল্ব ঝুলছে উঁচু ছাদ থেকে। একটা মাত্র টেবিল-ফ্যান। তারই মধ্যে জনা ক'য়েক ছেলেমেয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে।

বর্ষা ঢুকতেই সবাই সমস্বরে বলে উঠল, বর্ষাদিদি, এই জায়গাটা আমরা ম্যানেজ করতে পারছি না। দেখিয়ে দাও।

নন্দিতা দেখলেন, ঘরের টিমটিমে আলোটা নেহাৎই বাহুল্য। ওদের প্রত্যেকের চোখে সংকল্প তেজ ও তারুণ্যের দীপ্তি। বর্ষা ওদের গাইড, ওদের বন্ধু।

গাছকোমর করে শাড়ি জড়িয়ে বর্ষা নেমে পড়ল। ফিজিক্যাল অ্যাকটিং, যতখানি কথা, তার চেয়েও বেশি কোরিওগ্রাফি। গড়পড়তা দর্শক যেরকম দেখতে অভ্যস্ত, এ নাটক তার চেয়ে আলাদা।

এক সময় নাটক তার আবেগ ও আবেদনে গ্রাস করে নিল নন্দিতাকে।

শেষ হলে বর্ষা ঘাম মুছতে মুছতে সামনে এসে দাঁড়াল।

কেমন লাগল নন্দিতাদি?

ভীষণ ভাল। একদম অন্যরকম।

মেসেজটা ঠিকঠিক পৌঁছচ্ছে? কমলকুমারের লেখা! ভয় হয়, পারব তো?

নিশ্চয়ই পারবে।

বাইরে বেরিয়ে আলাদা হয়ে গেলেন দু'জনে। নন্দিতার ক্লান্তি লাগছিল। স্নান করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলে ভাল হত।

প্রথম শোয়ের দিন আসতে হবে কিন্তু। রিক্সায় উঠে চলে গেল বর্ষা।

বাড়ি ফিরে জুতো জোড়া খুলে খাতার বান্ডিল সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন নন্দিতা।

আনুগত্য চেয়েছিলেন, পেয়েছেন। প্রতিবাদ করেন তা নয়। চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি সবই হয়েছে। অবশেষে মেনে নিয়েছে এটা তাঁর সংসার। এখানে তাঁর কথাই আইন। সায় দিতে শিখেছে। নিজেকে মোল্ড করে নিয়েছে। নন্দিতাও খুশি হয়েছেন। বিদ্রোহ কে-ই বা চায়? অন্ধ আনুগত্যই শাসকের শেষতম লক্ষ্য।

এখন উল্টো মনে হয়। আনুগত্যই কি শেষ কথা? প্রতিবাদই কি কাম্য নয়? প্রতিবাদে ঢেউ থাকে, থাকে প্রশ্ন, উত্তরের অন্বেষণ। প্রতিবাদ স্তিমিত হয়ে আসা মানেই মেনে নেওয়া নয়। তখন প্রতিবাদটা জমে ভেতরে। জমতে জমতে পাথর হয়ে যায়।

অসহ্য গরম! শাড়িটা গা থেকে খুলে ফেললেন নন্দিতা। ব্লাউজের হুকগুলো আলগা করে দিলেন। উঠে ফ্যান-এর সুইচ অন করে এলেন।

পরিবর্তনটা প্রথম লক্ষ করেছিলেন মা মারা যাবার পর।

বাবার মৃত্যুটা ও সহজভাবে নিয়েছিল। ভুগছিলেন, ক্যানসার, মৃত্যুতে যন্ত্রণার অবসান। মাথা নেড়া করেনি, জিজ্ঞেস করলে বলেছিল, আজকাল ও সব কেউ মানে না।

মার খবরটা পেয়ে ও কেমন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। হাত ধরে বলেছিল, তুমিও চলো।

বিরক্ত হয়েছিলেন নন্দিতা। সামনে পরীক্ষা, সিট-অ্যারেঞ্জমেন্ট, ইনভিজিলেশন ডিউটি, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিলেন, তোমার কি মাথা খারাপ? এই সময় ছুটি নিলে চলে?

ঘোলাটে চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তোমার মা মারা গেলে না গিয়ে থাকতে পারতে?

নন্দিতা বলেছিলেন, আজেবাজে কথা বোলো না। তোমার মা তোমার কাছে, আমার মা আমার। আমার মায়ের মৃত্যুতে আমি কি তোমাকে যেতে বলেছিলাম?

বলোনি, কিন্তু আমি গিয়েছিলাম। তোমার পাশে পাশে থেকে ছিলাম। ছেড়ে চলে যাইনি।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে ফিরেছিল বেশ কিছুদিন পরে। নন্দিতা অবাক হয়ে দেখেছিলেন মাথা নেড়া। বয়েস কম মনে হচ্ছিল। শান্ত আর পবিত্র দেখাচ্ছিল।

ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মাথা নেড়া করলে যে?

ইচ্ছে করল।

বাবার বেলায় তো ইচ্ছে করেনি।

না, এটা প্রায়শ্চিত্ত।

কীসের প্রায়শ্চিত্ত জানতে পারি?

নিশ্চয়ই পারো। ছেলে হিসেবে যা করা উচিত ছিল, সেই কর্তব্য করিনি, তার প্রায়শ্চিত্ত।

আর কী করতে চেয়েছিলে তুমি? দেখাশোনা করার লোক রেখেছিলে, খাওয়াদাওয়া জামাকাপড়, সব কিছুর জন্যে টাকা পাঠিয়েছ, দু'মাস-তিনমাস অন্তর গিয়ে তদারকি করে এসেছ। তাও বলছ কর্তব্য করোনি? মা কি কারুর মরে না?

অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল ও। চোখের তারায় বিষাদ ছেয়ে যেতে দেখেছিলেন।

উঠে পড়লেন নন্দিতা। তোয়ালেখানা টেনে ঢুকে পড়লেন বাথরুমে। দু'টো প্লাস্টিকের গামলায় জল ভরা ছিল। গায়ে ঢালতে লাগলেন। গরম। মাথা-বুক-গলা জ্বলে যাচ্ছে। দু' গামলা জল খালি করেও শান্তি হল না। গা মুছতে মুছতে মনে হল, একটা বাথটাব থাকলে ভাল হত।

তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে শোবার ঘরে ঢুকে আলনা থেকে জামাকাপড় নামাতে না নামাতেই ঝুপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। অন্ধকারে ভূতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন খাটের ওপর।

রিটায়ারমেন্ট-এর পর বাড়িতে ফিরে এল। কিন্তু মন বসাতে পারল না। এই বাড়ির সঙ্গে ওর নাড়ির যোগ ছিল না। অতিথির মতো, অপরিচিতের মতো, আগন্তুকের মতো এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াত।

নন্দিতা দেখতেন। ভেতরে ভেতরে একটু তৃপ্তি হত না তা নয়। সংসারের জন্য কোনওদিন কিছু করোনি, এখন সংসারও তোমাকে দেখছে না। নিজেকে সরিয়ে রেখেছ, এখন চাইলেও ফিরে আসতে পারছ না।

ভেবেছিলেন, মানুষটা নিজের দোষ বুঝতে পারবে। তাঁর দিকে তাকাবে। তাঁকে আবিষ্কার করবে। সম্পর্কটা জোড়া লাগবে। তিরিশটা বছর তো ফিরে পাবেন না। এখন, এই দিনান্তে এসে যদি পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া যায়।

ঠিক উল্টোটা হল।

কাছে তো এলই না, বরং আরও দূরে সরে যেতে থাকল। একদিন গোছগাছ শুরু করল। নন্দিতা অবাক হলেন, কোথায় যাচ্ছ?

মোহনপুর, অনেক দিন যাওয়া হয় না। পিন্টু ফোন করেছিল। বাড়িঘর বেদখল হয়ে যাচ্ছে। একটু ঘুরে আসি।

নন্দিতা বাধা দেননি। যাচ্ছে যাক। মায়া। ঘুরে আসুক।

দু'দিনের জায়গায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে এল। ফিরে আসার পর লক্ষ করলেন, মুখের বিষণ্ণভাবটা অনেকখানি উধাও। যেন নতুন কিছুতে হাত লাগিয়েছে। উৎসাহে টগবগ করছে।

এরপর মাঝেমাঝেই যাওয়া শুরু হল। অবাক হয়েছিলেন। সন্দেহও করেননি তা নয়। আজকাল বয়েসটা কোনও বাধা নয়। ফোনের কথাবার্তা কান পেতে শুনেছেন। টেলিফোনেও জোরে জোরে কথা বলা অভ্যেস। বুঝেছেন

দেশের বাড়ি-জমি নিয়েই সমস্যা। তাঁকে কোনও দিনই জড়ায়নি। তিনিও জানতে চাননি।

এবারে বলে গিয়েছিল, ফিরতে দেরি হবে। দেরি মানে ধরে নিয়েছিলেন এক সপ্তাহ, বড় জোর পনেরো দিন। চার মাস কেটে গেল। একটা ফোন নয়, কোনও খবর নয়। ছেলেদের কাছ থেকে খবর পান, মিত্রাও ফোন করে। কিন্তু তাঁর জন্য কোনও ফিলিংস-ই কি মানুষটার অবশিষ্ট নেই? বাড়ির একটা পোষা কুকুরেরও খোঁজ নেয় মানুষ। তিনি কি সেটুকুও নন?

এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াত, টিভি চালিয়ে দেখত, টের পেয়েছেন জানলে বন্ধ করে উঠে চলে যেত। একটা দু'টো কথা। নাতনিরা ফোন করলে উঠে গিয়ে, বলো দিদিভাই!

নেই। ফাঁকা। যক্ষের মতো ফাঁকা বাড়িতে হাঁটেন নন্দিতা, পাহারা দেন। কী পাহারা দিচ্ছেন নন্দিতা?

ছাদে টাঙানো ছিল ছেঁড়া গেঞ্জিটা, রোদে জলে পুড়ছিল।

দু'দিন হল নিয়ে এসেছেন। খাটের বাজুতে মেলে রেখেছেন। কাল রাত্রে কী মনে হল, টেনে নিয়ে গন্ধ শুঁকছিলেন। সেই গন্ধ! পুরনো পরিচিত!

আর একবার তীব্র ইচ্ছে হল কাছে নিতে। নিতে গিয়ে গা থেকে তোয়ালে সরে গেল। ঠোঁট কাঁপতে শুরু করল। শরীরে জড়িয়ে নিতে নিতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন নন্দিতা।

১৯

যাই যাই করেও যাওয়া হচ্ছিল না। গিয়ে মন ভাল হয়ে গেল। অর্থবল লোকবল না থাকলেও, শুধু ইচ্ছে দিয়ে যে অনেক কিছু করা সম্ভব, গৌতমদের বৃদ্ধাশ্রমে না গেলে সে ধারণা হত না বিমানের।

পুরনো বাড়ির একতলা ভাড়া নিয়েছে ওরা। গোটা চারেক ঘর, একটা রান্নাঘর। বারান্দাকে ঘিরে নিয়ে বসবার ঘর বানিয়েছে, প্রত্যেক ঘরে দু'টো করে কাঠের খাটিয়া। এক একটা খাটে এক একজন বৃদ্ধা।

এই বৃদ্ধারা, বিমান দেখলেন, তাঁদের আবাসিকদের থেকে প্রকৃতি ও চরিত্রে পৃথক।

বিমানরা যাঁদের পান, সামান্য হলেও তাঁদের আর্থিক সঙ্গতি আছে।

সবচেয়ে বড় কথা তাঁরা অর্থের বিনিময়ে থাকেন। ফলে একটা দাবি আছে।

এখানকার আবাসিকরা ভিখিরি নন, কিন্তু ভিখিরিরা এর চেয়ে ভাল থাকে। তাদের অনেকেরই নির্দিষ্ট আয়ের সংস্থান থাকে। ভিক্ষা করতে করতে এরা সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। কীভাবে আদায় করে নিতে হয়, ভালই জানে।

গৌতমদের ভাষায় যাঁরা স্যোশাল ডেস্টিটিউট, তাঁরা না ঘরকা না ঘাটকা। পরিবারের মধ্যেই আছেন এঁরা, অথচ পরিবার এঁদের দেখে না। সারাদিন খাবার জুটল কি না সে খোঁজটাও নেয় না। কেউ কেউ পঙ্গু কিংবা শয্যাশায়ী থেকে নিঃশব্দে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন। আত্মীয়স্বজন ফিরে তাকায় না। সমাজও এদের সম্বন্ধে নিস্পৃহ।

বিমান যেটা জিজ্ঞেস না করে পারলেন না সেটা হল, ওরা এই উদ্যোগটা নিতে গেল কেন।

গৌতম হাসতে হাসতে বলল, আমরা দু'জনে একদিন তর্ক করছিলাম। এখানে বলে রাখি, আমরা এক জায়গায় হলেই কিন্তু তর্ক করি। অনিরুদ্ধ বলেছিল, অনাথ কনসেপ্টটা বেশ ওয়াইড। অনাথ মানে পিতৃ-মাতৃহীন শিশুই কেবল নয়, বয়স্ক বিধবারাও হতে পারেন। কথাটা আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছিল। কারণ, আমাদের পরিবারে আমার বিরানব্বই বছরের দিদিমাও এত আদরের, এত আপন যে মেনে নিতে কষ্ট হয়েছিল। আমরা খুঁজতে শুরু করলাম। এবং খুঁজতে খুঁজতে এমন অভিজ্ঞতা হল...আপনাকে কী বলব...পৃথিবীর অন্য একটা চেহারা চোখের সামনে খুলে গেল।

বিমান জানেন, পৃথিবীর কত চেহারাই তাঁর সামনে উন্মুক্ত হয়েছে। সব দেখতে হলে দীর্ঘজীবী হতে হয়।

গৌতম গম্ভীর হল, এখনও তো আমাদের একটা সমস্যা হচ্ছে। বললে আপনারও অবাক লাগবে।

বিমানের ভাল লাগছিল। অবাক হতে হতে মানুষের এক সময় অবাক না হবার ক্ষমতা জন্মে যায়। তখন নিস্পৃহ হয়ে যায় মানুষ। এই ছেলে দু'টোর অবাক হবার ক্ষমতা এখনও যায়নি।

যে ভদ্রমহিলার কথা বলছি, তিনি এক ন্যায়রত্ন পরিবারের গৃহবধূ। ভাটপাড়া অঞ্চলে তাঁদের প্রসিদ্ধি ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। এখনও পুরনো লোকেরা নাম শুনলে কপালে হাত ঠেকান। বলছি গৃহবধূ। কিন্তু এখন চুয়াত্তর। তাঁদের পৈতৃক ভদ্রাসন যেটি ছিল, সেটি হঠাৎই সরকার অধিগ্রহণ করে।

একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কিছু ক্ষতিপূরণ তাঁর নামে জমা পড়ে। ছেলেমেয়েদের থেকে আলাদা, একাই থাকতেন তিনি। ক্ষতিপূরণের বিষয়টা কোনও এক নাতির নজরে পড়ে। সে বৃদ্ধাকে নিজের কাছে নিয়ে যায়। তার পর, যা হয়, টাকাগুলো হস্তগত করার পরে বৃদ্ধা আবার বিতাড়িত হন। আমরা তাঁকে এখানে নিয়ে আসি।

গৌতম থামল। একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বলল, এই পর্যন্ত পরিচিত গল্প। কিন্তু এর পরেই গল্পটা অন্য দিকে মোড় নিল। ন্যায়রত্ন পরিবারের গৃহবধূ বৃদ্ধাশ্রমে কাটাচ্ছেন, এটা কেমন করে যেন জানাজানি হয়ে গেল। স্থানীয় কাগজের লোকেরাও হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিল। লোকাল সেন্টিমেন্ট! পাবলিক খাবে। টনক নড়ল বৃদ্ধার ছেলেমেয়েদের।

এতদিন পরে হঠাৎ?

প্রেস্টিজ। বৃদ্ধা একা থাকতেন, না খেয়ে মরে পড়ে থাকতেন, ঠ্যাং ধরে পাড়ার লোক গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসত, তাতে সম্মানহানি হত না। এই যে আত্মীয়স্বজন দেখে না, বৃদ্ধাশ্রমে দিন কাটাচ্ছেন, সেটাই হয়ে গেল ইস্যু। ছেলেরা হামলে পড়ল।

তারপর?

যে দিন তারা প্রথম এসেছিল, আমরা কেউই ছিলাম না। আমাদের অনুপস্থিতিতে মাকে দিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে নিল। তাতে লেখা হল, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে।

ভাল করতে গিয়ে এ তো মহা ফ্যাসাদ!

আমরা সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম—আপনি স্বেচ্ছায় এ সব লিখে দিয়েছেন? লিখতে পড়তে জানেন, সে কালের এইট পাশ, কেঁদে কেটে একসা। বললেন, ভয়ে সই করে দিয়েছি বাবা, লেখালেখি ছেলেরা যা করার করেছে।

তোমরা কী করলে?

আমরা ওনাকে দিয়ে আবার একটা লেখালাম। নিজেই লিখলেন উনি, বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা ওনার নেই, উনি এখানেই ভাল আছেন। ছেলেরা জোর করে তাঁকে দিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছে।

ছেলেরা ছেড়ে দিল?

না। থানা পুলিশ হল। এনকোয়ারি হল। ভদ্রমহিলা পুলিশের সামনে, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সব খুলে বললেন। শেষ অবধি এখানেই থেকে গেলেন

উনি। লাভের মধ্যে ঘটনাটা আরও জানাজানি হয়ে যাওয়াতে ছেলেদের মুখে চুনকালি পড়ল।

বিমান এ বার সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন। এত বাধা বিঘ্ন সহ্য করেও এই কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে, ছেলেগুলোর সাহস তো কম নয়?

ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হোম চালাতে তো টাকা পয়সা লাগে। কোথায় পাও? কোনও গ্রান্ট? ফরেন এড?

এখনও পাইনি। একটা এনজিও আছে, শ্যামলীদি তার কর্ণধার, সাহায্য পাই। অনিরুদ্ধ আমাদের গৌরী সেন। আটকে গেলেই হাত উপুড় করে। আমিও যখন যেমন দরকার দিই। সামনের বছর সরকারি গ্রান্ট-এর চেষ্টা করব। আর ফরেন এড নেব না, সেটা প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিমানের মনে হল, সমস্ত ছেড়েছুড়ে ওদের সঙ্গে নেমে পড়েন। মন ভরতি ভাললাগা নিয়ে ফিরে এলেন মোহনপুরে।

এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে বিকেলবেলা। গাছের পাতা থেকে টুপটাপ এখনও ঝরে পড়ছে বৃষ্টির স্মৃতি। কদম ফুল ফুটেছে কোথাও, তীব্র গন্ধ ছেয়ে আছে বৃক্ষতল ও ঘাসের বিছানায়। প্ল্যাটফর্মের রেলিং গলে বাড়ির চৌহদ্দিতে পা রেখে বিমান ভাবলেন, এখনও পৃথিবী কী মনোরম, বেঁচে থাকা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা!

দরজাতেই জগুর সঙ্গে দেখা। ঝোড়ো কাকের মতো ফিরছে।

কী রে? অন্ধকারে জলকাদায় কোথায় গিয়েছিলি?

সর্বনাশ হয়েছে! পাগলাবুড়ো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে!

জগদীশ! অজ্ঞান হয়ে গেছেন? কী হয়েছিল? এর মধ্যেই এত কিছু ঘটে গেল?

বাড়িতে ঢুকে সবার সামনে জিজ্ঞেস করা ঠিক নয়। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু একটু করে জেনে নিলেন বিমান।

বিকেলে চা জলখাবার খাইয়ে রান্নাঘরে গিয়েছিল জগু। জগদীশের জন্য একজন অ্যাটেনডেন্ট রাখার কথা। ছেলেরা সে জন্য টাকাও দিয়েছে। অ্যাটেনডেন্ট রাখাও হয়েছিল। মেয়েটির বয়েস বেশি নয়, বিয়ে হয়নি। কোনও নার্সিংহোমে আয়ার কাজ করত, ফিরতে দেরি হয়, বাবা-মায়ের আপত্তি, ছেড়ে দিয়ে এখানে জয়েন করেছিল। মন দিয়ে কাজ করছিল, জগদীশের যত্নও করত সাধ্য মতো। বিমান নিশ্চিন্তে ছিলেন, হঠাৎ অলকা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

দেখেছেন?

বিমান অবাক হয়ে বলেছিলেন, কী দেখব?

জগুর কাণ্ডটা?

বুঝতে পারেননি বিমান।

জগু তো পাগলাবুড়োর ঘরে ঢুকলে আজকাল আর বেরুতেই চায় না। আজ ভাতের তলা ধরে গিয়েছিল।

কেন?

সেটা আপনার নতুন রিক্রুটকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। একদিন ঠেলে দেখেছি, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। বুড়ো তো জেগে থেকেও বেহুঁশ, দেখেও দেখতে পায় না।

প্রমাদ গুনলেন বিমান। বয়েসের মেয়ে, কিছু ঘটে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। পরদিনই পত্রপাঠ বিদায় করলেন।

মেয়েটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কী দোষ, কোনও ত্রুটি হয়েছে কি না বারবার জানতে চাইছিল। ভেঙে বলেননি বিমান। শুধু, তোমাকে কাল থেকে আসতে হবে না, বলে টাকা পয়সা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। এখনও অন্য লোক পাওয়া যায়নি। জগুই আপাতত জগদীশের দেখাশুনো করছিল। এখন বিমানের মনে হল, তিনিই সবকিছুর জন্য দায়ী।

অল্প সময়ই একা ছিলেন জগদীশ। হয়তো চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েছিলেন। টাল সামলাতে পারেননি। হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। পড়ে যাবার আওয়াজ পেয়ে ছুটে এসেছে জগু। অন্যরাও অনেকে এসেছে। উপুড় হয়ে শুয়েছিলেন জগদীশ। কুন্তলা দেখে বলেছেন, শ্বাস পড়ছে, মারা যাননি। শিগগির ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো।

কুন্তলার জিম্মায় জগদীশকে রেখে জগু ছুটেছিল ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে। ডাক্তারবাবু ছিলেন না, কল-এ গেছেন। কম্পাউন্ডারকে বলে এসেছে জগু, এলেই যেন খবর দেয়।

জগুর পিছন পিছন ভেতরে ঢুকলেন বিমান, অন্যান্য দিন এই সময় অনেকের গলার আওয়াজ শোনা যায়, বড় ঘরে টিভি চলে। আজ সমস্ত চুপচাপ।

জগদীশের ঘরের সামনে তখনও কেউ কেউ দাঁড়িয়ে। কুন্তলা ছিলেন ভেতরে।

হেড ইনজুরি মনে হচ্ছে। ডাক্তারবাবু এলেন না?

এখুনি এসে পড়বেন। ...কী মনে হচ্ছে সিরিয়াস কিছু?

এই বয়েসে মাথায় চোট পাওয়া ভাল নয়। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। দেখা যাক, ডাক্তারবাবু আসুন।

তখনও মাটিতেই পড়েছিলেন জগদীশ। বিমান জগুর দিকে ফিরলেন, আয়, আমরা ধরাধরি করে খাটে শুইয়ে দিই।

তুলতে গিয়ে বিমান দেখলেন, বেশ ভারী। তাঁর দিকটা ঝুলে যাচ্ছিল, কুন্তলা এসে হাত লাগালেন, তিনজনে মিলে চিত করে শুইয়ে জামাকাপড় ঠিক করে দিলেন জগদীশের। নীচে গলার স্বর শোনা গেল, ডাক্তারবাবু।

জগুকে বললেন, শিগগিরি যা, সিঁড়িটা অন্ধকার, আলো দেখিয়ে নিয়ে আয়।

জগু যেতে পেরে বর্তে গেল। ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জগদীশকে দেখেই মুখ গম্ভীর হয়ে গেল ডাক্তারবাবুর। চোখে আলো ফেলে, পায়ের তলায় টোকা দিয়ে, অনেকভাবে দেখলেন। বার বার নাম ধরে ডাকলেন। নিঃসাড়ে শুয়ে রইলেন জগদীশ।

বিমানের দিকে ফিরলেন ডাক্তারবাবু।

হেড ইনজুরি, ভাল ঠেকছে না। মাথার স্ক্যান করাতে পারলে ভাল হত। আইডিয়ালি হি শুড বি শিফটেড টু এ হসপিটাল।

হসপিটাল! চিন্তায় পড়ে গেলেন বিমান। একা সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে? পিন্টুর সঙ্গে কথা বলা দরকার। জগদীশের ছেলেদেরও জানানো উচিত।

ঠিক আছে, একটু ভেবে দেখি। আপনাকে ফোন করলে কোনও অসুবিধা নেই তো!

না না, অসুবিধার কী আছে। আমি আর চেম্বারে ফিরব না। বাড়ির নম্বরটা রেখে দিন। এখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসও চালু হয়েছে। লাগলে বলবেন, আমি কন্ট্যাক্ট করিয়ে দেব।

ডাক্তারবাবু জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন, বিমান বললেন, কোনও ওষুধ, ইনজেকশন পড়বে না?

আপনারা আগে ডিসিশন নিন। যদি হাসপাতালে শিফট করা সাব্যস্ত না হয়, তা হলে, লোক পাঠিয়ে দেব। ওষুধ খাওয়ানো যাবে না, টিউব পরাতে হবে। খাওয়া দাওয়ার জন্যও টিউব দরকার।

ডাক্তারবাবু চলে যেতেই বিমান ফোন করলেন পিন্টুকে। পিন্টু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল, এখনি বাড়ির লোককে জানানোর দরকার নেই। ডাক্তারবাবুর ফোন নম্বরটা দাও, আমি যোগাযোগ করছি।

বিমান হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, তা হলে আমি আর কনট্যাক্ট করছি না, যা করার তুইই করবি?

হ্যাঁ, বলে লাইন কেটে দিল পিন্টু।

রাত বাড়ছিল। অভ্যেসমতো সকলকে খাবার পৌঁছে দিল জগু। কুন্তলা খেলেন না। বোর্ডাররা সবাই চুপচাপ। আলো নিভে গেছে অনেক ঘরে। কিন্তু কেউই ঘুমিয়ে পড়েছেন মনে হল না।

কুন্তলা চেয়ার টেনে জগদীশের মাথার কাছে বসলেন। বিমান বললেন, আমি তো আছি, আপনি বরং ঘুমিয়ে নিন।

কুন্তলা অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, নার্সিং ট্রেনিং তো আপনার নেই, আপনি বসে থেকে কী করবেন?

কথা না বাড়িয়ে দু'জনেই চুপচাপ বসে রইলেন।

বারবার ঘড়ি দেখছিলেন বিমান। জগদীশের নাকের কাছে হাত নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন কুন্তলা, নাড়িতে আঙুল ছোঁয়াচ্ছিলেন। রাত যত গভীর হচ্ছিল, চিন্তাও বাড়ছিল।

কী কথা হল? ডাক্তারবাবু যে বলেছিলেন অ্যাম্বুলেন্স আসবে? ওষুধ? ইনজেকশন? অ্যাসিস্ট্যান্ট? কিছুই তো পৌঁছুল না। তা হলে কি পিন্টুর সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কথা হয়নি? পিন্টু কি কনট্যাক্ট করতে পারেনি? নম্বরটা ভুল লিখলেন না তো?

হাজারটা এলোমেলো ভাবনা মাথার মধ্যে ভেসে উঠতে থাকল। রাত্রি তার নিজস্ব শব্দ নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল বাইরে। ঘুম নয়, ঘোরের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে বিমান দেখছিলেন, টানটান জেগে জগদীশকে পাহারা দিচ্ছেন কুন্তলা।

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে পড়লেন বিমান! কুন্তলা কি তাঁকে ডাকছিলেন?

সামনে অনড় জগদীশের শরীরে স্পন্দন দেখা দিয়েছে। প্রথমে ডান হাত, তার পর ডান পাটা কাঁপতে শুরু করল। কাঁপুনি না বলে বিক্ষেপ বলাই ভাল। তার পর সমস্ত শরীর। কুন্তলার সঙ্গে বিমানও হাত লাগালেন। তবুও শরীরটা বিছানার সঙ্গে চেপে ধরে রাখা যাচ্ছে না। খাটটা কাঁপছে ঠকঠক করে। কুন্তলা চোখের ইশারায় টেবিলের ওপর রাখা চামচটা দিতে বললেন। চোয়ালের ফাঁকে চামচ ঢুকিয়ে হাঁ করিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন কুন্তলা। দু'হাত দিয়ে খাটের সঙ্গে জগদীশকে প্রাণপণে চেপে ধরে রইলেন বিমান।

এক সময় খিঁচুনি কমে আসতে লাগল। মুখের পাশে, ঠোঁট বেয়ে ফেনার মতো গড়িয়ে আসছে। তোয়ালে এনে মুছিয়ে দিলেন কুন্তলা। বাইরে ভোর

হচ্ছে। পাখির ডাক, ঠাণ্ডা হাওয়া জানলার ফাঁক গলে চোখেমুখে হাত বুলিয়ে গেল।

ভাবছিলেন, বলে ফেললেন বিমান।

ভোর হয়ে এল। ডাক্তারবাবুকে এক বার ফোন করব?

করুন, কিন্তু আর কি এসে লাভ হবে?

একবার ডায়াল করতেই ফোন ধরলেন ডাক্তারবাবু।

খিঁচুনি? খবর দেননি কেন?

খবর? আমার ভাই আপনাকে ফোন করেনি?

হ্যাঁ। উনি বললেন, হাসপাতালে শিফট করার দরকার নেই। এখন স্টেবল আছেন। পরে প্রয়োজন হলে খবর দেব। আমি তো কম্পাউন্ডারকে বসিয়ে রেখেছি। খবর না পেয়ে ভাবলাম, ভাল আছেন। ...ঠিক আছে, এখনি যাচ্ছি।

ডাক্তারবাবু এসে ইনজেকশন পুশ করতে করতেই আর এক বার খিঁচুনি হল জগদীশের। এলিয়ে পড়ল মাথা। নাড়িতে হাত দিলেন ডাক্তার। মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

জগদীশের শান্ত মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল বিমানের।

পিন্টু তো এক বারও তাঁর কাছে জানতে চায়নি জগদীশ কেমন আছেন। পরে ফোনও করেনি। তা হলে ডাক্তারবাবুকে কী করে বলল, হাসপাতালে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই? ওষুধটুকুও পড়ল না। বলতে গেলে বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন জগদীশ। খবর পেলেই ডাক্তারবাবু লোক পাঠিয়ে দিতেন। খবরটাই তাঁকে দেওয়া হল না। জানলে, বিমান নিজেই ফোন করতেন। সেটাও বারণ করে দিল পিন্টু।

কেন এমন আশ্চর্য ব্যবহার করল ও?

জিজ্ঞেস করবেন? জগদীশের মৃত্যুর খবরটাও তো পিন্টুকে দেওয়া উচিত।

ফোনের কাছে গিয়েও হাত টেনে নিলেন বিমান। কে যেন ভেতর থেকে তাঁকে বারণ করল। মনে হল পিন্টু খবরটা শোনার জন্যেই অপেক্ষা করছে। ওকে সেই আনন্দটুকু থেকে বঞ্চিত করা দরকার। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য।

জগুকে ডাকলেন।

জগদীশবাবুর ফাইলটা নিয়ে আয় তো। ওঁর ছেলেদের ফোন নম্বর লেখা আছে।

ফাইল খুলে পড়তে গিয়ে দেখলেন, চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

স্বাভাবিক মৃত্যু এবং হত্যার মধ্যে কতখানি তফাত? কখনও কখনও সুতোর মতো। এক তীব্র অপরাধবোধ আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল বিমানের চৈতন্য।

২০

তিন দিন হয়ে গেল টানা বৃষ্টি চলেছে। বর্ষার শুরুতে মাঠঘাট শুকিয়ে থাকে, জল জমতে পারে না, সবটুকুই মাটি শুষে নেয়। নুয়ে থাকা গাছের পাতা হঠাৎ টানটান দাঁড়িয়ে ওঠে, চকচকে পাতায় জলের বিন্দু পড়ে পিছলে যায়, হলুদ হয়ে যাওয়া ঘাসের আস্তরণে সবুজের বান ডাকে। তীব্র প্রদাহ যা পরিব্যাপ্ত ছিল সংবরণ করে বাতাস প্রশান্ত হয়।

মানুষের মনও প্রখর গ্রীষ্মে অস্থির হয়। বর্ষা তাতে শান্তির বারিসিঞ্চন করে। বাইরে থেকে ভেতরে ফেরে মানুষ।

কতগুলো মাস-দিন-ঘণ্টা তিনি বাড়ি ছাড়া? মেজানাইনের ঘর, গুটিয়ে রাখা তোশক, ডাঁই করা খবরের কাগজ, দেওয়ালের টিকটিকি, ছেড়ে রাখা স্লিপার। নন্দিতা কি মনে করে পাম্প চালাচ্ছে? কাজের মেয়েটা বহাল আছে? নন্দিতার যা পিটপিটানি, কেউই তো দু'তিন মাসের বেশি টেকে না। বাজার? মনে হয়, স্কুল থেকে ফেরার পথে নন্দিতা নিজেই বাজার করে নিয়ে আসে। মাছ খেতে ভালবাসে নন্দিতা। সন্ধের বাজারে সেটারই অসুবিধে।

বিমান নেই, সমস্ত কাজ আটকে রয়েছে, পাম্প-এ জল তুলতে ভুলে যাচ্ছে নন্দিতা, কাজের মেয়ে বাসন না মেজে চলে যাচ্ছে, খবরের কাগজ দিচ্ছে না ছেলেটা, গ্যাস ফুরিয়ে গেলে স্টোভ জ্বালিয়ে রান্না করতে হচ্ছে, নন্দিতা তাঁর কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—ভাবতে ভাল লাগে, কিন্তু এর কোনওটাই সত্যি নয়। তিনি থাকা এবং না-থাকার মধ্যে ব্যবধান চুল-পরিমাণ। প্রত্যেকেই নিজেকে অপরিহার্য ভাবতে ভালবাসে। নিজের অনুপস্থিতিতে চুপি চুপি দেখতে গেলে, শোকে দুঃখে পাথর হয়ে যাবে মানুষ। কিছুই এতটুকু বদলায় না, জীবনের স্বাভাবিক গতি ও ছন্দে কোনও ছেদ পড়ে না। মানুষের অপরিহার্যতা শুধু তার নিজের অহঙ্কারের কাছে।

বিমান ভাবলেন, বাড়ি শব্দটার কথাও। মোহনপুর থেকে উপড়ে নন্দিতা যখন তাঁকে টেনে নিয়ে গেল, তখনও বাড়ি বলতে তাঁর অবচেতনে মোহনপুরের এই আজন্মলালিত সংস্কারকেই আঁকড়ে থেকেছেন। বিশ্বাস ও

বাস্তবকে মেশাতে না পেরে, শহরের বাইরে গ্রামে চাকরি নিয়েছেন, সেখানেই মাটির ঘর খড়ের চালের আশ্রয়ে নিজেকে গুঁজে দিয়েছেন, সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সাহচর্যে দিন অতিবাহিত করেছেন, অথচ সচেতনভাবে বিশ্বাস করেছেন, বিদ্যালয় সংলগ্ন সেই মেসবাড়িটিও তাঁর বাড়ি নয়।

রিটায়ারমেন্টের কাছাকাছি পৌঁছে বিমান যখন সত্যিই ভেতরে ভেতরে একটা বাড়ির সন্ধান করছেন, নন্দিতা তার স্বপ্নের আবাস তৈরি করতে শুরু করল। ভিত খোঁড়া হল, ইট পাথর চিপস সিমেন্ট জমতে থাকল, লোহার খাঁচা তৈরি হল। দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে পড়ল দেওয়াল, ছাদ দরজা জানলা সমন্বিত এক বাসস্থান। কতটুকু অবদান ছিল বিমানের? তবু নন্দিতা যখন সেইখানে থাকার জন্য তাঁকে আহ্বান করল, তিনি সেই ডাক ফিরিয়ে দেননি। নন্দিতার বাড়িতে থেকেছেন, তাঁর যথাসাধ্য কর্তব্য করেছেন এবং সেই কর্তব্যে ফাঁকি দেননি বলেই তাঁর বিশ্বাস।

তবু নন্দিতার বাড়ি তাঁর বাড়ি হয়ে উঠল না।

আসলে, দেশ যেমন নদী-নালা-খাল-বিল-পাহাড়-জঙ্গল নয়, দেশ মানে দেশের মানুষ, তেমনি বাড়িও তার মেঝের মোজাইক বাথরুমের টাইলস রান্নাঘরের লফট নয়। বাড়ি মানে একটা আবেগ, একটা সম্পর্কের উষ্ণতা, রাতের আশ্রয়। বাড়ি মানে, স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধা। নিজের দিকে ফেরেন, তন্ন তন্ন করে সন্ধান করেন বিমান। বিমানের কি কোনও বাড়ি ছিল?

নন্দিতাকে ভালবাসেন বিমান। নিজের মতো করে। নন্দিতা তাঁকে অনেক দিয়েছে। নন্দিতার কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। মোহনপুর থেকে তাঁকে ছিন্ন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, সামাজিক পরিচিতি দেওয়া, সবচেয়ে বড় কথা, দুই সন্তান, সাহচর্য, নিরাপত্তা, সমস্ত কিছুর জন্যই নন্দিতাকে প্রতি মুহূর্তে কুর্নিশ করেন বিমান।

নন্দিতাকে ভয়ও করেন বিমান। নন্দিতার মেজাজ, তার ইচ্ছার প্রাবল্য, তার অভিমতের তীব্রতা বিমানকে সন্ত্রস্ত রাখে। নন্দিতাকে খুশি রাখতে চেষ্টা করেন। তার ছোটখাটো পছন্দকে মেনে নেন। মন রাখা কথা বলেন, পারতপক্ষে অবাধ্য হন না।

নন্দিতাকে শ্রদ্ধা করেন বিমান। যে ভাবে একা একটি মেয়ে, শুধু জেদকে সঙ্গী করে, ওই বয়েসে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে, দুই ছেলেকে মানুষ করল, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল, তা অবশ্যই কৃতিত্বের। বিরাট কিছু লক্ষ্য ছিল না নন্দিতার। কিন্তু যেটুকু উদ্দেশ্য স্থির করে নিয়েছিল, তার পুরোটাই যে ও

অর্জন করেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সফল মানুষ তো এদেরই বলে।

নন্দিতাকে ঘৃণাও করেন বিমান।

সেই যে, জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে হিঁচড়ে উপড়ে তুলে নিয়ে গেল, সেই থেকেই ঘৃণাটা ভেতরে ভেতরে পুষে রেখেছেন বিমান। নন্দিতাকে স্বার্থপর মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, নিজেরটা বুঝে নিতে গিয়ে তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করেছে নন্দিতা। নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছে। নিজেকে বেশি বুঝদার ভাবলে যা হয়, অন্যদের যে কোনও মতামত থাকতে পারে, খেয়ালই থাকে না।

প্রথম দিকে প্রতিবাদ করেছেন। গলার শিরা ফুলিয়ে ঝগড়া করেছেন। নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। পারেননি, আবার ফিরে এসেছেন। কাছাকাছি থাকতে গিয়ে প্রতিটা মুহূর্তে ভেতরে বিদ্রোহের বাজনা শুনতে পেয়েছেন। আবার প্রতিবাদ। আবার কলহ। নন্দিতাকে মনে হয়েছে স্বেচ্ছাচারী। তীব্র ইচ্ছা হয়েছে ওর গলা টিপে ধরে কণ্ঠস্বর চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দিতে। সংযত হয়েছেন। আবার নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

এইভাবে কাছে আসতে ও দূরে সরে যেতে যেতে কখন যেন উপলব্ধি করেছেন, নন্দিতার ভাল ও মন্দ লাগাগুলো ক্রমশ তাঁর কাছে গৌণ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে এই নয় যে, সেগুলো তিনি মনে রাখেন না। মাছ খেতে ভালবাসে নন্দিতা, বাজারে ঢুকলে মাছ আনতে ভোলেন না। জিনিসপত্র টিপটপ পছন্দ করে, যথাসম্ভব গুছিয়ে রাখেন। কাজের মেয়েটা ঠিকমতো বাসন মাজে না, এঁটোকাঁটা লেগে থাকে, দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করেন। গরমে ঘেমে বাড়ি ফিরলে, স্নান করতে পছন্দ করে, বালতিতে জল ভরে রাখেন।

কিন্তু বিমান বুঝতে পারলেন, বশংবদ ভৃত্য তার মনিবের জন্য এ সব করে। এর মধ্যে কর্তব্য আছে, খুশি করা আছে, সন্ধিস্থাপন আছে, ভালবাসা নেই।

নন্দিতা বাড়িতে ফিরলে, তাঁর মনের মধ্যে কোনও জলপ্রপাত হয় না, খাবার টেবিলে মুখোমুখি বসলে বেজে ওঠে না কোনও গান, নন্দিতা কাছে না থাকলে, কোনও তীব্র বেদনায় তাঁর মনপ্রাণ আচ্ছন্ন হয়ে যায় না।

নন্দিতা এক অভ্যাস। কিন্তু কোনও আকর্ষণ নয়।

নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করলেন বিমান। আগে বারবার সরে গিয়েছেন, গ্রামে স্কুলের পরিমণ্ডলে ফিরে গেছেন। বেশিদিন সরে থাকতে পারেননি। আবার ফিরে এসেছেন।

এবারের যাওয়া ভেতরের। এই যাওয়া অমোঘ এবং স্থায়ী। একটু একটু করে মনকে শক্ত করলেন বিমান। নিজেকে বিযুক্ত করলেন। বাড়ি থেকে, ঘর থেকে, প্রাত্যহিকতা থেকে, আরাম ও নিরাপত্তা থেকে। অবশেষে নন্দিতা থেকে।

মোহনপুরে চলে আসাটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণামাত্র ছিল। চলে অনেক আগেই এসেছেন বিমান। এসে দেখলেন, নন্দিতা ভেতরে যতখানি জুড়ে আছে ভেবেছিলেন, তার থেকেও অনেক অনেক কম জায়গা তার দখলে।

কত দিন হয়ে গেল তিনি এসেছেন! কত বার ভেবেছেন নন্দিতার কথা? কত রজনীতে নন্দিতা হানা দিয়েছে তাঁর নিদ্রা ও নিদ্রাহীনতায়? একাকী বহু রাত্রি অতিবাহিত করেছেন এই বারান্দায়, ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে। নন্দিতার জন্য, তাকে একবার দেখবার জন্য, একটিবার কথা বলার জন্য কখনও কি হাহাকার তাঁর বুকের প্রকোষ্ঠে গুমরে ফিরেছে?

বিমান জানেন, না। নন্দিতার ছায়া তাঁকে আর অনুসরণ করে না।

বৃষ্টি কখনও বাড়ছে কখনও কমছে। একেবারে থেমে যাচ্ছে না। ভিতরেও বৃষ্টি হচ্ছে কোথাও। প্রথম বৃষ্টিতে তাপ মরে আসে, চরাচর শান্ত হয়। বৃষ্টি চলতে থাকলে ঘনিয়ে আসে বিষাদ ও অন্ধকার। বৃষ্টির ধারার সঙ্গে অশ্রুপাত তখন মিশে যায়।

জগু এসে চায়ের কাপ রেখে গেল।

বিস্কুট দেব?

ঘাড় নেড়ে না বললেন বিমান। বাইরের কিছুই ভাল লাগছে না। কথা বলতেও না। ভেতরে চোখ পেতে বসে আছেন।

নন্দিতার সঙ্গে না হয় রসায়নে মিলল না। কিন্তু ছেলেরা? বড় তপন, ছাত্র হিসাবে মেধাবী, শান্ত, মৃদুভাষী। ওর গভীরতাকে শ্রদ্ধা করেন বিমান। মানুষ হিসেবেও বড় মাপের। তপন কি শ্রদ্ধা করে তাঁকে?

বিমান জানেন—না। তপনের শৈশব-বাল্য-কৈশোর, তার হয়ে ওঠা, তার প্রস্তুতি, অধ্যয়ন ও তপস্যা সমস্ত কিছুতেই জড়িয়ে ছিল তার মা। বিমান কোথায়? দূরে গ্রামে পড়ে থেকেছেন, সপ্তাহান্তে উদয় হয়েছেন, আরামটুকু নিংড়ে নিয়ে ফিরে গেছেন। কখনও খোঁজ নিয়েছেন, ওর পড়াশুনার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না? কী স্ট্রিম নিয়ে পড়া উচিত? পরীক্ষায় রেজাল্ট কেমন হল? ডেকে বলেছেন, আয় তোকে অঙ্কটা একটু দেখিয়ে দিই? কী খাচ্ছে, শরীর ঠিক আছে কি না, সমস্ত ঠিকঠাক চলছে কি না কখনও জানতে

চেয়েছেন? বাবা হিসেবে নিজেকে কত নম্বর দেবেন? শূন্য দিলেও বেশি দেওয়া হয়। উত্তরটা নিজেই দিয়ে দেন বিমান।

ছোট অর্পণ। দাদার মতো মিতভাষী মোটেই নয়। নিজের বক্তব্য জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা ওর চিরকালের স্বভাব। ও-ও তাঁকে দেখেছে। কিন্তু তপনের সঙ্গে বড় তফাৎ, তপন যখন কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে চলে গেল সেই সময়েই নন্দিতার সঙ্গে তাঁর উত্তেজনা চরম, ঘর্ষণে উত্তাপ তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন, অভিযোগ ও প্রত্যাঘাতে দু'জনে দু'জনকে বিদীর্ণ করছেন অবিরাম।

সেই সময় যে কোনও প্রত্যক্ষদর্শীকে কোনও না কোনও পক্ষ নিতেই হত। অপু নন্দিতার পক্ষ নিল। অপুর বিচারে বিমান হয়ে দাঁড়ালেন এক খলনায়ক। যে শুধু মাকে অত্যাচার করে। যে হঠাৎ উদয় হয়। ঝগড়া চেঁচামেচিতে সংসারের শান্তি নষ্ট করে, মাকে কাঁদায়, তার পর সব লন্ডভন্ড করে বিদায় নেয়। ক'দিন পরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

একদিন মনে আছে, কলহের চূড়ান্ত মুহূর্তে অপু চিৎকার করে মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। আঙুল তুলে বাইরের দরজা দেখিয়ে বলেছিল, বেরিয়ে যাও। আর এক মুহূর্তও যেন এখানে না দেখি। অনেক জ্বালিয়েছ। এবারে আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও।

থমকে গিয়েছিলেন বিমান। ছোটছেলের চোখে দেখেছিলেন পুঞ্জীভূত ঘৃণা। চোখ সরিয়ে নিয়েছিলেন। বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বহুদিন বাড়িমুখো হননি।

তাঁর আর নন্দিতার সম্পর্কের মতো এই ঘটনাও থিতিয়ে নীচে পড়ে গেছে। অনেকগুলো বছর, বহু স্মৃতি তার ওপরে স্তরে স্তরে জমা হয়েছে। অর্পণের স্ত্রী শাওন বুদ্ধিমতী মেয়ে। সেও উদ্যোগ নিয়েছে সম্পর্কটা সহজ করার। ওদের সন্তান, দিউ আর দমন। যেটা দিতে পারেননি অপুকে, সেটাই পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করেন নাতি-নাতনির মধ্য দিয়ে। এক ধরনের তঞ্চকতা। ওরা কি টের পায়?

স্ত্রী নয়, সন্তান নয়, নাতি-নাতনিরাও নয়। কোনও সম্পর্কটাই গড়ে তুলতে পারলেন না বিমান। বিমানের থেকে ভাল কেউ জানে না। সম্পর্কের গ্রন্থিতেই পারিবারিক মানুষের পরিচয়, তার সার্থকতা। এক চূড়ান্ত অসফল ব্যক্তি মানুষ বিমান।

শক্তিনাথকে সেই কারণেই হিংসা হয় বিমানের। স্ত্রীর সঙ্গে কেমন সম্পর্ক ছিল বলতে পারবেন না, কিন্তু মেয়ে-জামাই-নাতি-নাতনির সঙ্গে এত চমৎকার

জড়িয়ে থাকেন, দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। অথচ মানুষটা নিজেকে সংসারের বাইরে রাখতেই ভালবাসেন। আপনজনেরাই ছুটে ছুটে যায়—তাঁর সাহচর্যের লোভে।

বিমান কথায় কথায় এক দিন বলেও ফেলেছিলেন।

আপনাকে দেখে অনেক শেখার আছে বেয়াইমশাই। কেমন চমৎকার জীবনটাকে ছকে নিয়েছেন। সমস্ত মাপা, কোথাও কম বেশি নেই।

পাখিদের মুড়ি খাওয়াচ্ছিলেন শক্তিনাথ। তাঁর মল্লিকপুরের কুটিরে গিয়েছিলেন বিমান, সেখানেই কথা হচ্ছিল।

শক্তিনাথ জবাব দিয়েছিলেন, আসলে জীবনটা এক ধরনের ম্যানেজমেন্ট। টাইম-ম্যানেজমেন্ট, ফিনান্স-ম্যানেজমেন্ট-এর মতোই ম্যান-ম্যানেজমেন্ট। এক্ষেত্রে এইসব ম্যান, আপনার প্রতিবেশী। সংসারের ভেতরে বা বাইরে। যতখানি ধরবেন, ছাড়তে হবে তার চেয়ে বেশি। এই আপ্তবাক্যটা স্মরণে রাখলে আর সমস্যা থাকে না। চাহিদাটা কমিয়ে আনতে হয়। সেটা আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগই হোক, আর মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাশাই হোক।

তখন ছেঁদো দার্শনিকতা মনে হয়েছিল। কিন্তু কথাটা ভেতর থেকে তাড়াতে পারেননি।

কুন্তলাও এই কথাটাই অন্য ভাবে সে দিন বলেছিলেন, মনে পড়ে গেল।

একা একা বসে কী ভাবছেন?

চমকে উঠলেন বিমান। ভাবনায় এমন ডুবে ছিলেন, কেউ যে কাছাকাছিই আছে, এসে কথা বলে উঠতে পারে, সম্ভাবনার মধ্যেই যেন ছিল না। যেন এক অনন্ত একাকিত্ব তার ভরকেন্দ্রে ক্রমশ আত্মীকৃত করে নিচ্ছিল বিমানকে, গোপনে।

অলকা।

হাসলেন বিমান, আপনি?

কেন, পছন্দ হল না?

সে কী কথা? অমন সুন্দর মুখখানা দেখলে পছন্দ হবে না এমন মানুষ আছে? ক'দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তাই ভাবলাম, রাগ করেছেন বুঝি।

রাগ? পাগল? আপনার ওপর দিয়ে যা গেল, দূর থেকে দেখছিলাম। তা ছাড়া আপনাকে আগলে রাখছিলেন আর একজন। তাই নিজেকে গুটিয়ে রাখছিলাম।

বিমান বুঝতে পারলেন। কুন্তলার কথা বলছেন অলকা। কিন্তু কুন্তলার উপস্থিতি তো জগদীশের অন্তিম সময়ে অনিবার্য ছিল। অলকাও এতদিনে নিশ্চয়ই সেটা ধরতে পেরেছেন। তবু কথাটা মনে করিয়ে দিলেন অলকা।

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো একটা সম্ভাবনা বিমানের মাথায় খেলে গেল। অসূয়া। কিন্তু অলকা কেন হিংসা করবেন কুন্তলাকে? কী আছে কুন্তলার, যা অলকার নেই?

প্রসঙ্গটা ওইখানেই থামিয়ে দিলেন বিমান।

জগদীশবাবুর মৃত্যুটা খুবই দুঃখজনক। কিছুই করা গেল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন অলকা। তারপর বললেন, একদিক থেকে ভালই হয়েছে। সারাক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচি করে সকলকে জ্বালাচ্ছিলেন। জগু বেচারাও ওঁকে নিয়েই সারাক্ষণ পড়ে থাকছিল। সত্যি বলতে কী, ওনার ছেলেরাও মনে মনে চাইছিলেন, উনি চলে যান।

অলকার কথাটা মিথ্যে নয়। বিমান ভয়ে ভয়ে ছিলেন, ছেলেরা এসে না অনর্থ করে। দেখা গেল ঠিক উল্টো। দুই ছেলেই চুপচাপ এসে ডেডবডির জিম্মা নিয়ে চলে গেল। এসেছিলেন আড়ম্বর করে, নিঃশব্দে বিদায় নিলেন জগদীশ।

অলকা বললেন. একটা বয়েসের পর কারও বেঁচে থাকা উচিত নয়। ঈশ্বর করুন, আমার যেন ওই দশা না হয়।

বিমান জবাব দিচ্ছিলেন না। বয়েসই যদি একমাত্র মাপকাঠি হয়, তা হলে অলকার টার্ন তাঁর আগে। মৃত্যু সম্বন্ধে কথা বলার অধিকারও তাঁরই বেশি।

অলকার চোখে হঠাৎ কীসের ছায়া পড়ল। দৃষ্টি সতর্ক হল। উঠে পড়ে অলকা বললেন, ঠিক আছে, এখন আসি, পরে কথা হবে।

অলকার দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন দিকে তাকিয়ে বিমান দেখলেন, কুন্তলা। কখন এসে আলশেয় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বিমান ডাকলেন, কী ব্যাপার? কখন এলেন? ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? চেয়ার খালি আছে। বসতে পারেন।

এতক্ষণ চেয়ার অকুপায়েড ছিল, খালি তো এইমাত্র হল। বসতে বসতে কুন্তলা বললেন।

গলায় পরিচিত একটা সুর শুনলেন বিমান। একটু আগে এই সুরেই কথা বলছিলেন অলকাও।

একইভাবে বিমান প্রসঙ্গ বদলালেন, জগদীশবাবুর মৃত্যুটা এমন নাড়া দিয়ে গেছে, সবই কেমন এলোমেলো হয়ে রয়েছে এখনও।

কুন্তলা আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নিলেন, তারপর রেললাইন ছাড়িয়ে দূরে কোথাও চোখ রেখে বললেন, বৃদ্ধদের নিয়ে যখন কারবার করতে নেমেছেন, মৃত্যুকে দেখতে না শিখলে তো চলবে না!

কারবার শব্দটা বিঁধল বিমানকে। অথচ কথাটা মিথ্যা নয়। তিনি যতই অস্বীকার করুন, এই বৃদ্ধাবাস ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কথাটা সইয়ে নিয়ে একটু ঠেস দেবার জন্যে বললেন, আপনি তো নার্স ছিলেন। অনেক মৃত্যু দেখেছেন। মৃত্যু দেখে আর ভাবান্তর হয় না নিশ্চয়।

ভুল। প্রতিটি মৃত্যুই পৃথক ও অনন্য। জগদীশবাবুর মৃত্যুটাই ধরুন। বিনা চিকিৎসায় একটি মানুষ সকলের মধ্যে মারা যাচ্ছে, আপনি, আমি এমনকী ডাক্তারবাবুও চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও। মনে হয় না এটা বিধিলিপি? ডেসটিনিকে আমরা স্বীকার করি না, অথচ কখনও কখনও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যায়, আমরা কত অসহায়!

বিমান গ্লানিতে ডুবে গেলেন। কুন্তলা কি জানেন, ডাক্তারবাবু কেন আসেননি? জগদীশের বিধিলিপি নয়, পিন্টুর অদৃশ্য তর্জনীই একটি অসহায় সমর্পণের মূল কারণ? যাকে আমরা বিধিলিপি বলি, তা আসলে কার্যকারণের সূত্রে সতত নিয়ন্ত্রিত।

বিমান বললেন, তা হলেও অপরাধী লাগছে। মনে হচ্ছে কিছুই করা গেল না।

হয়তো। কিন্তু করা হলেও ওনাকে বেশিদিন রাখা যেত না। অসুস্থ মানুষের পাশে থাকতে থাকতে, তাদের সঙ্গ দিতে দিতে আমাদের মধ্যে একটা কর্তব্যবোধ তৈরি হয়ে যায়। এক ধরনের দার্শনিকতাও। কাজেই কাজের শেষ। বাকিটুকু চিন্তা না করাই ভাল।

বিমান ভাবছিলেন, একটু আগেই অলকা বসেছিলেন, জগদীশের মৃত্যু তাঁকে অন্যভাবে স্পর্শ করেছে। অলকা তাঁর নিজের জায়গা থেকে না নড়ে দেখছেন। ব্যক্তিস্বার্থ তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে। কুন্তলার দেখা নৈর্ব্যক্তিক। একটি মৃত্যু হিসেবেই জগদীশের চলে যাওয়াকে দেখছেন কুন্তলা।

হঠাৎ বিমানের মনে হল, হাসপাতাল, নার্সিংহোম-এ যাওয়ার প্রয়োজন একেবারে হয়নি তা তো নয়! সেখানে কিছু সেবিকার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগও হয়েছে। তারাও কি কুন্তলার মতোই ভাবে? জীবন ও মৃত্যু তাদের চৈতন্যেও এতখানিই গভীরে বিচরণ করে? না কি কুন্তলা অন্যদের থেকে বিশিষ্ট? কুন্তলা অনন্যা?

জিজ্ঞেস করে ফেললেন, আপনি নার্স, সেবিকা, এটুকুই বলেছেন। কোথায় ট্রেনিং নিয়েছেন, কোন হাসপাতালে কাজ করেছেন, এ সব গল্প তো শোনালেন না?

একটা হাসি মেঘের কোণে লেগে থাকা আলোর মতো কুন্তলার ঠোঁটে বসতে না বসতেই উড়ে গেল।

সন্ন্যাসীরা জানেন তো, পূর্বাশ্রমের কথা বলেন না। আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আপনাদের এই বৃদ্ধাশ্রম। বাকিটুকু নাই বা শুনলেন?

২১

অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর, উত্তেজিত বাদানুবাদ। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে বোঝা যায় না কোনটা ঘুমের ভেতর আর কোনটা বাইরে, কতখানি স্বপ্ন আর কতটুকুই বা বাস্তব।

ঘুম আসতে দেরি হয়েছিল। বার বার বাথরুমে গেছেন। তিনি যে বাথরুমটা ব্যবহার করেন সেটা বাইরে, খোলা ছাদ পেরিয়ে যেতে হয়। বৃষ্টি একেবারে থামেনি। যাওয়া-আসা করে মাথায় জলও লাগিয়েছেন। ভয় হচ্ছিল, ঘুম থেকে উঠেই শুরু হয়ে যাবে হাঁচি।

জগদীশের ঘটনাটা ভেতরে ভেতরে নাড়া দিয়ে গেছে বিমানকে। মৃত্যুকে সামনে বসে প্রত্যক্ষ করেননি কখনও। মৃত্যুকে কল্পনা করেছেন। অবচেতনে অনুভবও করেছেন। কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়ানো যে সম্পূর্ণ অন্য অভিজ্ঞতা, সেটা প্রথম টের পেলেন বিমান।

জগদীশের মৃত্যুটা বিশিষ্ট আরও একাধিক কারণে। নিজেকে এখনও ক্ষমা করতে পারেননি বিমান। মনে হচ্ছে তাঁরই ত্রুটিতে বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন জগদীশ। তিনি নিজেই যদি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতেন! দেরি হয়ে গেল। কিছুই করা গেল না।

জগদীশের মৃত্যু পিন্টু সম্বন্ধেও নতুন করে ভাবতে শেখাল বিমানকে। তাঁরই ভাই পিন্টু, অঙ্ক না জানা পিন্টু, গোঁয়ার পিন্টু, গানপাগল পিন্টু। মাঝে বেশ কয়েক বছর ভাইয়ের সঙ্গে সেই ভাবে যোগাযোগ ছিল না। নতুন করে যোগসূত্র স্থাপিত হল রিটায়ার করার পর, বিমান যখন আবার মোহনপুরে আসা শুরু করলেন। জমিবাড়ি নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হল। বৃদ্ধাশ্রম। তার পরিকল্পনা ও প্রয়োগ।

পিন্টুকে কি সত্যিই চেনেন বিমান? বিমানের ঘোর সন্দেহ, পিন্টু ইচ্ছে করেই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। তিনিও যাতে যোগাযোগ না করেন, সেইজন্যেই তাঁকেও ফোন করতে বারণ করেছিল। কেন এমন করল পিন্টু? ও কি চেয়েছিল জগদীশ সেই রাত্রেই মারা যান? এই যে নতুন শর্ত, এককালীন টাকা নিয়ে বোর্ডার রাখা, সেটা তখনই লাভজনক হবে যখন বোর্ডাররা বেশিদিন বৃদ্ধাবাসে থাকবার আগেই তাঁদের পৃথিবীবাসের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। জগদীশ অসুস্থ ছিলেন। এমনিতেই আয়ু বেশিদিন ছিল না। চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করলেও হয়তো সে রাতে জগদীশকে বাঁচানো যেত না। কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে বসে রইল পিন্টু। যেন জগদীশ খাদের ধারে দাঁড়িয়ে টলছিলেন। পেছন থেকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিল পিন্টু।

ভাই নয়, চেনা কোনও মানুষ নয়, পিন্টুকে এক দক্ষ হত্যাকারী হিসেবে ভাবতে শুরু করেছেন বিমান।

এখানে এসে বিমান কিন্তু ভাল ছিলেন। সকাল থেকে রাত, কাজে ব্যস্ত থাকতেন। নতুন নতুন আবাসিক। তাদের সাহচর্য। তাদের প্রয়োজন। জীবনের অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলেন।

জগদীশের মৃত্যু সব তছনছ করে দিল। ফিরে এল অনিদ্রা, ঘুমের ট্যাবলেট, জাগরণজনিত ক্লান্তি, এবং এক ভাল-না-লাগা। সকালে উঠতে দেরি হয়ে যায়। ঘুম ভাঙলেও উঠতে ইচ্ছা করে না। কাজের উৎসাহটাই যেন হারিয়ে গিয়েছে।

আজকেও শুয়ে শুয়ে অনেকের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলেন, অথচ উঠতে ইচ্ছে করছিল না। দরজা বন্ধ, ভেতরটা অন্ধকার। মনে হচ্ছিল এখনও রাত, অথবা সবে ভোর হল। এই সময়ে কে আর গন্ডগোল বাধাতে আসবে? নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছেন। তাহলে আর একটু শুয়ে থেকে স্বপ্নটাকে টেনে বাড়ানো যাক।

দরজা ধাক্কানোর শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিমান। জগু।

দরজা খুলুন। শিগগির নীচে যেতে হবে। খুব গন্ডগোল।

ঘড়ি দেখলেন বিমান, আটটা। এত বেলা হয়ে গেছে? গায়ে পাঞ্জাবি চাপিয়ে দরজা খুলে দেখলেন জগুর চোখ বিস্ফারিত। হড়বড় করে জগু যা বলে গেল, তার একটাও বিমান বুঝতে পারলেন না। বিপদে পড়লে, উত্তেজিত হলে জগু মাতৃভাষা ওড়িয়ায় বক্তব্য পেশ করে। জগুকে না থামিয়ে মন দিয়ে জগুর কথা বোঝার চেষ্টা করলেন। যে টুকু ধরতে পারলেন সেটা দরজা খোলার আগেই জগু বলেছিল, নীচে গন্ডগোল, এখনই যেতে হবে।

মুখে চোখে জল দেবার সময় নেই। কোনও রকমে স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে জগুর পেছন পেছন নীচে নেমে দেখলেন এক নাটক।

চট-বস্তা-ছেঁড়াকাপড় জড়ানো একটা পুঁটলি সামনের চাতালে নামানো। প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। ভাল করে লক্ষ করে বুঝলেন, পুঁটলির একদিক থেকে একটা মাথা উঁকি মারছে। মাথা ভরতি পাকা চুল। মন দিয়ে দেখলে, ক্ষীণ নিঃশ্বাসের সঙ্গে পেটের ওঠানামা বোঝা যাচ্ছে।

বলতে গিয়েছিলেন 'কী' এ'টা! সামলে নিয়ে বললেন, এ কে?

চাতালের ওপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা ছেলে, কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়েস। একজন বলে উঠল, বুড়ি স্টেশনে পড়েছিল। হেগে মুতে নোংরা করছিল। পাড়ার ছেলেরা ভাবলাম, এখানে তো আশ্রম রয়েছে, বুড়োবুড়িদের এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কী হতে পারে? তুলে নিয়ে এলাম।

অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, চল চল দেখছিস কী? ফেলে রাখলে বুড়ি বাঁচবে না। ভেতরে নিয়ে ওনাদের জিম্মা করে আমাদের দায়িত্ব শেষ। এই যে ভাই, কোথায় কোন ঘরে রাখব দেখিয়ে দাও তো।

শেষ কথাগুলো জগুকে উদ্দেশ করে বলা।

জগু বিমানের দিকে তাকাল। বিমান চোখ সরিয়ে নিলেন। এরা প্রস্তুত হয়েই এসেছে, না নিলে ঝামেলা করতে পারে। ফেলে রেখে চলেও যেতে পারে, আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। মরে গেলে দলবল পাকিয়ে তুলকালাম করবে।

ভেতরে অন্য একটা চিন্তাও পাক খাচ্ছিল। তাঁরা তো বৃদ্ধাশ্রম বানিয়েছেন। গৌতমদের বৃদ্ধাশ্রম দেখে এসেছেন বিমান। ওরা ভিখিরি নেয় না। কোনও অনাথ দুঃস্থ মহিলা ঘাড়ে এসে পড়লে তাকে কি ফিরিয়ে দেয়? ব্যবসা করতে নেমেছেন তাঁরা। কিন্তু মানবিকতাবোধকে বিসর্জন দিয়ে তো নয়। এই বৃদ্ধাকে আশ্রয় দিয়ে, সেবা শুশ্রূষা করে, একটু সুস্থ হলে তাঁর ইচ্ছা মতো কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসা যায়। তারজন্য কি অনেক অর্থব্যয় করতে হয়?

বিমান দ্রুত চিন্তা করছিলেন। নিজেকে প্রশ্ন করে বিমানের মনে হল, বৃদ্ধাকে আশ্রয় দিলে বিবেকের কাছেও নির্মল হয়ে উঠবেন বিমান। জগদীশ মারা গেছেন, তাঁর অসুস্থতার সময় যা করা উচিত ছিল, তা করা হয়নি। বৃদ্ধাকে আশ্রয় দিলে, তার জন্য যথাসাধ্য করলে, সেই পাপ খানিকটা স্খলন হবে।

আবার অন্য আবাসিকরা কী মনে করবেন সেই চিন্তাটাও তাড়াতে পারছিলেন না। জগদীশের সময়ই অলকা এবং অন্যান্য কয়েকজনের

প্রতিক্রিয়া বিমান লক্ষ করেছেন। বার্ধক্যে কি মানুষ বেশি স্বার্থপর হয়ে ওঠে? কুন্তলা ব্যতিক্রম। বাকিদের দেখে বিমানের সেই বিশ্বাসই ক্রমশ বদ্ধমূল হচ্ছে।

কী ব্যাপার? এখানে এত লোকজন কেন? এটা কী?

পিন্টু। কখন এসেছে, চিন্তায় ডুবে ছিলেন, লক্ষ করেননি বিমান।

বিমান ভাঙলেন, এই বৃদ্ধা প্ল্যাটফর্মে পড়েছিলেন। ওখানে দেখার কেউ নেই। এঁরা নিয়ে এসেছেন এখানে রেখে দিয়ে যাওয়ার জন্য।

কেন? আমাদের এখানে কেন? এটা কি দাতব্য চিকিৎসালয়? খিঁচিয়ে উঠল পিন্টু।

বৃদ্ধাশ্রম করা হয়েছে, বুড়োবুড়িদের থাকতে দেওয়া হচ্ছে। আর লোকাল কেউ এলেই দোষ?...এই, তোরা হাত গুটিয়ে দেখছিস কী? যা, ঢুকিয়ে দে।

পল্টু। এতক্ষণ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল।

তা হলে, সমস্তটাই পল্টুর গেম প্ল্যান?

হকচকিয়ে গেল পিন্টু। নিজেকে গুছিয়ে নিতে সময় নিল। তারপর সরু গলায় চিলচিৎকার জুড়ে দিল।

পল্টু তুই! তুই-ই তা হলে সবকিছুর পেছনে? আমরা বৃদ্ধাশ্রম বানিয়েছি কি চ্যারিটি করার জন্যে?

তা হলে কি ব্যবসা করার জন্য?

আলবাৎ। বাড়িটা পড়েছিল, জমিটুকুও বাগিয়ে নেবার তাল করেছিলিস তুই। তখনই বৃদ্ধাশ্রম করার প্ল্যান নেওয়া হল। এখন উদয় হয়েছিস কাঠি করার জন্যে। বেরো, বেরো বলছি এখান থেকে।

চলে যাবার জন্যে তো আসিনি মামা। নাকের ডগায় রমরমিয়ে ব্যবসা করছ, পাড়ার ছেলেদের কিছু ঠেকাচ্ছ না, এ তো চলতে দেওয়া যায় না। মালকড়ি ছাড়ো। আমরাও বখরা পাই। নইলে ওই বুড়িকে তোমাদের ঘাড়ে ফেলে রেখে চলে যাব। বেশি দূরে যাব না। দেখব তোমরা কী করো। বেগড়বাঁই দেখলেই আবার আসব। তখন পাড়ার ছেলেরা উত্তেজনার বশে কিছু করে ফেললে, আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

পল্টু তুই, পল্টু তুই...উত্তেজনায় জিভ আটকে গেল পিন্টুর। ভিড়ের পেছনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল পল্টু।

হঠাৎ পেছন থেকে গম্ভীর গলায় কে বলে উঠল, কী ব্যাপার। সাতসকালে এত হইচই কীসের?

বিমান ঘাড় উঁচিয়ে দেখলেন সন্তোষ। সঙ্গে জনাবিশেক ছেলে। প্রত্যেকেই শক্তসমর্থ। এসে পজিশন নিয়ে নিল।

সন্তোষকে দেখে বিমান এগিয়ে গেলেন।

দেখুন তো ভাই, এই বৃদ্ধাকে এরা প্ল্যাটফর্ম থেকে তুলে এনেছে। বলছে হোমে ঢুকিয়ে দিয়ে যাবে।

সে কী কথা? এটা কি হাসপাতাল না নার্সিংহোম? না না, এখানে ওনাকে রাখা যাবে না।

পল্টু? পল্টুকে দেখা যাচ্ছে না? ভিড়ের মধ্যে খুঁজলেন বিমান। কখন পায়ে পায়ে পিছু হটে অদৃশ্য হয়ে গেছে পল্টু।

সঙ্গে আসা ছেলেগুলো তখনও দাঁড়িয়ে। কী করবে বুঝতে পারছে না। সন্তোষ ওদের হুকুমের স্বরে বললেন, তোদের দাদা ওল্ডএজ হোম আর হাসপাতালের তফাতটাও শেখায়নি? যা, এত দূর যখন বয়ে নিয়ে এসেছিস, কষ্ট করে আড়ংঘাটা রুরাল হসপিটালে বুড়িকে দিয়ে আয়। কমল, যা তো, এদের সঙ্গে করে নিয়ে যা। দেখিস, মাঝরাস্তায় ফেলে যেন পালিয়ে না যায়।

ইতস্তত করছিল ছেলেগুলো। কমল সামনে এসে ধমক লাগাল, কী হল, কথাটা কানে গেল না? তোল, কাঁধে তোল।

বিমান হাত চেপে ধরলেন সন্তোষের, আপনাকে কী বলে যে...।

হাত ছাড়িয়ে নিলেন সন্তোষ—আপনাদের বলে গিয়েছিলাম কোনওরকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট দেখলেই খবর দেবেন। আমার কথা শুনলেন না। ভাগ্যিস যেতে যেতে রমেনের চোখে পড়েছিল। আর একটু দেরি হলেই...। যাক, সাবধানে থাকবেন। পল্টু ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। আবার আসবে, এবারে খবর দিতে ভুলবেন না।

সকালবেলা এলেন, একটু চা খেয়ে যান।

আজ থাক, তাড়া আছে। অন্য কাজে ফেঁসে আছি। পরে এক দিন আসব।

দুপুরে ভাতটাত খেয়ে পাশাপাশি বসলেন দু'জনে। গত মাসের জমা খরচের হিসাব বের করে এনেছেন বিমান। টেবিলে কাগজপত্র সাজানো হয়েছে।

এই প্রথম লাভের মুখ দেখেছে হোম। খরচখরচা বাদ দিয়ে ছ'হাজার টাকার মতো লাভ হয়েছে, পিন্টু দৃশ্যতই খুশি। এখন বোর্ডারের সংখ্যা নয়। অকুপ্যান্সি বাড়লে লাভের অঙ্কও বাড়বে।

পিন্টু পা ছড়িয়ে দিল—এ বারে এক্সপ্যানশনের কথা ভাবতে হবে আমাদের।

ছাদটা তো ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। হেসে খেলে তিনখানা ঘর তুলে ফেলা যায়।

এবারের ঘরগুলোয় অ্যাটাচড বাথের ব্যবস্থা করতে হবে।

মিত্রার সঙ্গে কথা হয়েছে?

হ্যাঁ, তোমার ফোন পেয়েই ওকে খবরটা দিয়েছি। ও-ও খুশি। ব্রতকেও জানিয়েছি।

শুনতে ছ'হাজার। কিন্তু এটার দাম অনেক। এটাই টার্নিং পয়েন্ট। আর পেছন ফিরে তাকানো নয়।

তুমি না থাকলে হত না দাদা। যেভাবে পড়ে থেকে তুমি দাঁড় করিয়েছ, পুরো ক্রেডিটটাই তোমার।

যাক, স্বীকার করেছে। পিন্টুর অবশ্য এই একটা গুণ, পেটে মুখে এক।

পিন্টু বলল, মিত্রার এক বান্ধবী একটা কথা বলছিল। আইডিয়াটা ভেবে দেখবার মতো।

কী কথা?

আজকাল অনেক বয়স্ক কাপল একলা থাকে। তাদের জন্য বৃদ্ধাশ্রমে ডাবলবেডেড রুমের প্রভিশন করা যায়। ভাবতে গেলে কিন্তু প্রফিটেবল, তুমি ডাবল চার্জ করছ, অথচ একটা ঘরেই হয়ে যাচ্ছে।

চারটে বাইশের আপ লোকাল চলে গেল, দেখতে দেখতে ট্রেনগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে বিমানের। এটা শান্তিপুর লোকাল, এর পরেরটা রাণাঘাট, ভিড় কম থাকে, সন্ধ্যার পর থেকে অবশ্য সব ট্রেনেই ভিড়।

পিন্টু আজ উৎসাহে ফুটছে। বলল, আমাদের নতুন স্কিমটা ভাল হয়েছে, কী বলো?

কোন স্কিম?

ওই যে, এককালীন টাকা জমা দিয়ে চিরজীবনের জন্য নিশ্চিন্ত।

বিমান গম্ভীর হয়ে গেলেন। জগদীশ স্কিমে ছিলেন। জগদীশের অকাল মৃত্যু জমার ঘরে অনেকগুলো টাকা যোগ করেছে। পিন্টু কি এ বার থেকে সকলকেই স্কিমে আনার চেষ্টা করবে?

জগদীশবাবুর মৃত্যুটা খুবই দুঃখজনক।

দুঃখজনকের কী আছে? ভুগছিলেন। আজ না হোক কাল তো যেতেই হত।

কিন্তু ওইভাবে যাওয়া?

কীভাবে?

বেঘোরে মারা গেলেন ভদ্রলোক। বিনা চিকিৎসায়। একটা ওষুধ অবধি পড়ল না।

পিন্টুর দিকে ঘুরলেন বিমান। বললেন, তোকে সে দিন রাত্তিরে ফোন করেছিলাম। তুই বললি, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে নিজেই কথা বলবি। আমাকে ফোন করতে বারণ করলি। বলেছিলি কথা?

হ্যাঁ, বলেছিলাম তো। জানতে চাইলাম, কেমন আছেন। উনি বললেন, স্টেবল আছেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই।

তাই? কিন্তু ডাক্তারবাবু যে বললেন, তুই-ই ওনাকে বলেছিস জগদীশবাবু ভাল আছেন। রাত্তিরে না গেলেও চলবে।

ডাক্তারবাবু এই কথা বললেন? ভুলে গেছেন। বয়েস হয়েছে তো! এবারে অল্পবয়েসী কোনও ডাক্তার খুঁজতে হবে।

পিন্টুর মুখচোখ দেখে বিমানের পরিষ্কার মনে হল, ও মিথ্যা কথা বলছে।

ধীরে, খুব শান্ত গলায় বিমান বললেন, দেখ, এই হোম আমাদের দু'জনের। দু'জনের সিদ্ধান্তই এখানে গুরুত্ব পাওয়া উচিত। ব্যবসা থাকবে ঠিকই, কিন্তু মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে নয়।

পিন্টু মাথা নামাল, বিমানের চোখে চোখ না ফেলে বলল, একটা ভুল ধারণা তোমার ভেঙে দিতে চাই দাদা, কিছু মনে কোরো না। এই হোমের মালিক আমি বা তুমি কেউই নই। মালিক মিত্রা আর ব্রত।

ঘুরে তাকালেন বিমান, তার মানে?

হ্যাঁ। তোমার অফিশিয়াল স্টেটাস কেয়ারটেকার কাম ম্যানেজার। মালিক মিত্রা আর ব্রত, আমি অবশ্য কেউ নই।

বিমানের মনে পড়ে গেল। একগাদা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিল পিন্টু, পড়েও দেখেননি বিমান। মিত্রাদের দান করে দিয়েছেন, এখন তাঁর স্টেটাস একজন কর্মচারীর বেশি কিছু নয়।

শব্দ করে হাসলেন বিমান। চমকে উঠল পিন্টু। হাসি থামিয়ে বিমান বললেন, ভালই তো। কিন্তু ম্যানেজারই বল আর কেয়ারটেকার, তার তো একটা মাইনে থাকবে। আমাকে কত টাকা মাইনে দিবি ঠিক করেছিস?

নির্বাক পিন্টুর মুখের ওপর প্রশান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিমান বললেন, ছ'হাজার টাকা। যে দিন থেকে জয়েন করেছি হিসাব করে মিটিয়ে দিস, এই মাসেই।

আজ সকালেও মনটা খিঁচড়ে ছিল, এখানে এসে ভাল হয়ে গেল।

পর পর তিনটে ছুটির দিন। শুক্রবার জন্মাষ্টমী, শনিবার ঈদ। রবিবার ধরলে তিন দিন। অর্পণের সোমবার অফ ডে। সেই হিসেবে ওর চার দিন। অবশ্য অফ ডে-তেও অর্পণ যায়। আজকাল অনেকেই যাচ্ছে।

শুক্রবার বাবার কাছে মল্লিকপুরে যেতে হয়েছিল, বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বৃষ্টি বাদলায় বাড়িটা ড্যাম্প হয়ে থাকে। ঠান্ডার ধাত, সর্দিকাশি লেগেই আছে। জ্বরও হয়েছিল, খবর পেয়ে শাওন নিজেই গিয়েছিল। ওষুধপত্র খাইয়ে, গরম জলে হাত-পা সেঁকে মনকে যতখানি পারে বুঝিয়ে ফিরে এসেছে। ফিরতে সন্ধে গড়িয়ে গিয়েছিল। বাচ্চাদের ঘুম পাড়াতে গিয়ে কখন নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছে, অর্পণ আর ডাকেনি।

কাল ভেবেছিল দমন আর দিউ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লে সময় পাবে। কাজে কাজে দূরত্বটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। ইচ্ছেটাও মরে আসছে। তেত্রিশ বছর বয়সে বার্ধক্য যেন ভেতরে ডালপালা মেলছে।

ছেলেমেয়ে দু'টো সব মাটি করে দিল। দুপুরে পড়ে পড়ে ঘুমল। রাত্তিরে বারোটা সাড়ে বারোটা অবধি হাহা হিহি করল। ছোটটা বেশি দুরন্ত। দিদিরও হয়েছে তেমনি। ভাই জন্মানো ইস্তক ওর বয়েস যেন দিনদিন কমে যাচ্ছে। শেষ অবধি দু'জনকেই দু'খানা থাপ্পড় কষিয়ে বিছানায় নিয়ে ফেলল শাওন। ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চেঁচাল খানিকক্ষণ। তারপর শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। অর্পণ টিভি দেখছিল। শাওন কাছে গেলে হাই তুলে বলল, কাল তো ভোরে উঠেই বেরনো, ক'টায় যেন অ্যালার্ম দিয়েছ ?

পাঁচটা।

তা হলে আজ থাক। কাল ফিরে এসে যদি সময় পাওয়া যায়...

রাগ হয়ে গেল শাওনের। কী অসুবিধা হত আধ ঘণ্টা জেগে থাকলে? ও যেন আর শাওনের কাছে আসতে উৎসাহ বোধ করে না। ক্লান্তি? সময়ের অভাব? অন্য কিছু নয় তো? বয়েসটা বিপজ্জনক!

সকালে উঠে সবাইকে টেনে টেনে তোলাও এক কঠিন কর্ম। রেডি হয়ে বেরুতে বেরুতে সাড়ে ছ'টা। সওয়া সাতটার লোকাল ধরতে পারা গেছে এই রক্ষে।

এখানে এসে মন ভাল হয়ে গেছে শাওনের।

বিমানকে পছন্দ করে শাওন। শ্বশুরেরও তার প্রতি একটা দুর্বলতা আছে। অন্যদের থেকে আলাদা করে দেখেন তাঁকে।

শাওনের ধারণা, অর্পণরা বিমানের প্রতি অবিচার করেছে। মানুষটা অন্যরকম, সন্দেহ নেই। স্ত্রী-সন্তানের প্রতি কর্তব্য ঠিকমতো করেননি, এটাও ঠিক। কিন্তু আর একটু সহানুভূতি দিয়ে আরও বেশি মমতা-স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধা দিয়ে যদি নন্দিতা, তপন, অর্পণ ওঁকে কাছে টেনে নিতেন, তা হলে বিমান নিজেকে শুধরে নিতেন। শাওন বিশ্বাস করে, বিমানের মধ্যে একজন স্নেহপ্রবণ মানুষ বাস করে, যে এখনও নিকটজনের কাছ থেকে একটু ভালবাসার জন্য হাহাকার করে।

শক্তিনাথকে দিয়েও বিমানকে চেনার চেষ্টা করে শাওন। শক্তিনাথও আপাতদৃষ্টিতে সংসারত্যাগী নিঃসঙ্গ, সাধু সন্ন্যাসী গোছের মানুষ। অথচ এই যে শাওন গেল, কী আগ্রহে শাওনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন মানুষটা! কোনও রকম উচ্ছ্বাস, ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেন না। অথচ চলে আসার সময় শাওনের হাতটা নিজের কপালের ওপর কত ক্ষণ ধরে রাখলেন! শাওনের ইচ্ছা করছিল না আসতে। শক্তিনাথই জোর করে পাঠালেন, বাচ্চাগুলো একা আছে যে মা! তুই না গেলে যদি মা মা করে কাঁদে! আমার জন্যে ভাবিস না। কোনও অসুবিধা হলেই তোকে খবর দেব। ভয় পাসনি, তোর বাবা এত সহজে মরবে না। পাপ তো জীবনে কম করিনি।

বহুবার বলেছে শাওন, অর্পণও। দমন আর দিউকে প্রাণের থেকেও ভালবাসেন বাবা। তবু তাদের কাছে এসে থাকবেন না।

এক বার জিজ্ঞেসই করে ফেলেছিল, জামাইয়ের কাছে এসে থাকতে কি তোমার সম্মানে বাধে বাবা? বাড়ি তো জামাইয়ের একার নয়, মেয়েরও। তোমার কি তাতে অধিকার কিছু কম?

শক্তিনাথ হেসেছেন। শাওনের মাথায় হাত রেখে বলেছেন, পাগলি কোথাকার! তোরা কি আমার পর? তা নয়। এখানে আছি, গাছ-গাছালি পাখ-পাখালির মধ্যে, খুব শান্তিতে আছি রে মা। প্রকৃতির থেকে আমাদের জন্ম, সেখানেই ফিরে যেতে হবে। একটুখানি কাজ এগিয়ে রাখা হল। তা ছাড়া, একটা বয়েসের পর মায়া কমিয়ে দিতে হয়। তাতে মায়া কাটাতে সুবিধা হয়। কষ্ট কম হয়।

বিমান সম্বন্ধে শক্তিনাথ শাওনকে বলেছেন, মানুষটা খারাপ নন রে। গৃহী-সন্ন্যাসী। এটা এক ধরন। আলগা আলগা ভাব, যেন কোনও কিছুতেই নেই।

লোকে এদের স্বার্থপর বলে ভুল করে। ভাবে, এরা আত্মসর্বস্ব, অন্যের সুখদুঃখের খোঁজ নেয় না। আসলে, সুখ বা দুঃখের বোধটাই এদের কম। অন্যের তো বটেই, নিজের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য। এরা আত্মসুখে লালায়িত নয়। দুঃখও এদের বিচলিত করতে পারে না।

ঠাণ্ডা নিরিবিলি জায়গাটা। চারিদিকে গাছগাছালি, পাখির ডাক, আবার রেললাইনের ধারে। খুব ভাল লাগছিল শাওনের। এত বছর বিয়ে হয়েছে, আসব আসব করেও আসা হয়নি। আজ এসে অবধি কেবলই বাবার কথা মনে পড়ছে।

মা দেখো, দিদি আমার চুল টেনে দিয়েছে।

রোদ্দুরে খেলছিল দমন, ফর্সা গাল লাল হয়ে আছে। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে নালিশ করল।

পেছন পেছন দিদিও হাজির—এই দেখো, আমার হাতে খিমচে রক্ত বের করে দিয়েছে তোমার গুণধর ছেলে।

দু'জনকেই ধমকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে চলল শাওন, বেলা হয়ে যাচ্ছে, খাবারের কত দেরি?

কেয়ারি করা বাগান, মোরাম বিছানো রাস্তা, তুলসীমঞ্চ। বাড়িটাও গেরুয়া রং-এ রাঙানো। শুভ্রবস্ত্র, ব্যাকব্রাশ চুল, চোখে মুখে পবিত্র ভাব। একেবারে মোহন্ত মহারাজ। ধূপধুনো চন্দনেরই যা অভাব। ভেতরে দেখে এসেছে অর্পণ। সাধনসঙ্গিনীরও অভাব নেই।

যতই অপছন্দ করুক, অর্পণকে স্বীকার করতেই হল লোকটার এলেম আছে। এই বয়সে, রিটায়ারমেন্টের পর অজ পাড়াগাঁয় এসে এমন একটা কর্মযজ্ঞে হাত দেওয়া, হাত দেওয়া শুধু নয়, সেটাকে দাঁড় করানো, ভেতরে ঝাঁঝ না থাকলে হয় না। মনে মনে প্রণাম ঠুকে দিল অর্পণ।

বাবাকে কোনওদিনই পছন্দের আসনে বসায়নি অর্পণ। স্কুল স্কুল করে জীবনটা কাটিয়েছে, কিন্তু সেটাও ভাল করে করতে পারেনি। বলবার মতো একটাও ছাত্র বের করতে পেরেছে? কোনও ছাত্র বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে? শিক্ষক হিসাবে কোনও রেকগনিশন পেয়েছে? বাবা একটা ফেলিওর। সেটাকে ঢাকবার জন্য নীতির খোলশ পরে থাকত। একটা হিপোক্রিট।

অর্পণের রোল-মডেল মা। মা না থাকলে সে বা তপু কারওই হয়ে ওঠা হত না। কী খাবে, কী পরবে থেকে পড়াশুনা ঠিক মতো হচ্ছে কি না, প্রাইভেট

টিউটর লাগবে কি না সমস্তটাই মা দেখত। দেখত, কিছুটা সাধ করে, কিছুটা দায়ে পড়ে। ওই রকম স্বামীর পাল্লায় পড়লে না দেখে যাবে কোথায়?

অর্পণ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। মা-র বদলে যদি বাবাকে রোল মডেল করতে হত? যদি দুরারোগ্য কোনও অসুখে মা ছোটবেলায় মারা যেত? বাবার পাল্লায় পড়তে বাধ্য হত দু'জনে। কোথায় থাকত শাওন, কোথায় যেত কলকাতা-কলেজ-সংগঠন?

কীভাবে ডুবিয়ে দিল? ভেবেচিন্তেই কথাটা পেড়েছিল। এমন ভাব করল, যেন ইচ্ছা থাকলেও পেরে উঠছে না। শাওন খেয়ে গেল। অর্পণ কিন্তু জানে, বাবা দেবে না বলেই দিল না। এত বড় বৃদ্ধাবাস, নতুন কনস্ট্রাকশন, ওপরে ট্যাঙ্ক, কল খুললেই জল—এমনি হয়? আকাশ থেকে পড়ে? ক্যাশ লাগে। ক্যাশ আছে পিন্টুকাকার? ওটা তো ছাপোষা কেরানি। সংসার খরচ জোগাড় করতেই হিমসিম খেয়ে যায়। কোথা থেকে পাবে এত টাকা? টাকা বাবার। ছিল। বের করছে। জলের মতো খরচা করছে। এত বছর ধরে যা রোজগার করেছে, একটা পয়সাও সংসারের জন্য খরচ করেনি! না জমে যাবে কোথায়?

তবে বাবার জন্য কিছু আটকে থাকেনি। ভেবেছিল হাত না বাড়িয়ে দিলে অর্পণ পারবে না। হয়তো যতখানি ভেবেছিল পারেনি। বাথরুমের ফিটিংস, রান্নাঘরের টাইলস, দেওয়ালের ডিস্টেম্পার, জানলা দরজার কাঠ অনেক কিছুতেই কমপ্রোমাইজ করতে হয়েছে। ইচ্ছেটাকে সাইজ করতে হয়েছে। আপাতত, যেমন যেমন জোগাড় হবে, একটু একটু করে বাড়িয়ে নেবে। শক্তিনাথ দেখে গেছেন, ওনারও পছন্দ হয়েছে। আনুষ্ঠানিক গৃহপ্রবেশ না হলেও পুজো করিয়ে নিয়েছে শাওন। এবার মাকে নিয়ে যাবে। মাকে না দেখানো অবধি সবই খালিখালি ইনকমপ্লিট লাগে অপুর।

সকালে পৌঁছে অবধি ভেতরে জ্বালাটা বাড়ছিল। যত দেখছিল ততই মনে হচ্ছিল, এই সমস্ত আয়োজনের আড়ালে রয়ে গেছে একটা বঞ্চনা। তাদের ঠকিয়ে বাবার এই কর্মোদ্যোগ। অবশ্য, বঞ্চনা ছাড়া কবে কোন তাজমহলটা হয়েছে শুনি?

আরও খারাপ লাগছিল শাওনকে দেখে। শাওন যেন খুশি হয়েছে। বাচ্চাদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে খেলছিল একটু আগে। ও কি ভুলে গিয়েছে বাবার অসহযোগিতা?

তপুকে দেখে চিরকালই অবাক লাগে অর্পণের। অন্যদের সামনে বাধ্য হয়েই দাদা ডাকতে হলেও চিরটাকাল তপু বলেই সম্ভাষণ করেছে অপু। আগে

জন্মে ও সবই বেশি বেশি পেয়ে যেত। মায়ের আদরই হোক, কিংবা টিচারদের অ্যাটেনশন। জয়েন্ট লাগিয়ে দিয়ে তো হিরো। ওই লাইনেই সেইজন্য হাঁটেনি অর্পণ। নিজের রাস্তা আলাদা করে নিয়েছে।

বাবাকে তো তপুও কম দেখেনি। বাবার জন্য কম সাফার করেনি। অথচ ও নিরুত্তাপ। অবশ্য তপুকে বাইরে থেকে দেখে চেনা শক্ত, হয়তো ভেতরে দুঃখটা পুষে রেখেছে। অন্যদের কাছে প্রকাশ করতে চায় না।

মা? মা কি বাবাকে ক্ষমা করেছে? আজ মা-ও এসেছে। কম কথা বলছে মা! ঘুরে ঘুরে সব দেখল। কোনও মন্তব্য করল না।

ভেতরে বোধ হয় খাবার ডাক পড়ছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল অপু।

একটা জীবনেই কি তার জীবন ঘুরে ঘুরে আসে?

প্রশ্নটা বহুবার বহুভাবে নাড়া দিয়ে গেছে তপনকে। ভেবেছে। উত্তর পায়নি।

বাবা! মানুষটাকে যতবার যত ভাবে বিচার করার চেষ্টা করেছে, কোনও বারই এক জায়গায় পৌঁছতে পারেনি। মনে হয়েছে একটাই মানুষ, অথচ এক এক দিক থেকে আলো ফেললে এক এক রঙের বিচ্ছুরণ। মানুষ এত বৈচিত্র্যময় হয়?

ছোট ছিল যখন, বাবার সম্বন্ধে এক রকম অ্যাসেসমেন্ট ছিল। রাগী, খেয়ালি, নিস্পৃহ। সংসারের দিকে নজর নেই। হঠাৎ হঠাৎ উদয় হত, কিছুদিন কাটিয়ে, মা-র সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে চলে যেত। বরং থাকলেই তটস্থ হয়ে থাকতে হত। চলে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচত সকলে।

কোনও জিনিসই কাছ থেকে দেখলে ঠিক মতন দেখা যায় না। একটা হিরের আংটিও চোখের থেকে দূরে নিয়ে আলোয় দেখতে হয়। বাবাকে, বাবা-মায়ের সম্পর্ক তপন নতুন করে বিচার করল কলকাতায় চলে যাবার পর।

কোনও বিচারই একপক্ষের মতামত শুনে করা উচিত নয়। প্রথমে বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো নিয়ে পড়ল তপন। বাবা স্বার্থপর, বাবা সংসার দেখে না, বাবা ছেলে-বউয়ের দায়িত্ব নেয় না, মায়ের এই অভিযোগগুলোয় কোনও খাদ নেই। মায়ের কন্ট্রিবিউশন নিয়েও প্রশ্নের অবকাশ নেই। মা না থাকলে, তপন আজ কী করত বলা কঠিন!

কিন্তু কষ্টিপাথরে বিচার করলে মা-র রোলটাও কি নিখাদ? বাবাকে ভিলেন হিসেবে চিহ্নিত করায় মা-র কি কোনও ভূমিকা ছিল না? বাবার সম্বন্ধে

অশ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য করে একটু একটু করে বাবার প্রতি দুই সন্তানের মনে একটা বিতৃষ্ণা তৈরি করা কি খুব সুস্থতার লক্ষণ?

আরও খুলে বলতে গেলে, এটা কি মায়ের গেমপ্ল্যান ছিল না? বাবার কাছ থেকে যা পেল না, সেটাই ছেলেদের কাছ থেকে পুষিয়ে নিতে বাবার ওপর প্রতিশোধও নিয়ে নিল মা। গোপনে। ছেলেদের কাছে আড়াল করে।

তপন আরও ভাল করে ব্যাপারটা বুঝতে পারল, নিজে যখন সংসারে মাথা গলাল। মিতালি সচ্ছল পরিবারের মেয়ে। ডাক্তার ছেলে দেখেই ওর বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মিতালির মোহভঙ্গ হল। তপনকে দিয়ে ওর সমস্ত অ্যাম্বিশন চরিতার্থ করা যাবে না, মিতালি বুঝতে পারল। তখন মিতালিরও গেমপ্ল্যান শুরু হল।

না, মিতালি পিউকে তপনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করেনি। নিজেও আলাদা রাস্তা খুঁজে নেয়নি। সেজন্য তপন মিতালির কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু মিতালি তপনকে নিজের ইচ্ছে মতো গড়ে পিটে নিতে চাইল। তপনকে বদলে দিতে চাইল।

তপন বেঁকে বসল। তপন নিজের সীমাবদ্ধতা জানে। সে মহাপুরুষ নয়। তারও ছোট-ছোট লোভ-ইচ্ছা-কামনা আছে। কিন্তু সেইগুলো পাওয়ার জন্য নিজেকে বদলে ফেলতে পারবে না। সাধ্যের মধ্যে হলে, ক্ষমতায় কুলোলে পাবে, না হলে ছেড়ে দেবে।

মিতালি প্রথমে জোর করেছে, তারপর কান্নাকাটি করেছে, শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছে। গোপনে অবশ্য এখনও আশা পোষণ করে, কোনও না কোনও দিন তপনও ধড়মড় করে উঠে বসবে। তবে স্বপ্ন ছাড়া কোন মানুষটাই বা বাঁচে?

এইখানে এসে বাবাকে নতুন করে চিনতে পারে তপু। নিজেকে দিয়ে চিনতে পারে, নিজের ভেতরে চিনতে পারে। একসময় মনে হয় বাবার ভূমিকাটাই তার জীবনের মধ্য দিয়ে অভিনীত হচ্ছে।

বাবারও তো কিছু বক্তব্য ছিল! নিজস্ব কোনও জীবনবোধ! সেটা মা-র সঙ্গে মিলবেই এমন কথা নেই। বাবা বাবা এবং মা মা। দু'টো আলাদা মানুষ। মা বাবাকে মা'র রাস্তায় আনতে চেয়েছিল। বাবা নিজের মতো করে জীবন যাপন করেছে। মা-র সেইখানেই আপত্তি। আপত্তিটা মা জোরের সঙ্গে জানিয়েছিল। বাবা নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল।

এই যে বৃদ্ধাশ্রম, মোহনপুরের মতো জায়গায় বাবা তৈরি করল...হ্যাঁ, পিন্টুকাকাকে তো চেনে ছোট থেকে, ওর পক্ষে এ-কাজ কোনও ভাবেই হত

না... এই বয়েসে, সে জন্যও টুপি খুলে অভিবাদন না জানিয়ে কি পারা যায়?

কিন্তু অভিবাদনেই সব শেষ হয়ে যায় না। কুচকাওয়াজের পরেও যেমন বুক অবধি উঁচু খুঁটিগুলো বহু দিন অবধি থেকে যায়, বাবার এই বৃদ্ধাশ্রমের স্থাপত্য দু'হাতে সরালে পেছনে অন্য একটা সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সত্যটা এই, বাবার ভেতরেও একটা সৃষ্টিশীল সত্তা ছিল। যে সৃষ্টিশীলতা বাবাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে মোহনপুরের প্রাইমারি স্কুল থেকে গ্রামের বোর্ডিং-এ, ছাত্র তৈরির নেশায়। বাবা পারেনি। একটা ছাত্রকেও তৈরি করতে পারেনি বাবা। একটা স্কুলও বাবার প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্তম্ভ নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই উদ্ধত। কিন্তু সব শিল্পীই কি শেষ পর্যন্ত পিকাসো হয়? সারাজীবনের সাধনা তাতে কি অর্থহীন হয়ে যায়? প্রতিষ্ঠাই কি শেষ কথা?

বাবা যে পারে, তার প্রমাণ ওই বৃদ্ধাশ্রম। বাবার সৃষ্টিশীলতার শেষ নিদর্শন। বাবা কি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী? না। বাবা এক কারিগর, যার কাছে সংসার-সন্তান-স্ত্রী-আরাম সব কিছুর ওপরে তার সৃষ্টি।

বিমানকান্তি রক্তে স্পন্দিত হতে থাকেন তপনের।

ভালবাসা কি কখনও ছিল না? ছিল, একদম প্রথম দিকটায়। তীব্র ভাবে কাছে চাইতেন, আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইতেন। কিছু করার দরকার নেই, শুধু তাঁর কাছে পড়ে থাক, প্রয়োজন হলে তিনি ভিক্ষা করেও খাওয়াবেন, এই রকম আকর্ষণ ছিল মানুষটার। দেখতেও অনিন্দ্যকান্তি ছিল। যে দেখত, ফিরে তাকাত। গর্বে বুক ফুলে উঠত নন্দিতার। দামি গয়নার মতো সকলকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করত।

হঠাৎই সুর কেটে গেল। নন্দিতার বোধোদয় হল। বুঝলেন, শিকল মেনে নেবার পাত্র এ নয়। মোহনপুর থেকে ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েও নিজের করে পেলেন না নন্দিতা।

একটা প্রচণ্ড রাগ তখন নন্দিতাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। মানুষটাকে ভাষায় কাজে ব্যবহারে বিদ্ধ করেছেন। শান্তি হয়নি। আছড়ে পড়েছেন বুকে, ক্ষতবিক্ষত করেছেন। আঘাত ও দিক থেকেও এসেছে। দু'টো বন্য জন্তুর মতো যুদ্ধ করেছেন দু'জনে।

ছেলেরা বড় হতে হিংস্রতা কমে এল। ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত সমুদ্র ক্রমশ শান্ত হয়ে এল। দূরত্ব বাড়তে লাগল। প্রেম এবং ঘৃণা দু'য়েরই প্রাবল্য স্তিমিত হয়ে এল। দু'জনে দু'জনের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে থাকলেন।

যখন মোহনপুরে এল, তাঁকে বলে এসেছিল। ভাসাভাসা। বিস্তারিত কিছুই নয়। ছেলেদের কাছে, ছেলের বউদের কাছে জেনেছেন।

বউমারা, বিশেষত শাওন ফোন করে খবরাখবর নিত।

চিঠি লেখার অভ্যেস কোনও কালেই ছিল না। মুক্তোর মতো হাতের লেখা। তাকিয়ে থাকতে হয়। গোড়ার দিকে লোভ হত, ওই রকম একটা চিঠি আসুক তাঁর নামে, খুলতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠুক, পড়তে গিয়ে ভিজে উঠুক চোখের কোল। ইচ্ছাটা পূরণ হয়নি। ফোন এসে মানুষকে চিঠি লেখাই ছাড়িয়ে দিল। তাও ক'টা ফোন করেছে সারা জীবনে? কর গুনে বলে দিতে পারেন। আর এই ছ'টা মাসে? একটাও নয়।

একটাও নয়! একদিনও কোনও কারণে কোনও অবস্থাতেই তাঁকে ফোন করবার প্রয়োজন অনুভব করল না মানুষটা। এতখানি মূল্যহীন তুচ্ছ হয়ে গেছেন নন্দিতা?

প্রশ্ন উঠতে পারে, নন্দিতাও তো ফোন করেননি! না, করেননি। অভিমান করার অধিকার তাঁর। তিনি ঘুরপথে যে খবর পান তা কেন সরাসরি তাঁর কাছে পৌঁছবে না? তিনি কি শাওন মিতালির চেয়েও পর?

গ্রামের ইস্কুলে পড়াত যখন, মাঝেমাঝে বেশ কয়েক সপ্তাহ আসত না। হঠাৎ এসে উদয় হত। মুখ টিপে হাসতেন নন্দিতা। পারল? পারল তাঁকে ছেড়ে থাকতে? স্নান করে চুলে গন্ধতেল মাখতেন, শোবার আগে জামাকাপড় বদলাতেন।

এত দীর্ঘ সময় কখনও তাঁকে ছেড়ে থাকেনি। এত দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে একটাও বাক্য বিনিময় হয়নি, এমনটাও এই প্রথম। জীবন থেকে তাঁকে বাদই দিয়ে দিয়েছে এক রকম!

প্রেশারটা ইদানীং বেশির দিকে যাচ্ছিল, ওষুধ খেতে হত। নিয়ম করে খাচ্ছে তো? কোষ্ঠকাঠিন্যের ধাত, ইসবগুলের ভূষি না খেলে বাথরুমে বসে থাকতে হয়, অর্শ বেড়ে রক্তপাতও হতে দেখেছেন। খেয়াল রাখছে তো?

ভাবনাগুলো মাথার মধ্যে এলেও জোর করে সরিয়ে দিয়েছেন। ফোনের দিকে হাত এগিয়ে গেছে, নাম্বারটাও শাওনের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন, হাত টেনে নিয়েছেন। দেখা যাক, কত দিন যোগাযোগ না করে পারে।

তাই শাওন যখন উদ্যোগ নিয়ে সবাইকে জড়ো করছিল, মোহনপুরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, প্রথমে না-ই করে দিয়েছিলেন নন্দিতা। ভেবেছিলেন বেশ করেছেন।

কিন্তু না করার পর, ভেতরে ভেতরে এতখানি চূর্ণ হয়ে যাবেন বুঝতে পারেননি। দুই ছেলে যখন এল রাজি করাতে, নন্দিতা দেখলেন, রাজি তিনি হয়েই আছেন। রাজি হওয়াতে এত আনন্দ, সেটাও কি আগে টের পেয়েছিলেন?

একটা ক্ষীণ সন্দেহ অবশ্য ভেতরে ছিল। মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই এখানে এসে একটা সম্পর্কের সন্ধান পেয়েছে। যা ওকে আশ্রয় দিয়েছে, নিরাপত্তা দিয়েছে, শান্তি দিয়েছে। যা পেয়ে নন্দিতাকে ভুলে থাকতে পেরেছে ও।

কুন্তলাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন নন্দিতা। এমন সম্ভ্রান্ত চেহারা আভিজাত্যপূর্ণ কথাবার্তা! এ কোথা থেকে এল? এই বৃদ্ধাশ্রমে কেন? যেচে আলাপ করলেন। কথা বলে ভাল লাগল। সবচেয়ে ভাল লাগল, ব্যবহারে দূরত্ব বজায় রাখাটা। নিজেকে হালকা, প্রাপ্তব্য করবে না এই মেয়ে। তাঁর বয়েসীই হবে। কিন্তু ভেতরে যে অনুভূতিটা এল সেটা শ্রদ্ধার।

বাড়ি দেখে চমকে উঠেছিলেন। এই কি তাঁর সেই চেনা বাড়ি? বাড়ির মালিককে দেখে? যেন এক ছটফটে তরুণ, প্রাণচঞ্চল, কর্মব্যস্ত। চোখে লজ্জা, হয়তো অপরাধবোধও।

আর নন্দিতা?

চোখ আড়াল করতে সরে গিয়েছিলেন। দেখে ফেললে যে তাঁর সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে! অত সহজে নিজেকে খুলে দেখানো, তাঁর পক্ষে কি সম্ভব? তাঁর পক্ষে কি উচিত?

তপু যখন ফোন করে জানতে চেয়েছিল, ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি বিমান। নির্দোষ প্রশ্ন, তুমি কি এই উইক-এন্ডটায় মোহনপুরে থাকছ? বিমান জবাব দিয়েছিলেন, কোথায় আর যাব বল? কেন? তপু সরাসরি জবাব না দিয়ে, কিছু নয়, এমনিই, বলে ফোন নামিয়ে রেখেছিল।

আজ বারান্দায় বসে কাগজ পড়তে পড়তে ওদের ঢুকতে দেখে বিমানের বুকের ভেতর একটা রক্তের ডেলা ঝর্না হয়ে গেল। তপু-অপু-পিউ-দিউ-দমন-শাওন। এবং নন্দিতা। জগুর খোঁজ করলেন বিমান। মনে পড়ল ওকে বাজারে পাঠিয়েছেন। ভজুয়া নীচে আগাছা পরিষ্কার করছিল, ওকেই বললেন দরজা খুলে দিতে। বারান্দায় ঝুঁকে ওদের দিকে হাত নাড়তে লাগলেন। দমন দেখতে পেয়ে লাফাতে লাগল, দাদুভাই!

ওপরে উঠে আসছে সকলে, সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন বিমান।

মিতালিকে দেখছি না?

ওরও আসার কথা ছিল। কাল রাতে খবর এসেছে, ওর মা-র প্রেশার বেড়েছে, রান্নাঘরে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। খবর পেয়ে ও শোভাবাজার চলে গেছে।

কেমন আছেন খবর নিয়েছিস?

হ্যাঁ, গিয়েই ফোন করেছিল। চিন্তার তেমন কিছু নেই। ক'টা দিন রেস্ট নিতে হবে, আর ওষুধ খেতে হবে নিয়ম করে। ওটাতেই ওনার ভীষণ আলিস্যি।

তপুর কথায় বিমানের মনে পড়ল, তাঁরও ওষুধ ফুরিয়ে গিয়েছে, জগুর লিস্ট-এ ঢোকানো আছে।

খুব ভাল করেছিস সবাইকে নিয়ে এসে, পিউর মাথায় হাত রেখে বললেন বিমান।

পিউ-দিউ বাবা-মায়ের দেখাদেখি প্রণাম করল, দমন কোমরে হাত দিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল।

এটা তোমার বাড়ি?

হ্যাঁ, তোমার পছন্দ হয়েছে?

বিচ্ছিরি। সিঁড়িটা কী নোংরা! আর অন্ধকার।

দমনের কথা শুনে হেসে উঠল সবাই। বিমান বললেন, দাঁড়াও না ভজুয়াটার খুব বাড় বেড়েছে। কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে না। এমন শাস্তি দেব...

হেড ডাউন করে থাকতে বলো।

শাওন বলল, কেমন সারপ্রাইজ দিলাম বলুন বাবা?

বিমান হাসলেন—মতলবটা কার?

মতলব শব্দটা ঠিক নয়। বলুন প্ল্যান। আমার। কেন খারাপ করেছি?

চুপ করে রইলেন বিমান। ঝর্নাটার আওয়াজ এখনও শুনতে পাচ্ছেন। একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। নতুন কিছু করে ফেলার নেশা। কাজটা সম্পন্ন হয়ে গেছে। বৃদ্ধাবাস এবারে চলতে থাকবে। বিমান থাকুন বা না থাকুন। ভেতরে ভেতরে ক্লান্তি জমছিল। ওরা এসে মনে করিয়ে দিল।

শাওন বলল, বাচ্চারা বদ্ধ ঘরে হাঁপিয়ে উঠছে। ওদের নীচে পাঠিয়ে দিই?

নন্দিতা চুপ করে বসেছিলেন। হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, নীচে পাতকুয়ো, খবরদার একলা ছেড়ো না। দমনটা যা দুরন্ত!

শাওন উঠে দাঁড়াল, তাহলে আমরাও যাই। আপনারা কথা বলুন।

বিমানের মনে হল ষড়যন্ত্র। তাঁকে আর নন্দিতাকে মুখোমুখি বসিয়ে দেবার জন্যই ওদের ছলচাতুরি। কিন্তু এত সহজে ধরা দেওয়াটা ঠিক হবে না।

বললেন, তোমরা এতখানি এসে নিশ্চয়ই টায়ার্ড। জগু বাজারে গেছে, এখুনি আসবে। চা-টা করুক। একটু বিশ্রাম নাও। বাচ্চারা নীচেই খেলুক। ভজুয়াকে বলে দিচ্ছি। ও পাহারা দেবে।

বাচ্চাদের পাহারা দিতে হবে না। ওরা নিজের মতো খেলুক। ভজুয়াকে বরং কুয়োর সামনে বসিয়ে রাখো।

নন্দিতা এই প্রথম সরাসরি কথা বললেন বিমানের সঙ্গে। বিমান সেটা উপভোগ করলেন।

ঠিক আছে। ভজুয়াকে তাই বলে দিচ্ছি।

বাচ্চারা নীচে চলে গেল। অপু-তপু-শাওন ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। আবাসিকরাও কেউ কেউ এলেন। অলকা তো নিজে থেকেই এসে আলাপ করলেন। নন্দিতাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, এত দিনে হোস্টেসকে পাওয়া গেল। ছাদের একপাশে মিস্তিরি লেগেছে, কাজ হচ্ছিল। সেই দিকে দেখিয়ে অপু জিজ্ঞেস করল, ওখানে কী হচ্ছে? বিমান বললেন, এক্সটেনশন। দু'খানা ঘর তৈরি হচ্ছে। একটা বড়, দু'জন থাকার মতো।

জগু এসে গিয়েছিল। ওকে আর একবার বাজারে পাঠালেন। খাবার-দাবার আনতে, ফ্রেশ মাছ উঠেছে কি না দেখে আসতে। ওষুধটা নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

স্নান করে খোলা চুল পিঠে মেলে কুন্তলা এলেন পুরনো বাংলা সিনেমার নায়িকার মতো। কুন্তলাকে দেখেই নন্দিতার ভুরু কুঁচকে উঠল। দৃশ্যটা মাথায় টুকে রাখলেন বিমান।

কুন্তলা নন্দিতার সঙ্গে আলাপ করলেন, খোঁজখবর নিলেন, এত দিনের মধ্যে এক দিনও কেন আসেননি অনুযোগ করলেন। তারপর, যেমন এসেছিলেন, নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

বাচ্চারা এক সময় টানতে টানতে অপু-তপু-শাওন এমনকী নন্দিতাকেও নীচে নিয়ে গেল। ওপর থেকে ওদের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে শুনতে এক পূর্ণতার অনুভূতি ছেয়ে যেতে লাগল গভীরে।

টিফিন নীচেই সার্ভ করা হল। নন্দিতা চা ছাড়া কিছু খেলেন না। বাচ্চারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেল। তপন একবার ওপরে এসে বলে গিয়েছিল, চারটে চল্লিশের ট্রেন-এ কিন্তু ফিরতেই হবে।

বিমান কোনও প্রশ্ন করেননি। চারটে চল্লিশ না হয়ে পাঁচটা আঠাশ কেন নয়, তা যেমন জানতে চাননি, ফিরে না গেলে কী ক্ষতি হবে, তাও জিজ্ঞেস করেননি। নন্দিতা সম্বন্ধেও বিমান ছিলেন নিরুৎসুক।

খাবার রেডি হতে হতে দু'টো বেজে গেল। অন্য আবাসিকদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাওয়া অভ্যেস বিমানের। আজ নিয়মের ব্যতিক্রম হল বলে শুনিয়ে যেতে ছাড়লেন না অলকা—কী ব্যাপার? আজ যে আমাদের সঙ্গে খাওয়া হল না? নিজের লোক এসেছে বলে? বেশ বেশ, আমরাও জেনে রাখলুম। আসলে, আমরা তো আপন নই, পর।

নন্দিতা বিমানের হয়ে জবাব দিলেন, তাই বললে চলে? আমরা এক দিনের অতিথি। এলাম, চলে যাব। আপনাদের জিম্মাতেই তো রেখে গেলাম।

অলকা ঠোঁট মটকে হাসলেন, একদিনের অতিথি হতে কে বলেছে ভাই? এসে থাকলেই হয়। নিজের জিনিস নিজে সামলে রাখা যায়।

বারান্দায় টেবিল পেতে খেতে দিয়েছে জগু। দমনকে খাইয়ে দিতে হয়। মাছের কাঁটা বেছে দিচ্ছিল শাওন। অন্যরা চুপচাপ খাচ্ছিল।

এক আধ দিন এই রকম আউটিং হলে খুব রিফ্রেশিং লাগে কিন্তু, অপু বলল।

চলে এলেই পারিস। কতটুকুই বা দূরত্ব! ট্রেনে দেড় ঘণ্টাও নয়। একটা ফোন করে দিবি। বাজার-টাজার করিয়ে রাখব।

বিমানের কথায় আপত্তি তুলল শাওন।

না জানিয়ে আসার চার্ম আরও বেশি। বেশ পিকনিক পিকনিক লাগে।

মুখে শব্দ করে খাচ্ছিল দিউ। গালে টোকা মারলেন নন্দিতা—মুখ বন্ধ, খাবার সময় একদম শব্দ হবে না।

খাওয়া শেষ হলে ঘড়ি দেখল তপু। গল্পে গল্পে এত দেরি হয়ে গেছে? হাত-মুখ ধুয়ে আধশোয়া হতে যাচ্ছিল অপু, শাওন তাড়া লাগাল, এখন শুলে আর উঠতে পারবে না। তা ছাড়া, অবেলার খাওয়া। খেয়ে শুতে নেই। গা ম্যাজম্যাজ করে।

নন্দিতাকে রেখে সবাই নীচে চলে গেল।

এবারে বিমান ও নন্দিতা, মুখোমুখি।

ওষুধ খাচ্ছ ঠিকমতো?

ঘাড় নাড়লেন বিমান। নন্দিতা জিজ্ঞেস করলেন, প্রেশার মাপাও নিয়ম করে?

আবারও ঘাড় নাড়লেন বিমান। এবারের 'হ্যাঁ'-টায় তেমন জোর এল না। প্রশ্ন ঘুরিয়ে দেবার জন্য বললেন, তুমি? শরীর ঠিক আছে?

আছে এক রকম।

স্কুলের খবর?

নতুন কোনও খবর নেই।

বাড়ি? কাজের মেয়েটা রেগুলার আসছে? ঘর-দোর?

আসে, জিনিসপত্র সরায়। কত দেখব?...তোমার ঘর ঠিক আছে। মাঝে মধ্যে খুলে পরিষ্কার করাই।

গ্যাস, ইলেকট্রিক, ফোন বিল? পাম্প চালানো?

আমিই করি।

কথা ফুরিয়ে গেল দু'জনের। দিউর সঙ্গে ঝগড়া করছে দমন, গলা শোনা যাচ্ছে। শাওন দু'জনকেই ধমক লাগাল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ পিউর গলা, গান গাইছে পিউ। এত চমৎকার গান শিখেছে মেয়েটা!

কেমন চলছে তোমার সঙ্গীত সাধনা?

লাজুক হাসলেন বিমান—আর গান! এসে অবধি গান নিয়ে বসার সময় পাইনি।

কী করো সারাদিন?

বিমান বলতে গেলেন, একটা দিন থেকে দেখো না কত কাজ, গলায় কী যেন আটকে গেল। বললেন. কাজ থাকেই। একা হাতে সব সামলানো।

মুছে আসছিল বিকেলের আলো, একটা ট্রেন এল, চলেও গেল। প্ল্যাটফর্ম আবার ঝিমিয়ে পড়ল।

অর্পণ গলা তুলল, মা, এবারে নামতে শুরু করো। টিকিট কাটা, ওভারব্রিজ পার হওয়া। হাতে সময় রেখে বেরুনো ভাল।

চমকে উঠলেন বিমান। এত তাড়াতাড়ি?

ছুঁয়ে দেখার দূরত্বে রয়েছে নন্দিতা। অথচ মাঝখানে কত বছরের ব্যবধান!

ভাল আছ তো? নরম গলায় ফিসফিস করে বললেন নন্দিতা।

ভাল? নিজেকেই প্রশ্ন করলেন বিমান। এই বৃদ্ধাবাস, এই নির্মাণ, এর প্রতিটি বিন্দুতে মিশে আছে তাঁর শ্রম। অথচ বিমানই শুধু জানেন, এই আবাসে জগু-ভজুয়ার মতো তিনিও এক কর্মচারী। ওরা মাইনে পায়। তিনি সেটুকুও পান না। সকলের তত্ত্বাবধান করেন, কাজ ঠিক মতো হচ্ছে কি না নজর রাখেন। বিনিময়ে থাকা-খাওয়া ফ্রি।

যখন এসেছিলেন, সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন হয়েছিলেন। সব সৃষ্টিরই পূর্ণতা যখন স্রষ্টা সেই শিল্পগাত্রে নিজের নামটা এঁকে দেন সেইখানে। এই সৃষ্টিতে কোথাও বিমানের নাম নেই।

কতগুলো সম্পর্ক অতিক্রম করে এসেছিলেন বিমান? হারিয়ে যাওয়া একটা সম্পর্ককে জোড়াতালি দিয়ে নতুন করে গড়তে চেয়েছিলেন। পিন্টু সেই প্রত্যাশা চূর্ণ করে দিয়েছে।

কী রইল বিমানের? মৃত্যু প্রত্যাশী কিছু মানুষের সাহচর্য?

সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন দু'জন। অন্ধকারে হোঁচট খেলেন নন্দিতা। পড়ে যাচ্ছিলেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন বিমান। সামলে নিয়ে আবার নামতে থাকলেন নন্দিতা।

বাইরে বেরিয়ে দেখলেন বর্ষার মেঘ কেটে যাচ্ছে। রোদ, এখনও পুরো নয়, কিন্তু মেঘ কেটে আত্মপ্রকাশ করবে এখনই।

নন্দিতা বললেন, তোরা এগো, আমি যাচ্ছি আস্তে আস্তে। ছেলেরা, শাওন, বাচ্চারা প্ল্যাটফর্মে উঠে গিয়েছে, নন্দিতা-বিমান চলেছেন পেছনে, পাশাপাশি। বিমান বললেন, ওপরে একটা ঘর তোলা হচ্ছে, ডাবল রুম, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকতে পারবে।

বাকিটা—তুমি কি আসবে, থাকবে এখানে, আমার সঙ্গে—টলটল করে দুলতে থাকল বিমানের চোখে, ঠোঁটের কোণায়।

হাসলেন নন্দিতা। চোখের তারায়, দৃষ্টির আলোয়। জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেলেন।

তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বিমান, একা।